উপমহাদেশের ধর্মতাত্ত্বিক মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ: পরিচিতি ও মতাদর্শ

(Muslim religious sects in the Sub-continent: Their introduction and doctrine)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রফিক

পিএইচ.ডি গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি নং: ০৪/২০১৫-১৬

পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকারনামা

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **“উপমহাদেশের ধর্মতাত্ত্বিক মুসলিম সম্প্রদায়সমূহঃ পরিচিতি ও মতাদর্শ”** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

(মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রফিক)
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি নং: ০৪/২০১৫-১৬

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রফিক, পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"উপমহাদেশের ধর্মতাত্ত্বিক মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ: পরিচিতি ও মতাদর্শ"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি এর পান্ডুলিপিগুলো আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছি। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং, গবেষককে পিএইচ. ডি ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন)
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম রাব্বুল ‘আলামীন আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর অপার করুণা ও মেহেরবানীতে **“উপমহাদেশের ধর্মতাত্ত্বিক মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ: পরিচিতি ও মতাদর্শ”** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা সম্পন্ন হয়েছে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি রাহমাতুল্লিল ‘আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে মানুষ তার স্রষ্টার সন্ধান পেয়েছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার এ গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। তিনি একজন প্রকৃত গবেষক, গবেষণা তাঁর নেশা। তিনি আমার এ অভিসন্দর্ভের জন্য সীমাহীন ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলে অভিসন্দর্ভটি আলোর মুখ দেখেছে। তিনি শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায়-পরিচ্ছেদ বিন্যস্তকরণ, এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করেছেন। ফলে এ গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য আমি তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের প্রতি, তিনি (তৎকালীন কলা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালনকালে) এ গবেষণা কর্মের শিরোনাম ঠিক করে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ এর প্রতি, যিনি আমার গবেষণা কর্মের শিরোনাম বাছাই করার পর থেকে থিসিস সম্পাদন করা এবং জমা দেয়া পর্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। এ গবেষণা কর্মে তাঁর সৃজনশীল দিকনির্দেশনা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয়

চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান এর প্রতি, যিনি সেমিনারে পরামর্শ দিয়ে এর অগ্রগতি নিশ্চিত করেছেন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, বিশেষ করে, অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল বাকী, অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, অধ্যাপক ড. মো: শামছুল আলম সহ বিভাগীয় সকল শিক্ষকের প্রতি যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে পরামর্শ দিয়ে এবং দোয়া করে আমার অভিসন্দর্ভ সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার সম্মানিত পিতা মরহুম মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ ও মাতা মরহুমা রোকেয়া বেগমকে, যাঁরা আমার সুখের জন্য নিজেদের সুখকে কুরবানী করে গেছেন। আমার ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির চিন্তায় তাঁরা সদা-সতর্ক ছিলেন। তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও কুরবানী এবং একান্ত দোয়ার কারণেই জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছি। আজ এ স্মরণীয় মূহুর্তে তাঁদের আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার চাচা মরহুম হাফেজ মাওলানা মো: আব্দুর রব ও মরহুম মাওলানা মো: আব্দুল হককে যাদের তালিম ও তরবিয়্যাতের মাধ্যমে আমার শৈশব ও কৈশোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি, যাঁরা আমার জন্য নিরন্তর দোয়া করে যাচ্ছেন। ইতালী প্রবাসী চাচা আলহাজ্ব মো: আবদুজ জাহের (অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা) ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও অভিভাবক অধ্যাপক মাওলানা মো. আবুল কালাম (সাবেক রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড) এর প্রতি; যাদের দোয়া আমার জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে পাথেয় হিসেবে কাজ করে, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মিনী জনাবা আকলিমা বেগমের প্রতি, যার সীমাহীন ত্যাগ ও প্রেরণা এ গবেষণা কাজে নিরন্তর সাহস যুগিয়েছে। আমার বড় ছেলে তামিম বিন রফিক, মেজো ছেলে তাসনিম বিন রফিক ও ছোট ছেলে তাহমিদ বিন রফিক আমার এ গবেষণা কর্মে বিভিন্নভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে। তাদের প্রতি আমার অফুরন্ত দোয়া রইল। আমি

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার অনুজপ্রতিম আতাউর রহমান শাহান, আরিফুল ইসলাম ও মাওলানা আব্দুর রউফ আল-আযহারীর প্রতি, যাঁরা বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে আমার গবেষণা কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদের আন্তরিক উৎসাহ, পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাদিকা হক ও মো. আবদুর রহীমকে, যারা অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে এ অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে আমাকে সহায়তা করেছে।

এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, সুফিয়া কামাল গণ-গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সেমিনার লাইব্রেরী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিসহ বহু প্রতিষ্ঠান আমাকে বিশেষ ভাবে উপকৃত করেছে। এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়া যেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সব লেখকের অবদানও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

পরিশেষে মহান প্রতিপ্রালকের নিকট প্রার্থনা জানাই, যারা এ গবেষণাকর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন এবং এ গবেষণা কর্মটিকে জাতির কল্যাণে কবুল করুন। আমীন।

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

অনু.	:	অনুবাদ
আ.	:	'আলাইহিস সালাম
খ.		খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
বাং		বাংলা
মৃ.	:	মৃত্যু
রহ.		রহমাতুল্লাহি আলাইহি
রা.	:	রাদিআলাহু আনহু / রাদিআল্লাহু আনহুম
সম্পা.	:	সম্পাদিত, সম্পাদনা
সং	:	সংস্করণ
স.	:	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হি.	:	হিজরী সন
ed. /eds.	:	edited by, edition, editor, editions
Ibid	:	(Ibidem) in the same place; from the same source.
p.	:	Page
pp.	:	Pages
Pub.	:	published, publication
vol.	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা

(আরবী বর্ণ ও হরকতসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ء=ا	উর্ধ্ব কমা’	ز	যা	ق	ক.া
ب	বা	س	সা	ك	কা
ت	তা	ش	শা	ل	লা
ث	ছা	ص	স.া	م	মা
ج	জা	ض	দ.া	ن	না
ح	হ.া	ط	ত.া	و	ওয়া
خ	খা	ظ	জ.া	ه	হা/হ্
د	দা	ع	’আ	ي	ইয়া/য়া
ذ	য.া	غ	গা/ঘা		
ر	রা	ف	ফা		

উল্লেখ্য যে, বহুল প্রচলিত বাংলা বানানগুলো হুবহু রাখা হয়েছে। যেমন : আরবী, মিশর, কুয়েত, কুরআন মাজিদ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় **৪-৪৬**

মতাদর্শ পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায় **৪৭-১০৩**

ইসলামে বিভিন্ন মতাদর্শ: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ :	ইসলামে বিভিন্ন মতাদর্শের উৎপত্তি	৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:	খারেজী সম্প্রদায় : পরিচিতি ও মতাদর্শ	৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ:	মুরজিয়্যাহ সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	৭৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	৮১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	জাবারিয়্যাহ সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	৮৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	৯০
সপ্তম পরিচ্ছেদ :	কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	৯২
অষ্টম পরিচ্ছেদ :	মুতাযিলা সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	৯৫

তৃতীয় অধ্যায় **১০৪-২২৭**

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় ও মতাদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ :	আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়	১০৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:	আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ	১৫৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ:	নবী ও রাসূল (আ.) সম্পর্কিত মতাদর্শ	১৭২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	ফিরিশতা সম্পর্কে মতাদর্শ	২০৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	কিতাব সম্পর্কে মতাদর্শ	২১৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	আখিরাত সম্পর্কে মতাদর্শ	২১৫

চতুর্থ অধ্যায় **২২৮-২৭৬**

শীআ : পরিচিতি ও মতাদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ :	শীআ পরিচিতি	২২৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:	ইসমাঈলিয়্যা সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	২৩২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ:	যায়েদিয়্যা সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	২৪৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	ইসনা আশারিয়্যাহ সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ	২৪৭

পঞ্চম অধ্যায় **২৭৭-৩০৬**

কাদিয়ানী মতবাদ: পরিচিতি ও মতাদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ :	কাদিয়ানী মতবাদ: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:	বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ	২৯০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ:	কাদিয়ানীদের মতাদর্শ	২৯২

ষষ্ঠ অধ্যায় **৩০৭-৩৫২**

বাহাই ধর্মমত: পরিচিতি ও মতাদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ :	বাহাই পরিচিতি	৩০৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:	বাংলাদেশে বাহাই সম্প্রদায়	৩১৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ:	বাহাইদের কার্যক্রম	৩১৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	বাহাইদের মতাদর্শ	৩৩২
উপসংহার		৩৪৪
গ্রন্থপঞ্জি		৩৪৬

ভূমিকা

الحمد لله و الصلوة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه أجمعين

মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (স.) সমগ্র বিশ্বমানবতার কল্যাণে এক শ্বাশত, চিরন্তন ও সুমহান আদর্শ ইসলাম নিয়ে আগমন করেন। পদে পদে বাঁধার সম্মুখীন হন তিনি। মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ়তার সাথে সকল প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবনাদর্শ ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মক্কা, মদীনা শুধু নয়, গোটা জাযিরাতুল আরবে ইসলাম ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশাতেই ইসলামী মতাদর্শ আরব বিশ্বের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

মহানবী (স.)-এর তিরোধানের পর আবু বকর (রা.) খিলাফতের দাযিত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর পর্যাক্রমে ওমর (রা.) ও ওসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের শাসনামলে ইসলাম পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক এলাকা বিজিত হতে থাকে। ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যাও দেখা দিতে থাকে। সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী প্রজন্মের কেউ কেউ উচ্চবিলাসী হয়ে উঠে। দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের মতপার্থক্য। ইসলামের শত্রুরা এর ষোল আনা সুযোগ গ্রহণ করে। শুরু হয় ফিৎনা আর ষড়যন্ত্রের নতুন অধ্যায়। এক পর্যায়ে ওসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। আর এর ধারাবাহিকতায় জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনের মতো ভ্রাতৃঘাতি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর এরই প্রেক্ষিতে ইসলামে বিভিন্ন মতাদর্শের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মতাদর্শ প্রথমে রাজনৈতিক মতাদর্শরূপে আবির্ভূত হলেও পরবর্তীতে ধর্মীয় মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক মতাদর্শ আবার সমকালীন শাসকবর্গের পৃষ্টপোষকতা লাভ করে। মতাদর্শের এ ভিন্নতার ঢেউ ভারত উপমহাদেশেও পৌঁছে যায়। ফলে আমরা এখানেও বিভিন্ন মতাদর্শ লক্ষ্য করছি। ইসলামে বিভিন্ন মতাদর্শ থাকলেও মহানবী (স.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী একটি মতাদর্শই নাজাত পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব উম্মাহর উচিত সে মতাদর্শকে খুঁজে নেয়া যারা কল্যাণ ও মুক্তির বার্তা প্রাপ্ত। এ সকল বিবেচনায় আমি **"উপমহাদেশের ধর্মতাত্ত্বিক মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ: পরিচিতি ও মতাদর্শ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে আগ্রহী হই। উল্লেখিত শিরোনামে উপমহাদেশের মতাদর্শসমূহের পরিচিতি ও প্রত্যেক দলের মতাদর্শ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে আশা করি। এ অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে মতাদর্শের পরিচয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামে মতাদর্শের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি আটটি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিচিতি ও মতাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়টি ছয়টি পরিচ্ছেদে রচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শীআ মতাদর্শের পরিচিতি ও মতাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কাদিয়ানী মতাদর্শের পরিচিতি ও মতাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়টিতেও তিনটি পরিচ্ছেদে রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাহাই মতাদর্শের পরিচিতি ও মতাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়টিও চারটি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে।

অতঃপর উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি প্রদান পূর্বক এ অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে। আমার প্রত্যাশা, এ গবেষণাকর্মটি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণের নিকট মতাদর্শের পরিচয়, ইসলামে মতাদর্শের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, উপমহাদেশের বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে নতুন গবেষণার পথ দেখাবে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার জ্ঞান ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, মানবীয় স্বভাবজাত ভুল-ত্রুটি এবং গবেষণার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান সত্ত্বেও এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের দ্বারা পাঠকগণ সামান্যতম উপকৃত হলে নিজের শ্রম সফল ও সার্থক হবে বলে মনে করবো।

প্রথম অধ্যায়

মতাদর্শ পরিচিতি

মতাদর্শ শব্দটি বাংলা। এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে, আকীদা (عقيدة) । এটি একবচন বহু বচনে عقائد । এর মূল ধাত হচ্ছে عقد। عقد শব্দের অর্থ হচ্ছে দুটি বস্তুর মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করা, ধারণা করা, দৃঢ় করা, সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন বলা হয় عقدت طرفي في الحبل 'আমি দু'টি রশিকে এমনভাবে বেঁধেছি যে, একটি রশি অপরটিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছে।' এজন্যই বিবাহ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর বিশ্বাসকে যেহেতু দৃঢ়ভাবে ধারনা করা হয় তাই তাকে আকীদা বলা হয়।[১]

আল্লামা ইব্ন‌ুল ফারিস বলেন, আইন ক্বাফ ও দাল: ধাতুটির মূল অর্থ একটিই যা দৃঢ় করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত।[২] ধর্মমত বা আকীদার পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মিসবাহুল মুনীর প্রণেতা বলেন:

العقيدة ما يدين الانسان به , وله عقيدة حسنة سالمة من الشك

''মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকে 'আকীদা' বলা হয়। আর (বলা হয়) তার আকীদা ভাল আছে অর্থাৎ তার বিশ্বাস সন্দেহমুক্ত।''[৩]

আল্লামা সাইয়িদ সাবিক বলেন:

العقيدة من التصديقات بالشئ و الجزم به دون الشك أو ريبة

"আকীদা হচ্ছে, কোনো বিষয়বস্তুকে এমন মজবুতভাবে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।"[৪]

ড. ইবরাহীম অনিক বলেন:

---

১ . সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬২৬

২. আহমদ ইব্ন ফারিস, *মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাহ* (কুম: মাকবাতুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.) খ. ৪, পৃ. ৮৬

৩. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ফাইউমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.) খ. ২, পৃ. ৪২১

৪ . সাইয়িদ সাবিক, *আল-আকাইদুল ইসলামিয়া* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আরবী, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لمعتقده-

"আকীদা ঐ বিধানকে বলা হয় যা সন্দেহের অবকাশ ব্যতীত মানুষ গ্রহণ করে থাকে।"[৫]

আকীদা এমন বিষয় যাতে রয়েছে সন্দেহমুক্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস। সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়। যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস করাই আকীদার অপরিহার্য দাবী। এর ব্যত্যয় ঘটলে তা আকীদা হিসেবে পরিগণিত হবে না। ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে :

"আকীদা এমন এক ধারণা যাহাতে কোন সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই। আকীদার সম্পর্কে অদৃশ্য বিষয়ের সাথে। যা দৃশ্যমান তাতে বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। ইসলামী পরিভাষায় আকীদার অপর নাম ঈমান। ঈমান আনেছে অর্থ বিশ্বাস করেছে, এই বিশ্বাসে কোন সন্দেহ নেই।"[৬]

মতাদর্শ বা আকীদার অন্যান্য পরিভাষা

ধর্মীয় মতাদর্শ বুঝাতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও প্রাচীন আরবী ভাষায় এর ব্যবহার দেখা যায় না।[৭]

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো কোনো ইমাম ও আলিম আকীদা বা ইতিকাদ শব্দটি ধর্ম বিশ্বাস অর্থে ব্যবহার করেছেন। এরপর থেকে এর ব্যবহার বেড়ে যায় এবং ব্যাপকতা লাভ করে। তবে বই পুস্তকে এর ব্যবহার হয় আরো ও পরে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে লিখা অভিধান গুলোতে এর স্থান হয়নি। অষ্টম শতাব্দীতে লেখা আল মিসবাহুল মুনীর অভিধানে আকীদা শব্দটি ধর্মবিশ্বাস অর্থে সর্বপ্রথম স্থান পায়। এরপর থেকে শব্দটি ধর্মবিশ্বাস অর্থেই মৌখিক ও লিখিত ভাবে স্থান করে নেয়।[৮] আকীদা শব্দটি ধর্মবিশ্বাস অর্থে ব্যবহারের পূর্বে অন্যান্য কিছু

---

৫ . ড. ইবরাহীম আনিস, *আল-মু'জামুল আল-ওয়াসিত* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি), পৃ. ৬১৪

৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা* (ঝিনাইদহ: আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৮

৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

পরিভাষা ছিল, যা ধর্ম বিশ্বাস বা মতাদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হতো সে সব পরিভাষা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ঈমান

ঈমান শব্দটি ن – م – أ মূল ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করে। أمن অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা, আস্থা স্থাপন করা, বিশ্বাস করা ইত্যাদি। আল্লামা ইব্ন ুল ফারিসের মতে, ايمان অর্থ হচ্ছে দু'টি। প্রথম অর্থ বিশ্বস্ততা যা খিয়ানতের বিপরীত। দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা। প্রথম অর্থে ঈমান মানে নিরাপত্তা প্রদান করা বা আমানতদার মনে করা। দ্বিতীয় অর্থে ঈমান মানে বিশ্বাস করা বা বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা।[৯]

ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মমত অর্থে কুরআন ও হাদীসে ঈমান শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করল অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাস কর অর্থে نؤمن- تؤمن শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। আর কর্তা বাচক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে امنوا- أمن ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। আর কর্তাবাচক বিশেষ্য হিসেবে مؤمنون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বিশ্বাস অর্থে ঈমান শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ-

"যারা ঈমান ও ইলম (বিশ্বাস ও জ্ঞান) প্রাপ্ত হয়েছে তারা বলল"[১০]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

"তোমরা ঈমান আনয়ন কর (বিশ্বাস কর) যেমনিভাবে মানুষ ঈমান আনেছে।[১১]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

৯ . আহমদ ইব্ন ফারিস, *মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৩

১০ . আল-কুরআন, ৩০ : ৫৬

১১. আল-কুরআন, ০২: ১৩

Dhaka University Institutional Repository

‘‘ আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

‘‘ যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।’’[১৩]
অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

‘‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি; তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর; অতএব আমরা ঈমান আনয়ন করেছি।’’[১৪]

এ রকম বহু আয়াতে কারীমা রয়েছে যেখানে ঈমান দ্বারা বিশ্বাস বুঝানো হয়েছে। হাদীসের ঈমান শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয় যেখানে ঈমান দ্বারা ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মমত বুঝানো হয়েছে। যেমন: আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন:

امرهم بالايمان بالله واحده قال اتدرون ماالايمان بالله وحده قالوا الله و رسوله اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله-

‘‘রাসূল (স.) তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা কি জান, একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অবগত আছেন। তিনি বলেন, তা সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং

---

১২. আল-কুরআন, ৫ : ৫

১৩. আল-কুরআন, ৮ : ২

১৪. আল-কুরআন, ৩ : ১৯৩

মুহাম্মদ (স.) তাঁর রাসূল।"[১৫] অপর এক হাদীসে ঈমান ধর্মবিশ্বাস অর্থে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

عن ابي هريرة رضي الله تعالي عنه قال كان النبي بارزا يوما للناس فاته رجل فقال: يا رسول الله ما الايمان؟ قال الايمان ان تومن بالله و ملائكته و كتبه و بلقائه و رسله و تومن بالبعث الاخر و تومن بالقدركله – قال ماالاسلام ان تعبد الله ولاتشرك به شيئا وتقيم الصلاة و تودي الزكاة المفروضة تصوم رمضان.

''আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদিন নবী (স.) লোকজনের মধ্যে ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? তিনি বলেন, ''তুমি আল্লাহ কে বিশ্বাস করবে, তাঁর ফিরিশতা, কিতাবসমূহ, তাঁর সাক্ষাত, তাঁর রাসূলগণ ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে এবং তাকদীর বা ভাগ্যের সব কিছুতে বিশ্বাস করবে। তিনি (আগুন্তক) প্রশ্ন করেন ইসলাম কী? তিনি বলেন, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। সালাত আদায় করবে, ফরজ যাকাত আদায় করবে এবং রমযানের সিয়াম পালন করবে।"[১৬]

ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির সম্পূরক। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা(রহ.) এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ঈমান হচ্ছে স্বীকৃতি ও সত্যায়ন। বিশ্বাসগত বিষয়াদির দিক থেকে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকিন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে ও কমে। এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান। কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ইসলাম অর্থ আল্লাহর নির্দেশের জন্য আমত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া।

---

১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (বৈরুত: দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ১৯৮৭ খ্রি.) খ. ১, ২য় প্রকাশ, হা. ২৯, ৪৫, খ. ৪ হা. ১৫৮৮, ২৭৪৭; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম* (কায়রো: দারু ইয়াহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ১, হা. ৪৭

১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১. হা. ২৭, ৪৫, খ. ৪ হা. ১৭৩৩; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ৩৯, ৪০, ৪৭

আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য রয়েছে। তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া কোন ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কাজেই ঈমান ও সমস্ত শরীয়তকে দীন বলা হয়।[১৭]

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের দু'টি মত রয়েছে। যেমন:

এক. ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমামের মতে আমল বা কর্ম পালন ঈমানের অংশ নয়, এটি ঈমানের দাবী ও সম্পূরক। ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম। তাদের মতে, বিষয় বস্তুর দিক থেকে স্বীকৃতি বেশি কম হয় না বা ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না তবে বিশ্বাসের গভীরতার দিক দিয়ে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

দুই. অন্য তিন ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের মতে, আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ তবে মনের বিশ্বাস বা মৌখিক স্বীকৃতির ন্যায় অংশ নয়, এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ। তারা মনে করেন কর্মের অনুপস্থিতি দ্বারা ঈমানের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না তবে দুর্বলতা ও কমতি প্রমাণিত হয়। তারা বলেন, ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও দেহের বাহ্যিক কর্মের সমন্বয়। তারা এও মনে করেন যে, কর্মের কারণে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে।[১৮]

উপর্যুক্ত দু'টি মতের অনুসারীগণ এ বিষয়ে একমত যে, ঈমান ও আমল দু'টিই মহান আল্লাহর নির্দেশ। সুতরাং দু'টিই অর্জন করা আবশ্যক। ঈমান বিহীন ইসলাম যেমন হয় না তেমনি ইসলাম বিহীন ঈমান হতে পারে না, আমলের ত্রুটির কারণে বান্দা কাফির হয় না তবে শাস্তির যোগ্য হবে।

আল ফিকহুল আকবার

ঈমানের পর ধর্ম বিশ্বাস বুঝাতে এটিই সম্ভবত প্রাচীনতম পরিভাষা, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম রেখেছেন আল ফিকহুল আকবার। ফিক্‌হ শব্দটি আরবি। এরম মাদ্দাহ হচ্ছে ০ – ق – فএর অর্থ হচ্ছে, গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুঝা, অনুধাবন করা ইত্যাদি। কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধি বিধানে গভীর জ্ঞান ও

---

১৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৪, ২৫

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫,২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্ঞাকে ফিক্হ বলা হয়। আকবার শব্দটিও আরবী। এর অর্থ সবচেয়ে বড়, সর্বোত্তম, মহোত্তম। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্বাস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য হয়তো এ বিষয়ক জ্ঞানকে আল ফিকহুল আকবার নামে অভিহিত করেছেন।[১৯]

ইলমুত তাওহীদ

ইসলামে ঈমান বা ধর্ম বিশ্বাসকে তাওহীদ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। আর ঈমান বিষয়ক জ্ঞানকে ইলমুত তাওহীদ বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর ফিকহুল আকবার গ্রন্থে ইলমুল আকীদাকে ইলমুত তাওহীদ নামে অভিহিত করেছেন। তাওহীদ বা একত্ববাদই ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। আর এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। হিজরী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে এ পরিভাষাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এ সময় বেশ কিছু আকীদা বিষয়ক কিতাব এ নামে লিখিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন খুযাইমা (রহ.) কিতাবুত তাওহীদ নামে আকিদা বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম আব্দুর রহমান ইব্ন আহমদ ইব্ন রজব হাম্বলী (রহ.) কিতাবুত তাওহীদ নামে একটি কিতাব রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর আরব বিশ্বের অন্যতম শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদীর (রহ.) শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম কিতাবুত তাওহীদ যা আকীদা বিষয়ক কিতাব হিসেবেই পরিগণিত।

আস সুন্নাহ

সুন্নাহ শব্দটি আরবী। এর অর্থ রীতি, নীতি, পদ্ধতি, মুখচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন কর্মধারা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়ায় সুন্নাহ অর্থ রাসূলুল্লাহ (স.) -এর কথা, কাজ, অনুমোদন তথা তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। আসহাবে রাসূলের পরবর্তী যুগ থেকে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যে অনেকে তাদের মতাদর্শের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের দলিল পেশ করলেও রাসূলুল্লাহ (স.) ও তার সাহাবীদের আদর্শের বাইরে চলে যায়। এরা যুক্তি নির্ভর হয়ে উঠে। এমনকি একটি গোষ্ঠীর নিকট শরীয়ার দলিল থেকে যুক্তি হয়ে ওঠে তাদের

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান প্রামাণিক ভিত্তি। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে এদের বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহর আকীদা বিশ্বাস রক্ষায় এগিয়ে আসেন ইসলামের প্রাজ্ঞপন্ডিত বর্গ। তাঁরা যে সকল গ্রন্থ্ রচনা করেন তার শিরোনাম ছিল আস সুন্নাহ। এদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের (রহ.) নাম প্রণিধানযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম 'আস সুন্নাহ' নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ্ রচনা করেন। এ ছাড়া আরো যারা এ নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ্ রচনা করেছেন তারা হলেন:

ইমাম আবু বকর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হানী আল আসরাম, ইমাম আবু আলী হাম্বল ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন হাম্বল আশ-শাইবানী, ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশআস আস-সিজিসতানী, ইমাম আবু বকর আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবী আসিম আদ-দাহহাক আশ-শায়বানী, ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইমাম আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হারুন আল-বাগদাদী আল-খাল্লাল, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন বাগদাদী আল-খাল্লাল, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী, ইমাম তাবারানী আবুল কাসিম সুলাইমান ইব্‌ন আহমদ, ইমাম আবুশ শাইখ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন হাইয়ান আল-ইসপাহানী, ইমাম ইব্‌ন শাহীন আবু হাফস উমার ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন উসমান আল-বাগদাদী, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আনদাহ আল-ইসপাহানী ও আরো অনেক মুজাদ্দিদ ও ফকীহ।[২০]

আশ শারীয়াহ

শারীয়াহ শব্দের অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানিপানের স্থান, পথ, রাস্তা ইত্যাদি। শব্দটি ধর্ম বিশ্বাস বা বিশ্বাসের মূলনীতি হিসেবে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন আল আজুরী (রহ.) 'আশ শারীয়াহ' নামে আকীকা বিষয়ক একটি গ্রন্থ্ রচনা করেন।[২১]

---

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

২১. আবু জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত্‌ত্বহাবী, *আকীদাতুত্ ত্বহাবী*, অনু. মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম মল্লিক (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৭

উসুলুদ্দীন বা উসূলুদ্দিয়ানাহ

اصول الدين বা اصول الديانة অর্থ দীনের ভিত্তি সমূহ। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে কোনো কোনো ধর্মতত্ত্ববিদ আকীদা বুঝাতে এ শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে চতুর্থ শতাব্দীর মশহুর আলিম ইমাম আবুল হাসান আলী ইব্‌ন ইসমাঈল আল-আশয়ারী 'আল ইবানাতু আল-উসুলিদ্দিয়ানাহ' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

ইলমুল কালাম

আল কালাম (الكلام) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন কালামুল্লাহ তথা আল্লাহার কালাম বা আল্লাহর কথার দিকে লক্ষ্য করে পরিভাষাটির উদ্ভব। যেহেতু কালাম শাস্ত্রে আল্লাহর কালাম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করে গ্রীক Logos শব্দ থেকে এর উৎপত্তি, যার অর্থ- বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি। ইসলামী আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে দার্শনিক বা যুক্তিবিদ্যাভিত্তিক গবেষণামূলক আলোচনাকে ইলমুল কালাম বলে।

আবহমান কাল ধরে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয়গুলিকে জানার অপরিমেয় আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে গবেষণা করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে তারা তাদের গবেষণা কর্ম চালিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেও মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে মারাত্নক বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। এমনকি অনেকে নাস্তিকতার মতো মহাবিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে শয়তানের চরম ফাঁদে আটকে দুনিয়া আখিরাত হারিয়ে নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। অপর কেউ কেউ স্রষ্টা ও সৃষ্টির এমন সব বিষয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যার মধ্য দিয়ে তারা কুফুরীর দিকে ধাবিত হয়েছে নিজেরা ঈমান হারিয়েছে অন্যদের কেও পথভ্রষ্ট করেছে।

আহমদ আমীনের মতে, ইলমুল কালাম মূলতঃ মুতাজিলা সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট। আল্লামা শিবলী নোমানীর মতে, আব্বাসীয় যুগে খলীফা মাহদীর শাসনামল পর্যন্ত ইলমুল কালাম নামে কোন বিদ্যা বর্তমান ছিল না। খলীফা মামুনের যুগে মু'তাজিলা সম্প্রদায় দর্শন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন

করতঃ দার্শনিক মনেবৃত্তি নিয়ে এ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা করতে থাকে এবং ইসলামী শরীয়াহ বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের জন্ম দেয়।[২২]

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় দর্শন প্রচারিত হতে থাকে। খলীফা মামুনের জ্ঞান পিপাসা উপর্যুক্ত বিষয়ে রচিত গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও অনুবাদ নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি বিজিত অঞ্চল থেকে এমনকি রোমান সম্রাটের নিকট পত্র লিখে এসব ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। ফলে একদল অনুসন্দিৎসু পাঠক গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় দর্শনের প্রভাবে নতুন দর্শনের জন্ম দেওয়ার আকাঙ্খায় উদগ্রীব হয়ে উঠে, এদের বেশির ভাগ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়।

সাহাবীগণের অনুসারী মূলধারার তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ এবং তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ ঈমান ও আকিদা এবং গায়েবী বিষয়ে দার্শনিক বিতকর্কে কঠোরভাবে অপছন্দ করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন গায়েবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করে ওহীর নির্দেশনা মেনে চলাই মুমিনের মুক্তির সোপান। এর ব্যতয় ঘটলে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এজন্য প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন।[২৩] এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) -এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর ছাত্র মু'তাযিলা পন্ডিত বিশর আল-মায়িসীকে বলেন:

العلم بالكلام هو الجهل و الجهل بالكلام هو العلم، و اذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل : زند ق-

‘‘কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ইলমুল কালামে সুখ্যাতির অর্থ তাকে যিনদীক বা অবিশ্বাসী ধর্মত্যাগী বলা হবে।’’[২৪]

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) আরো বলেন:

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২৩ . ইব্‌ন আবিল ইয আল-হানাফিয়্যাহ, *শারহুল আকিদা আত-তাহাবিয়্যাহ* (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৯৮৮খ্রি.), ৯ম প্রকাশ, পৃ. ৭২-৭৭

২৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

من طلب العلم بالكلام تزندق

"যে ব্যক্তি ইলমুল কালাম শিক্ষা করবে সে যিনদীকে পরিণত হবে।"[২৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহ) এ সম্পর্কে বলেন:

حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال و يطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة و اقبل علي الكلام-

"যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তাদের ব্যাপারে আমার বিধান এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে মহল্লায় ও কবিলা সমূহের মধ্যে ঘুরাতে হবে এবং বলতে হবে, যারা কিতাব ও সুন্নাহ ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি।" [২৬]

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী থেকে আহলুল সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কোনো কোনো আলিম ইসলামী আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইলমুল কালাম পরিভাষা ও পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং আকীদা শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম নামে অভিহিত করেছেন। তারা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের মতাদর্শের সঠিক উত্তর দানের জন্য। এ সকল আলিম ভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসারীদের কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তাদের পথভ্রষ্টতাকে সুস্পষ্ট করে দিতেন।

ইসলামী আকীদার উৎস

ইসলামী আকীদার মূল উৎস একটি। আর তা হচ্ছে ইলমে ওহী। ওহী মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদেশ। আল্লাহর প্রত্যাদেশে কোন রূপ দ্বিধা বা সংশয় নেই। এতে কোন সন্দেহ বা ভ্রান্তি নেই। মহান স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে প্রত্যাদেশ নামক মহান নিয়ামত প্রদান করেছেন এজন্য যে, সৃষ্টি যেন সঠিক পথ খুঁজে নিতে বিভ্রান্তিতে পতিত না হয়। কিন্তু সৃষ্টি তথা মানুষ ও জ্বীন জাতি ওহী তথা প্রত্যাদেশ ছেড়ে মনগড়া জীবন প্রণালীকে বার বার বেছে নিয়েছে। ওহী

---

২৫ . *প্রাগুক্ত*

২৬. *প্রাগুক্ত*

তথা প্রত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে মানব জাতি বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আখিরাতকে বরবাদ করেছে।

ওহীর প্রকারভেদ

ওহী দুই প্রকার। এক. ওহীয়ে মাতলু তথা আল কুরআনুল কারীম দুই. ওহীয়ে গায়রে মাতলু হাদীস বা সুন্নাহ।

আল কুরআনুল কারীম

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর উপর অবতারিত। যা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এ গ্রন্থটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ বাণী বা কালাম। এটি সকল আসমানী কিতাবের সারনির্যাস। এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত। পবিত্র কুরআন মহানবী (স.) -এর ৪০ বছর বয়স থেকে পরবর্তী দীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী প্রয়োজনমতো অবতীর্ণ হতে থাকে। জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (স.) -এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন এবং মহানবী (স.) সাথে সাথে তা মুখস্থ করে নিতেন। অতঃপর তিনি কাতেবী ওহী তথা ওহী লেখক সাহাবীদের ডেকে কাগজ, চামড়া অথবা হাড়ে অবতারিত আয়াত অথবা সূরাহ লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন এবং তাঁর নির্দেশ তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হতো। সে সময় এমন একটা পরিবেশ ছিল সাহাবায়ি কিরাম অপেক্ষায় থাকতেন কখন কোন নির্দেশ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে। আর যখনই অবতীর্ণ হতো কোন সূরাহ অথবা আয়াত সাথে সাথে তাঁরা তা মুখস্থ করতে এবং প্রচার করতে সারাক্ষণই প্রচেষ্টা চালাতেন।

এভাবে অসংখ্য সাহাবী পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে নেন। মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীরা সাধারণ সালাতে এবং তাহজ্জুদ সালাতে নিয়মিত কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতেন এবং তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। তাঁরা সালাতে পুরো কুরআন মাজিদ পাঠ করতেন। অনেক সাহাবী তিন থেকে সাত রাত্রিতে কুরআন মাজিদ খতম করতেন। কেউ আরো একটু বেশি সময় নিয়ে যেমন ৩০দিন অথবা ৪০ দিনে খতম করতেন। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁদের নিকট অন্যতম আনন্দময় ও তৃপ্তিময় ইবাদাত। এভাবে মহান

আল্লাহ পবিত্র কুরআন মুমিনদের হৃদয়ে মুখস্থ রেখে ও নিয়মিত সালাতে খতমের মাধ্যমে কুরআনকে অবিকল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজে নিয়েছেন এবং সেটা তিনি বাস্তবে মানবজাতিকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআন অবতরণের একটি দিক হলো আল্লাহ ও মহানবী (স.)- এর মাঝখানে এমন কোনো মাধ্যম নেই যাতে এমন সন্দেহ থাকতে পারে যে, দুর্বলতার অবকাশের সুযোগ আছে। কেননা, মহানবী (স.) -এর নিকট কখনো কখনো সরাসরি প্রত্যাদেশ হয়েছে কখনো জিব্রাঈল (আ.), কখনও ইস্রাফিল (আ.) ওহী নিয়ে আসতেন ফলে এ রকম কোনো চিন্তার উদ্রেক হওয়ার সুযোগ নেই যে, মানবীয় দুর্বলতা হেতু কারো সমস্যা হতে পারে। কেননা, ওহী পৌঁছানোর মাধ্যম কোনো মানুষ ছিলেন না।

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন নাযিলের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১. ঘন্টাধ্বনির ন্যায়

অধিকাংশ সময় মহানবী (স.) -এর নিকট এ পদ্ধতিতে কুরআন নাযিল হতো। পাথরের উপর পাথরের আঘাত পড়লে যে রকম শব্দ হয় এ পদ্ধতিতে সে রকমই শব্দ হতো আর এ রকম শব্দকেই صلصلة الجرس বলা হয়। কেউ কেউ এটাকে ফেরেশতাদের পাখার মর্মর শব্দ বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য:

عن ابي هريرة يقول ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا قضي الله الا مر في السماء ضربت الملائكة باجنجتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة علي صفوان-

‘‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (স.) বলেছেন, আল্লাহ যখন আসমানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশের প্রতি বিনয়াবনত হয়ে পাখা নড়তে থাকেন। তা যেন পাথরের ওপর শিকলের আঘাত বলে মনে হয়।’’[২৭]

২৭ . ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩২

এ পদ্ধতিতে মহানবী (স.) -এর খুব কষ্ট অনুভূত হতো। তাঁর কর্ণকুহরে এ ঘন্টা ধ্বনি প্রবেশের পর তিনি আর কোনো কিছু শুনতেন না। কঠিন শীতের সময়েও তাঁর কপাল থেকে প্রচুর ঘাম ঝরে পড়তো। রাসূলুল্লাহ (স.) এ সম্পর্কে বলেন:

احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس و هو اشده علي فيقصم عني و قد وعيت عنه ما قال-

"কখনো কখনো আমার নিকট ঘন্টাধ্বনির ন্যায় ওহী আসতো। আর ওহী নাযিলের এ পদ্ধতি ছিল আমার নিকট সর্বাধিক কঠিন। অতঃপর আমার থেকে এ অবস্থার অবসান ঘটতো। আর ইতোমধ্যে তিনি যা বলেছেন তা আমি সংরক্ষণ করে নিয়েছি।"[২৮]

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন:

"ওহীর এ পদ্ধতিকে ঘন্টাধ্বণির সাথে উপমা দেয়ার কারণ হচ্ছে, ঘন্টাধ্বণি যেমন একাধারে আসতে থাকে অনুরূপভাবে ওহীর শব্দও একাধারে বিরতিহীনভাবে আসতে থাকে। কিন্তু মানবীয় ধ্বনি এর ব্যতিক্রম। কেননা, তার মধ্যে বিরতি আছে। অপরদিকে ঘন্টা যখন একাধারে বাজতে থাকে তখন শ্রবণকারী ব্যক্তির পক্ষে তার দিক নির্ণয় করা কষ্টকর হয়। কেননা, এটি চর্তুদিক থেকে আসতে থাকে। এমনিভাবে ওহীর ধ্বনিও সকল দিক থেকে আসতে থাকে। মূসা (আ.) যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার কালাম শুনতেন তখন তা সকল দিক থেকেই শুনতেন। প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করা ছাড়া এ ধ্বণির সঠিক উপলব্ধি হতে পারে না। এজন্য বিষয়টিকে সহজ করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (স.) এটাকে ঘন্টাধ্বণির সাথে তুলনা করেছেন। এ শব্দ আল্লাহ তা'আলার নিজের শব্দ। অন্য কারো শব্দ নয়। এ শব্দ আল্লাহ পাকের আরশের উপর থেকে শুরু হয়। আর এর পরিসমাপ্তি লাভ করে নবী করীম (স.) -এর নিকট পৌঁছে।"[২৯]

২. জিব্রাঈল (আ.) এর মানুষ্য আকৃতিতে আগমন

জিব্রাঈল (আ.) কখনও কখনও মানুষের আকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন। তিনি সাধারণত সাহাবী দেহইয়াহ কালবী (রা.) এর আকৃতিতে আসতেন। আবার কখনো কখনো অপরিচিত

---

২৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হা. ২

২৯ . ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

কোন ব্যক্তির আকৃতিতে আসতেন। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং মহানবী (স.) -এর বাণী প্রণিধানযোগ্য। মহানবী (স.) বলেনঃ

واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأني ما يقول

''কখনো কখনো ফেরেশতা আমার নিকট মানব আকৃতীতে আসতেন এবং আমার সাথে কথা বলতেন।তিনি যা বলতেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলতাম।" এ পদ্ধতিতে ওহী অবতরণ মহানবী সা. এর জন্য সহজতর ছিল।

৩. ফেরেশতার আপন আকৃতিতে আগমন

কখনো কখনো জিব্রাঈল (আ.) তাঁর আসল আকৃতিতে মহানবী (স.) -এর নিকট প্রকাশ পেতেন এবং তাঁর নিকট ওহী অবতরণ করতেন। এরূপ ঘটনা মহানবী (স.) -এর জীবনে মাত্র তিন বার ঘটেছে। একবার মহানবী (স.) জিব্রাঈল (আ.) কে আপন আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, দ্বিতীয়বার মিরাজের রাত্রিতে, তৃতীয় বার নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে। [৩০]

৪. সত্য স্বপ্ন

মহানবী (স.) এর নিকট ওহী অবতরণের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে সত্য স্বপ্ন। তাঁর নিকট ওহীর সুচনা হয়েছিলো এ পদ্ধতিতে। কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি যা স্বপ্ন দেখতেন তা দিবালোকের ন্যায় সত্যে পরিণত হতো। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা.) বলেনঃ

اول ما بدي به رسول الله صلي الله عليه وسلم من الوحي الرويا الصالحة في النوم فكان لا يري رويا الا جائت مثل فلق الصبح-

''রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট ওহীর সূচনা হয়েছিলো নিদ্রায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তখন তিনি যা স্বপ্ন দেখতেন তা সকালের ন্যায় বাস্তবায়িত হতো।''[৩১]

৫. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সরাসরি ওহী লাভ

কোনো কোনো রাসূল মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন, এক্ষেত্রে মূসা (আ.) এর নাম সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। মহানবী (স.) জাগ্রত অবস্থায় মিরাজের রাতে মহান আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। আবার ঘুমন্ত অবস্থাতেও তিনি আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) -এর বাণী প্রণিধানযোগ্য।

---

৩০. *প্রাগুক্ত*

৩১ . মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ২

তিনি বলেন:

اتاني ربي فقال فيم يختصم الملأ الاعلي؟

‘‘আমার রব আমার নিকট আগমন করেন। অতঃপর তিনি বলেন, উর্ধ্ব জগতের ফিরিশতাগণ কী নিয়ে মতানৈক্য করছে?”[৩২]

৬. অন্তরে নিক্ষেপ করা

জিব্রাঈল (আ.) কোনো কোনো সময় মহানবী (স.) -এর নিকট উপস্থিত হতেন না। তিনি মহানবী (স.) -এর অন্তরে ওহী প্রেরণ করতেন।

৭. ওহীয়ে ইসরাফিল (আ.)

কখনো কখনো জিব্রাঈল (আ.) না এসে হযরত ইসরাফিল (আ.) ওহী নিয়ে আসতেন।

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (স.) -এর নিকট ওহী আসার সাথে সাথে তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন এবং ওহী লেখকদের ডেকে তা লিখিয়ে নিতেন। সাহাবীরা ও তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। এভাবেই চলছিল মহানবী (সা.) এর যুগ পর্যন্ত। অতঃপর আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে একত্রিত করা আবশ্যকীয় হয়ে উঠলো।

কুরআন মাজিদ একত্রিকরণ: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পবিত্র কুরআন দু’ভাবে একত্রিত করা হয়েছে। **এক.** মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করার মাধ্যমে; **দুই.** লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে। উভয় বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে শুধু গ্রন্থাকারে একত্রিত করার বিষয়টি আলোচনা করা হবে। মহানবী (স.) -এর তিরোধানের পর ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব আবু বকর (র.) -এর হাতে ন্যাস্ত হয়। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর উপর বেশ কয়েকটি মুসিবত একযোগে আপতিত হয়। এর মধ্যে কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। কিছু লোক ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয় যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে। আবার ভন্ডনবীদের উৎপাত বেড়ে যায়। এ সকল ফিৎনা উৎখাতে আবু বকর (রা.) কঠোর

---

৩২ . জালালুদ্দীন সূয়ূতী, *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন* (মিশর: মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯০১ খ্রি.), খ. ১, ২য় প্রকাশ, পৃ. ৪৪

অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে যুদ্ধের ময়দানে এর ফয়সালা হয়। শেষ পর্যায়ে এ সকল ফিৎনা নির্মূলে তিনি সক্ষম হন। ভন্ড নবী মুসায়লামাতুল কায্যাবের সাথে ইয়ামামার প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে মুসায়লামা নিহত হয় এবং তার অনুসারীরা পরাজিত হয়। এ ফিৎনা এখানে নির্মূল হলেও মুসলিম উম্মাহর চরম মূল্য দিতে হয়। এ যুদ্ধে ৭০ জন হাফিজে কুরআন শাহাদাৎ বরণ করেন। কারো কারো মতে পাঁচশতজন হাফিজে কুরআন এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৩৩] এ ঘটনায় ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) বিচলিত হয়ে উঠেন। তার মনে এ বিষয়টি রেখাপাত করে যে, শুধু হাফিজে কুরআনদের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ রাখা ঝুকিপূর্ণ। কাগজের পাতায় সংরক্ষণের মাধ্যমে কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে রাখা অধিক নিরাপদ। এ প্রেক্ষিতে তিনি বিষয়টি আবু বকর (রা.) কে অবহিত করেন। আবু বকর (রা.) কিছুদিন চিন্তা-ভাবনার পর এতে সম্মতি প্রদান করেন। এ সম্পর্কে যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) বর্ণিত হাদীসখানা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

"যখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হলো সে সময় আবু বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন; ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বলেছে, শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক, আমি আশংকা করছি (ভবিষৎ যুদ্ধে হয়তো আরো হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করবেন) এভাবে কুরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি আপনি কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার নির্দেশ দিন। এর উত্তরে আমি ওমরকে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসুল (স.) করেননি সে কাজ আমি কীভাবে করবো ? ওমর (রা.) উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা হচ্ছে উত্তম কাজ। ওমর (রা.) এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন। আর আমি এর কার্যকারিতার কল্যাণকর দিক উপলব্দি করতে সক্ষম হলাম। এরপর আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি একজন বিজ্ঞ যুবক। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় নেই। এ ছাড়া তুমি মহানবী (স.) -এর ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন অনুসন্ধান কর এবং এর সবগুলো একত্রে গ্রন্থাকারে

৩৩. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন* (দেওবন্দ: কুতুবখানা নামিয়্যা, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৮১

সন্নিবেশ কর। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি পাহাড় একস্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে কুরআন একত্রিকরণের নির্দেশের চেয়ে কঠিন হতো না। এরপর আমি আবু বকর (রা.) কে বললাম, আপনি কীভাবে সে কাজ করবেন, যা আল্লাহর রাসূল (স.) করেন নি। আবু বকর (রা.) উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! এটি একটি উত্তম কাজ। আবু বকর (রা.) এ ব্যাপারে আমাকে ততক্ষণ অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি কুরআন (লিখিত অংশ সমূহ) সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম, যা খেজুরের ডাল, প্রস্তর খন্ড এবং লোকদের অন্তকরণ থেকে সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি সূরাহ তাওবার শেষ অংশ আবু খুযায়মা আল আনসারীর (রা.) নিকট থেকে সংগ্রহ করলাম এবং আমি এ অংশ তিনি ব্যতীত আর কারোও কাছে পাইনি। আয়াতটির অর্থ, লক্ষ্য কর! তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদেরই একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর জন্য দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তার কাম্য। মুমিনদের প্রতি তিনি সহানুভুতিসম্পন্ন ও করুণাময়।" গ্রন্থাবদ্ধ কুরআন আবু বকর (রা.) -এর নিকট গচ্ছিত ছিল। এরপর এ কুরআন ওমর (রা.) এর কাছে গচ্ছিত ছিল। অতঃপর ওমর (রা.) -এর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) -এর কাছে ছিল।"[৩৪]

যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে জানা গেল যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফিজে কুরআনের শাহাদাতে খলীফাতুল মুসলিমীন প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও শেষে এর অপরিহার্যতা তিনি অনুধাবন করে হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিতকে (রা.) এ কাজে নিয়োগ দিলেন। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) কুরআন একত্রিকরণে যে মূলনীতি অবলম্বন করেন তা নিম্নরূপ:

১. কোন ব্যক্তি কুরআন মাজিদের কোন অংশ তাঁর নিকট নিয়ে আসলে প্রথমে তিনি তাঁর নিজের হিফজের সাথে মিলিয়ে দেখতেন। উল্লেখ্য, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) নিজে ভালো হাফিজে কুরআন ছিলেন। সে সাথে মহানবী (স.) -এর দীর্ঘ সোহবত তিনি পেয়েছিলেন। এমনকি ওহী লিখক সাহাবীদের তিনি প্রধান ছিলেন।

---

৩৪ . মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ১৪৫, ১৪৬

২. ওমর ইব্‌নুল খাত্তাবও (রা.) হাফিজে কুরআন ছিলেন। আবু বকর (রা.) তাঁকেও যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) -এর সাথে এ মহতী কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁদের নিকট কুরআন মাজিদের কোন অংশ নিয়ে আসতেন তখন তিনিও তাঁর নিজের হিফজের সাথে মিলিয়ে নিতেন।[৩৫]

৩. কোনো লিখিত আয়াত তখনই গ্রহণযোগ্য হতো যখন দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দান করতেন যে, এ আয়াতও রাসূলুল্লাহ (স.) -এর সম্মুখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের সাথে এ সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো যে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (স.) -এর ওফাতের বছর তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি তা সাত হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩৬]

৪. লিপিবদ্ধ এ সকল আয়াত অন্যান্য সাহাবীদের নিকট লিপিবদ্ধ ও সংগৃহীত আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে যাচাই বাছাই করা হতো।

এ সহিফার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) কর্তৃক গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এ সহিফার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১. এ সহিফার প্রত্যেক আয়াত সে ভাবেই সজ্জিত করা হয় যে ভাবে মহানবী (স.) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আয়াতগুলোকে সাজিয়ে ছিলেন। তবে এ সহিফার সুরাহসমূহকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি। প্রত্যেক সূরাহ পৃথক পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো।[৩৭]

২. এ নুসখায় সাত হরফ সন্নিবেশিত ছিলো।

৩. এতে এমন সব আয়াত লিপিবদ্ধ করা হয় যে সকল আয়াতের তিলাওয়াত মানসুখ হয়নি।[৩৮]

---

৩৫. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *উলুমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

৩৬ . জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৩৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

৩৮. আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আলামিয়্যাহ, ১৯৭৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৫৩

৪. উম্মাহর সকল ব্যক্তি এ নুসখার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন। আর এ নুসখার প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সনদে প্রতিষ্ঠিত।[৩৯]

ওসমান (রা.) -এর যুগে কুরআন মাজিদ একত্রিকরণ

ওসমান (রা.) যখন ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন ইসলাম আরবের সীমানা ছাড়িয়ে রোম ও পারস্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং বিজিত অঞ্চল সমূহে দ্বীনের দাওয়াত চলতে থাকে এবং দলে দলে লোকজন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করতে থাকে। দায়ীদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী নও মুসলিমদের কুরআনের তালিম দিতে থাকেন। মহানবী (স.) তাঁর সাহাবীদের বিভিন্ন কিরাত তথা সাত হরফে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ এক কিরাতে কুরআন শিক্ষা নিয়েছেন কেউ বা অন্য কিরাতে কুরআন শিক্ষা নিয়েছেন। ক্বারী সাহাবীদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে সে স্থানে তাঁর কিরাত প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন শামে উবাই ইব্‌ন কাবের (রা.) তিলাওয়াত, কুফায় আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) -এর তিলাওয়াত প্রসিদ্ধ লাভ করে। এছাড়া অনেকে আবু মুসা আশয়ারী (রা.) -এর তিলাওয়াত পছন্দ করতেন। হরফ উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে ক্বারীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এ বিভেদ কঠিন আকার ধারণ করে। এ সময় একজন শিক্ষক তার পঠন পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। তেমনি অপর শিক্ষক তাঁর নিজস্ব পঠন পদ্ধতিতে (যা তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন) তাঁর শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা যখন একত্রিত হতো তখন তারা পবিত্র কুরআন পাঠে বিরোধিতায় লিপ্ত হতো। শিক্ষকদের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলে একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতো এমনকি পরস্পর পরস্পরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতো। কারণ এক নের পঠন পদ্ধতি অন্যজনের পঠন পদ্ধতির সাথে মিলতো না। বিষয়টি ওসমান (রা.) জানতে পারেন এবং তিনি এ বিষয়ে ভাষণ দান করে বলেন, তোমরা আমার নিকট মতবিরোধ করছ আর যারা দূরে অবস্থান করছে তারা হয়তো আরো কঠিন বিরোধে লিপ্ত হবে।

---

৩৯. *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

হিজায এবং হিজাযের বাইরের মুসলিমদের মাঝে কুরআন মাজিদের পঠন পাঠনে এক বিরাট পার্থক্য দেখা দেয়। লোকেরা যখন কোথাও একত্রিত হতো অথবা যুদ্ধের ময়দানে সমবেত হতো তখন কিরাআতের ইখতিলাফের কারণে পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতো। একে অপরের কিরাআতকে অস্বীকার করতো। এতে করে বিতর্ক সৃষ্টি হতো তা থেকে ঝগড়া-বিবাদ এমনকি রক্তপাতের আশঙ্কা দেখা দিতো। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা যেমনিভাবে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে মতবিরোধ করেছিল তেমনি মুসলমানরাও তাদের পবিত্র গ্রন্থের কিরাআত বিষয়ে এমন মতবিরোধে লিপ্ত হলো যে, তারাও যেন ইয়াহুদী খ্রিস্টনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। এ মতবিরোধের মূল কারণ ছিল সাত হরফে কুরআন মাজিদ সম্পর্কে সকলের জ্ঞান না থাকা। উল্লেখ্য, ক্বারী সাহাবীগণ সাত কিরাআত শিক্ষা না দিয়ে শুধু একটি কিরাতই শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া সকল কিরাআত সম্বলিত কোন মুসহাফ তাদের নিকট মওজুদ ছিল না যা দেখে উদ্ভুত বিরোধের অবসান করা যেত।[৪০]

উপর্যুক্ত সংকট সমাধানে আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইব্ন আফফান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ বৈঠকে বসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.) -এর যুগে একত্রিত কুরআন মাজিদের কপি থেকে আরও কপি করে তা বিভিন্ন শহরে পাঠিয়ে দিতে হবে। সে সাথে এ নুসখা ব্যতীত অন্যান্য নুসখা বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা কপিও আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।[৪১] ওসমান (রা.) এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য চারজন বিশিষ্ট হাফিয সাহাবীকে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ হলেন, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা.), সাঈদ ইব্ন্ুল আস (রা.) ও আব্দুর রহমান ইব্নুল হারিস ইব্ন হিশাম (রা.)। ওসমান (রা.) উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) -এর নিকট থেকে আবু বকর (রা.) কর্তৃক একত্রিত কুরআন মাজিদের সহীফাসমূহ চেয়ে নেন। সে সাথে তিনি কুরআন একত্রিকরণ বোর্ডকে এ নির্দেশনা দেন যে, যদি কোন আয়াতের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা কুরায়শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা, কুরআন মাজিদ কুরায়শী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, যায়িদ

---

৪০ . *মানাহিলুল ইরফান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬

৪১. *প্রাগুক্ত*,

ইব্‌ন সাবিত (রা.) ব্যতীত বোর্ডের অন্য তিন জন সদস্য কুরায়শী ছিলেন। উপর্যুক্ত বোর্ড ওসমান (রা.) এর নির্দেশনা মোতাবেক সহীফাগুলোকে বিভিন্ন মুসহাফে রূপান্তর করেন। হাফসা (রা.) -এর কপিটি তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ছাড়া কুরআন মাজিদের অন্যান্য সহীফাকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়।[৪২]

উল্লেখ্য, আমীরুল মুমিনীন ওসমান (রা.) -এর নির্দেশনায় গ্রন্থাবদ্ধ এ মুসহাফটি মুসহাফে ওসমানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য মুসলিম উম্মাহ হযরত ওসমান (রা.) কে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাকে 'জামিউল কুরআন' নামে অভিহিত করা হয়। যদিও কুরআন মাজিদ সর্বপ্রথম একত্রিকরণ করেন আমীরুল মুমিনীন হরযত আবু বকর (রা.)। ওসমান (রা.) আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর নুসখা থেকেই বিভিন্ন কপি করেন এবং সকল পাঠকারীকে একটি কিরাআতের উপর একত্রিত করেন। তিনি আটটি কপি লিপিবদ্ধ করান। এ আটটি কপি থেকে একটি মক্কায়, একটি সিরিয়ায়, একটি বসরায়, একটি কুফায়, একটি ইয়েমেনে, একটি বাহরাইনে ও একটি কপি মদীনায় সংরক্ষিত রাখেন। ওসমান (রা.) কর্তৃক সিরিয়ায় প্রেরিত মুসহাফটি দামিশকের জামে মসজিদে সংরক্ষিত আছে। অপর একটি মুসহাফ ইস্তাম্বুলের রাজকীয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।[৪৩]

মুসহাফে ওসমানীর বৈশিষ্ট্য

১. মুসহাফে ওসমানীতে আয়াত লিপিবদ্ধ করার পূর্বে সাহাবীদের (রা.) নিকট পেশ করা হতো। অতঃপর তাঁরা যদি স্বীকৃতি দিতেন এবং আবু বকর (রা.) -এর মুসহাফে আয়াতটি যদি সেভাবেই থাকতো যেভাবে তারা রাসুলূল্লাহকে (স.) তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। সেই সাথে আয়াতটি মানসুখ হয়নি। তখনই আয়াতটি লিপিবদ্ধ করা হতো।

২. এ মুসহাফে একাধিক ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থানে একটি কিরাআত লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন : সূরাহ জুমুআর নবম আয়াতে فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ এর পরিবর্তে فامضوا الي ذكر الله লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (করাচি: কারখানা তেজারতে কুতুব, ১৯৬১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭৪৬

৪৩. ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

৩. মুসহাফে ওসমানীতে নুকতা সংযোজন করা হয়নি। এর ফলে একই শব্দই বিভিন্নরূপে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমনঃ সূরাহ হুজুরাতের ষষ্ঠ আয়াতে آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا আয়াতে فتبينوا শব্দটিতে নুকতা দেয়া হয়নি। এতে শব্দটিকে فتثبتوا ও পড়া যায়।[৪৪]

ওসমান (রা.) যে সকল অঞ্চলে কুরআন মাজিদের মুসহাফ প্রেরণ করতেন তার সাথে তিনি অভিজ্ঞ তিলাওয়াতকারী হাফেযদের পাঠাতেন। ফলে নুকতা না থাকলেও কুরআন মাজিদ পাঠে কোন সমস্যা হতো না। নুকতা না থাকায় সবকয়টি কিরাআতেই তিলাওয়াত করা সহজ হতো। আর সে যুগে নুকতা প্রদানকে দোষণীয় মনে করা হতো। পরে অনারবদের প্রয়োজনে আরবী বর্ণমালায় নুকতা সংযোজন করা হয়।[৪৫]

৪. যে সকল ক্ষেত্রে শব্দের রূপ ভিন্ন ভিন্ন সে সব ক্ষেত্রে একটি মুসহাফে একটি রূপ অপর মুসহাফে অন্য একটি রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটা এজন্য করা হয় যাতে দু'টি কিরাআতকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়া যায়। যেমনঃ

ووصي بها ابراهيم بنيه و يعقوب -

এ আয়াতটি একটি মুসহাফে وصي তাশদীদ সহ অপর মুসহাফকে তাশদীদ ছাড়া اوصي লেখা হয়। এ পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণ ছিল নিম্নরূপঃ

ক. একই স্থানে পাশাপাশি দু'টি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে লেখা হলে এ সন্দেহের সৃষ্টি হতো যে, শব্দটি দু'বার দু'ভাবে নাযিল হয়েছে।

খ. একটি কিরাআত মূল কুরআনে অপর কিরাআত পাদটীকায় লেখাও তারা সঠিক মনে করেননি। কারণ এতে কেউ ধারণা করতে পারে যে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির তাসহীহ। তাছাড়া কোন কারণ ব্যতিরেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া যায় না।[৪৬]

---

৪৪ . আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬-২৫৮

৪৫. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ* (ঢাকাঃ আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, তা. বি.), পৃ. ১৭

৪৬ . আব্দুল আযীম আয-যারকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৫. আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -এর মুসহাফে আয়াতসমূহ পর্যায়ক্রমে সাজানো ছিল সূরাহগুলো সাজানো ছিল না। মুসহাফে ওসমানীতে আয়াত এবং সূরাহ উভয়গুলোই পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করা হয়।[৪৭]

৬. সাহাবায়ি কিরাম কর্তৃক লিখিত মুসহাফে কোথাও কোথাও আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অথবা নাসিখ মানসুখের বর্ণনা থাকলেও মুসহাফে ওসমানীতে কুরআন মাজিদ ছাড়া কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল না।[৪৮]

ওসমান (রা.) -এর এ মহতী উদ্যোগ সফল হয় এবং মুসলিম উম্মাহ বড় ধরনের একটি ফিতনা থেকে রক্ষা পায়। গোটা জাতি তাঁর এ মহান কর্মকে সাদরে গ্রহণ করে। আর তিনি জামিউল কুরআন অভিধায় অভিষিক্ত হন। পরবর্তী সময়ের একদল ভ্রান্ত লোক তাঁর এ মহান কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা করলে সাহাবায়ি কিরাম এসবের প্রতিবাদ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) -এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আবু বকর আল আসবারী সুয়াইদ ইব্‌ন গাফালা থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন:

سمعت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يقول : يا معشر الناس! اتقوا الله و اياكم و الغلو في عمثان، و قولكم: حراق مصاحف فوالله ما حرقها الا عن ملأمنا اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم -

আমি আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "হে জনমন্ডলী, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা ওসমান (রা.) সম্পর্কে সীমা অতিক্রম করা থেকে নিজের রক্ষা কর। আর এ মন্তব্য থেকেও বিরত থাক যে, তিনি মুসহাফসমূহের দাহনকারী। আল্লাহর কসম! তিনি তা জ্বালাননি, তবে তিনি আমাদের অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (স.) -এর সাহাবীগণের পরামর্শেই এ কাজ করেছেন।"[৪৯]

---

৪৭. ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

৪৮. আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

৪৯ . ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

কুরআন মাজিদ মহান আল্লাহর কালাম। এটি মহানবী (স.) -এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'আলা নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং এ দায়িত্বের প্রত্যক্ষ ফলাফল আমরা অবলোকন করেছি। আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণ করেছেন তাঁর বান্দাদের মাধ্যমেই। এ সংরক্ষণ তিনি এমনভাবে করেছেন যাতে কেউ কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে না পারে। কুরআন একত্রিকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে কোন ব্যাক্তি এ বিষয়ে একমত হবেন যে, পবিত্র কুরআন সর্বোত্তম বৈষয়িক পন্থায় একত্রিত হয়ে গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহর কর্মপদ্ধতিতো এরকমই যে, স্বাভাবিক ও বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কর্মটিকে গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। কুরআন মাজিদ একত্রিকরণের ধারাবাহিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তা'আলারই গায়েবী ইশারা বৈ কিছু নয়। মহানবী (স.) -এর উপর যখনই কুরআন অবতীর্ণ হতো সাথে সাথে তিনি তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন সে সাথে কাতিবে ওহীদের ডেকে লিখিয়ে নিতেন। এভাবে আর কোন আসমানী কিতাব নবী (আ.) কর্তৃক লিখে রাখার ইতিহাস নেই। মহানবী (স.) -এর তিরোধানের পর পর ওমর (রা.) -এর পরামর্শে প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক কুরআন মাজিদ একত্রিত হয়ে যায়। অতঃপর হুযায়ফা ইব্‌ন ুল ইয়ামান (রা.) -এর পরামর্শে ওসমান (রা.) -এর মহান উদ্যোগ পবিত্র কুরআনকে মানবজাতি গ্রন্থাকারে সজ্জিত অবস্থায় পায় যা আজও আমাদের সামনে উপস্থিত। লাওহে মাহফুজে কুরআন মাজিদ যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই মানবজাতির কাছে গ্রন্থাকারে কুরআন মাজিদ সংরক্ষিত আছে। এটি মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও দয়ার ফলেই হয়েছে।

হাদীস বা সুন্নাত রাসূল (স.)

ওহী দুপ্রকার। ওহীয়ে মাতলু ও ওহীয়ে গাইরে মাতুল। ওহীয়ে মাতলু হচ্ছে সরাসরি ওহী বা প্রত্যাদেশ। আল কুরআনুল কারীম ওহীয়ে মাতলু। আর ওহীয়ে গাইরে মাতলু যা সরাসরি প্রত্যাদেশ নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা যা তিনি মহানবী (স.) -এর উপর নাযিল করতেন আর তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীদের বলতেন, শিক্ষা দিতেন, মুখস্থ করাতেন এবং লিখাতেন। কুরআন মাজিদে প্রথম প্রকার ওহীকে কিতাব ও দ্বিতীয় প্রকার ওহীকে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ-

"আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল সা. প্রেরণ করেছেন, তিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ তাদেরকে শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল।"[৫০]

ওহীয়ে গাইরে মাতলুর অপর নাম হাদীস বা সুন্নাত। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় এ প্রকার ওহী এ নামে সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছে। হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ সংবাদ, কথা, বাণী, নতুন বিষয়।[৫১] ইসলামী শরীয়াহর পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (স.) -এর কথা, কাজ ও অনুমোদন বা মৌন সম্মতিকে হাদীস বলে। রাসূলুল্লাহ (স.) মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশের আলোকে যা বলেছেন, করেছেন এবং অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয়।[৫২] মুহাদ্দিসগণের মতে, যে কথা, কাজ ও অনুমোদনকে রাসূলুল্লাহ (স.) -এর বলে প্রচার করা হয়েছে তাকে হাদীস বলে। সাহাবী ও তাবিয়ীদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেও হাদীস বলে।

বর্ণনার ধারাবাহিকতার দিক থেকে হাদীসের প্রকারভেদ

বর্ণনার ধারাবাহিকতার দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার। ক. মারফু হাদীস, খ. মাউকুফ হাদীস ও গ. মাকতু হাদীস। রাসূলুল্লাহ (স.) -এর কথা, কাজ ও অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে মারফু হাদীস বলে। সাহাবীদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে মাওকুফ হাদীস বলে। তাবেয়ীদের কথা, কাজ অনুমোদনকে মাকতু হাদীস বলে।[৫৩]

---

৫০. আল-কুরআন, ৩ : ১৬৪

৫১ . ইব্‌ন মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, ২য় প্রকাশ, পৃ. ১৩১-১৩৪

৫২ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

৫৩ . জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাবী ফি শরহে তাকরীবুন নববী* (করাচি: মীর মুহাম্মদ কুতুব, ১৯৭২ খ্রি.), খ. ১, ২য় প্রকাশ, পৃ. ১৮৩

শুদ্ধাশুদ্ধির দিক থেকে থেকে হাদীসের প্রকারভেদ

মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে হাদীস হচ্ছে, এমন কথা, কর্ম ও অনুমোদন যা রাসূলুল্লাহ (স.) -এর বলে প্রচার বা দাবী করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যাই দাবী করা হয়েছে তাই কি হাদীস ? নাকি এতে কোন মিথ্যাচার আছে এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ যাচাই করে বিভিন্ন প্রকার ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। মহানবী (স.) তাঁর জীবদ্দশায় পবিত্র কুরআনের প্রতি সাহাবীগণকে (রা.) বেশি উৎসাহিত করেছেন। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তিনি মুখস্থ করতেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে ওহী লেখক সাহাবীদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। কুরআনের ব্যাখ্যা তথা হাদীসের ব্যাপারে এরূপ কোন ভূমিকা রাসূল (স.) নেননি। এটা এজন্য হতে পারে যে, কুরআন মাজিদ অনেক সাহাবীই বিভিন্ন পাত্রে লিখে রাখতেন। এখন যদি হাদীসকেও লিখে রাখেন তাহলে হাদীসকেও ভুশবশতঃ কেউ কুরআন বলতে পারে। ফলে নানাবিদ ফিৎনার জন্ম হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তবে মহানবী (স.) সাহাবীদেরকে মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন। এ ক্ষেত্রে হাদীস মুখস্থ করা ও বর্ণনা বা প্রচার করার ব্যাপারে তিনি উম্মাহকে সতর্ক করে দেন এ বলে যে, তাঁর নামে যেন কেউ মিথ্যা না বলে। যদি কেউ তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করে অর্থাৎ যা তিনি বলেননি, করেননি অথবা অনুমোদন দেননি এ রকম করলে তার শাস্তি যে জাহান্নাম তাও তিনি জানিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে আবু সাইদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ

لا تكتبوا عني و من كتب عني غير القران فاليمحهه و حدثوا عني و لا حرج و من كذب علي متعمدا فاليتبوأ مقعده من النار-

''তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু লিখবে না। যদি কেউ কুরআন ছাড়া আর কিছু লিখে থাক তাহলে তা মুছে ফেলবে। তোমরা আমার হাদীস মৌখিক ভাবে বর্ণনা কর, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।''[৫৪]

৫৪ . মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, হা. ২২৯৮

মাদানী জীবনের শেষ দিকে মহানবী (স.) হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন।[৫৫] রাসুলুল্লাহ (স.) এর যুগে হাদীস তেমন লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অল্প কয়েকজন সাহাবী নিজ উদ্যোগে কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। অধিকাংশ সাহাবীই মহনবী (স.) -এর বাণী, কর্ম তথা শিক্ষা অতি যত্নের সাথে মুখস্থ করতেন, পরস্পর আলোচনা করতেন এবং সেভাবে জীবন পরিচালনা করতেন।[৫৬]

মহানবী (স.) হাদীস হুবহু মুখস্থ করে বর্ণনা করতে নির্দেশ দিতেন আবার সতর্ক করেও দিয়েছেন যাতে কেউ তাঁর নামে মিথ্যা চালিয়ে না দেয়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর নামে মিথ্যা প্রচারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। একশত জন সাহাবী এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণও এদের মধ্যে শামিল আছেন। এতো বেশিসংখ্যক সাহাবী আর কোনো বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেননি, মহানবী (স.) যাচাই করার মাধ্যমে হাদীস গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যাচাই ছাড়া কেউ হাদীস গ্রহণ করলে এ ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে মিথ্যা বলার পাপে দায়ী হবেন।[৫৭]

উল্লেখ্য, মহানবী (স.) উম্মাহকে সতর্ক করেছেন এ বলে যে, উম্মাহর মধ্যে জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাব ঘটবে।[৫৮] মহানবী (স.) -এর প্রতিটি কথাকে সাহাবায়ি কিরাম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এক্ষেত্রেও ব্যত্যয় ঘটেনি। সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমন অনেক সাহাবী ছিলেন যারা নিজ হাতে লিখিত হাদীসের খাতা আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন শুধু এজন্য যে, যদি তাতে এমন কিছু থাকে যা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেননি। সাহাবীগণ অন্যের বর্ণিত হাদীস যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণ করতেন না। বর্ণনার বিশুদ্ধতায় সন্দেহ হলে বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রশ্ন করে অথবা বর্ণনাকারীকে শপথ করিয়ে বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। এ ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ অথবা সংশয় দেখা দিলে তা প্রত্যাখ্যান

---

৫৫. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

৫৭ . মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, হা. ১০

৫৮ . *প্রাগুক্ত*, হা. ১২

করতেন। সাহাবীগণ সাহাবী ব্যতীত অন্য কারো বর্ণিত হাদীস সনদ ছাড়া গ্রহণ করতেন না। সাহাবীদের পরবর্তীতে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তাঁদের নিকট হাদীস দু'রকমের হয়েছে। যে গুলো যাচাই-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে সেগুলো সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর যাচাই-বাছাইয়ে যে হাদীসগুলো উত্তীর্ণ হয়নি সেগুলোকে যয়ীফ হাদীস বলে অভিহিত করা হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের মতে যে হাদীসের মধ্যে পাঁচটি শর্ত পূরণ হয়েছে। তাকে সহীহ হাদীস বলে। শর্ত পাঁচটি হচ্ছে:

১. আদালত : সংশ্লিষ্ট হাদীসের সকল রাবী পরিপূর্ণ সৎ বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হতে হবে।
২. দাবত: বর্ণনাকারীগনের মেধা ও স্মৃতিশক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রমাণিত হতে হবে।
৩. ইত্তিসাল: সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর উর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত হতে হবে।
৪. শুযুয থেকে মুক্ত : হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত হতে হবে।
৫. ইলাল থেকে মুক্ত: হাদীসটির মধ্যে কোনো প্রকার সুক্ষ্ম সনদগত অথবা অর্থগত ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

উপযুক্ত শর্তসমূহের মধ্যে প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক আর শেষ দুটি শর্ত অর্থ কেন্দ্রিক। শেষ দুটি শর্তে সামান্য কিছু ত্রুটি থাকলে হাদীসটি হাসান বলে গণ্য হতে পারে।[৫৯] উপর্যুক্ত পাঁচটি শর্ত না থাকলে হাদীসটি যয়ীফ বা দুর্বল অথবা মাউযু বা বানোয়াট হাদীস হতে পারে। ইসলামী মতাদর্শের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসই মূল ভিত্তি। তার উপরই নির্ভর করে বিশ্বাসের প্রাচীর নির্মান করতে হবে। সকল যুগের সকল আলিম ও ইমাম এ বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন। তাঁরা সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করেই আকীদা বিষয়ক জ্ঞান জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা(রহ.) এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

اذا جاء الحديث الصحيح الاسناد عن النبي عليه السلام اخذنابه لم نعده-

---

৫৯ . জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৭৪

‘‘রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তার উপরই আমরা নির্ভর করবো, তার বাইরে থাকবো না।’’[৬০]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আরো বলেন:

و سائر علامات يوم القيامة علي ما وردت به الاخبار الصحيحة حق كائن

‘‘কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্ভাবাস। যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা সবই সত্য এবং ঘটবেই।’[৬১]

বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক থেকে হাদীসের প্রকারভেদ

বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করে সহীহ হাদীস দু’প্রকার   (এক) মুতাওয়াতির   (দুই) আহাদ।

মুতাওয়াতির

মুতাওয়াতির শব্দটি আরবি। এটি تواتر ক্রিয়ামূল থেকে উৎকলিত। এর অর্থ ধারাবাহিকতা। সুতরাং মুতাওয়াতির (متواتر) শব্দের অর্থ ধারাবাহিক।[৬২] এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى

“অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি।”[৬৩]

মুহাদ্দিসগণের মতে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয় এমন হাদীসকে যে হাদীস অনেক রাবী বর্ণনা করেছেন। সাধারণ বিবেক তাদের মিথ্যার যোগসাযস মুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। [৬৪] অর্থাৎ যে হাদীস রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে অনেক সাহাবী, প্রত্যেক সাহাবী থেকে অনেক তাবেয়ী, প্রত্যেক

---

৬০ . ইউসুফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল বার, *আল-ইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসা* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ১৪৪

৬১ . মোল্লা আলী কারী, *শারহুল ফিকহিল আকবার* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রি.), ১ম প্রকাশ, পৃ. ১৯০-১৯২

৬২ . ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮৮৫

৬৩ . আল-কুরআন, ২৩ : ৪৪

৬৪ . ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয-যুহাইলী, *আল ওয়াজীয ফী উসুলিল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশক: দারুল খাইর লিত্তবা‘আতি ওয়ান নাশরি ওয়াত্তাওরী, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৬

তাবেয়ী থেকে অনেক তাবে তাবেয়ী বর্ণনা করেছেন এভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে সংকলন পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে অনেক রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। কোনো যুগেই এতোগুলো মানুষের এক সাথে কোন মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যেমন: সালাতের ওয়াক্ত ও রাকাআত সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি।[৬৫] । মুতাওয়াতির হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে, এর জন্য কোনো নির্ধারিত সংখ্যা নেই। এমন সংখ্যক হওয়া আবশ্যক যার মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়।[৬৬]

মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী

মুতাওয়াতির হাদীস হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যেমন:

এক. বর্ণনা ইন্দ্রিয়ভিত্তিক হতে হবে, বুদ্ধিভিত্তিক নয়। অর্থাৎ বর্ণনা দেখা, শোনা ও ছোয়া ইত্যাদি ভিত্তিক হতে হবে।

দুই. বর্ণনাকারী সমান সংখ্যক, সংখ্যা মধ্যম শ্রেণির আর বর্ণনার ভিত্তি ইন্দ্রিয়নির্ভর হতে হবে।

তিন. বর্ণনাকারীর সংখ্যা এমন হতে হবে যে, তাদের বাসস্থান, গোত্র, আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তারা যোগসাজশ করে মিথ্যা বলছে এমন দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে। আলিমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ জাতীয় হাদীস অকাট্য বলে সাব্যস্ত। এর দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। এ প্রকার হাদীস অস্বীকারকারী কাফির বলে গণ্য হবে।

আহাদ হাদীস

যে হাদীস সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত এক বা দুইজন অথবা এমন সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যা মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয় তাকে ‘আহাদ’ হাদীস বলে। এ জাতীয় হাদীস তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন:

ক) গরীব: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে একজন মাত্র রাবী রয়েছেন, তাকে গরিব হাদীস বলে।

---

৬৫ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

৬৬ . ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৫

খ) আযীযঃ যে হাদীসে সনদের মধ্যে কোন এক পর্যায়ে দুইজন মাত্র রাবী রয়েছেন, তাকে আযীয হাদীস বলে।

গ) মুস্তাফিযঃ যে হাদীসে সনদের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুইজনের বেশি কিন্তু অনেক তথা মুতাওয়াতিরের সমান নয় তাকে হাদীসে মুস্তাফিয বলে। একে মাশহুর হাদীস ও বলা হয়। অনেক মুহাদ্দিসের মতে, যে হাদীসের সনদের মধ্যে সাহাবীগণের যুগে দু'একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন অতঃপর তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ীদের যুগ থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে তাকে মাশহুর হাদীস বলে।[৬৭]

মুতাওয়াতির হাদীস যারা সুনিশ্চিত জ্ঞান (العلم القطعي) অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস (اليقين) লাভ করা যায়। এ প্রকার হাদীস অস্বীকার করলে কুফরী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। পবিত্র কুরআনের পরই এ প্রকার হাদীস ইসলামী আকীদার ভিত্তি।

মাশহুর হাদীস দ্বারা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান (العلم الطمانينة) অর্জিত হয়। এ প্রকার হাদীস অস্বীকার করলে কুফরী সাব্যস্ত হবে না তবে বিভ্রান্তি হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রকার হাদীস আকীদার ভিত্তি হিসেবে অধিকাংশ ফকীহদের নিকট গ্রহণযোগ্য । এছাড়া একক বর্ণনার সহীহ হাদীসও আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। তবে এ প্রকার হাদীস সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না বরং তা কার্যকর ধারণা (العلم الظني) প্রদান করে। এ ধরনের হাদীসের উপর সাধারণত আকীদার মৌলিক বিষয়ে নির্ভর করা হয় না তবে মৌলিক বিষয়ের ব্যাখ্যায় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার উপর নির্ভর করা যায়। কর্ম বিষয়ক হালাল, হারাম ইত্যাদি বিধি বিধানের ক্ষেত্রে এ প্রকার হাদীসের উপর নির্ভর করা হয়।[৬৮] অনেক আলেমের মতে সহীহ হাদীস যদি 'খাবারুল ওয়াহিদ' হয় এবং তা তাবেয়ীদের যুগে না হলেও তা তাবে তাবেয়ীদের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে তবে আকীদার ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করা যায়।[৬৯]

---

৬৭ . ড. মুহাম্মদ যিয়াউর রহমান আযামী, *মু'জামু মুসতালাহাতিল হাদীস* (রিয়াদঃ মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১ম প্রকাশ, পৃ. ১৪-১৬

৬৮ . রহমাতুল্লাহ কিরানবী, *ইযহারুল হক* (রিয়াদঃ আর রিয়াসাতুল আম্মাহ, দারুল ইফতা, ১৯৮৯ খ্রি.), খ.৩. পৃ. ৯২৩

৬৯ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

হিজরী ২য় ও তৃতীয় শতাব্দীর মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এমন সহীহ হাদীস যা তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণ করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ড খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন:

"আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম তাহাবী (রহ.) এর বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, আকীদার বিষয়েও তারা সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতেন, এ বিষয়ক হাদীস মুতাওয়াতির হতে হবে তা শর্ত করেন নি। পার্থক্য এই যে, কুরআনে উল্লেখিত বা মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কোনো বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফুরী বলে গণ্য হয়। আর খারারুল ওয়াহিদের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত বিষয় অস্বীকার করলে তা বিভ্রান্ত বলে গণ্য হয়।"[৭০]

সহীহ হাদীসের উৎস

ইসলামী মতাদর্শের উৎস পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস। পবিত্র কুরআন সাহাবীদের যুগেই গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ অথবা সংশয় নেই। মহানবী (স.) এর তিরোধানের ৯০ বছর পর থেকে পরবর্তী ২০০ বছরের মধ্যে তাঁর নামে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও অনুমোদন বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সনদসহ সংকলিত হয়।[৭১] শুধু হাদীস বিষয়ক গ্রন্থেই নয় তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে ও সনদসহ হাদীস সংকলিত হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হাদীস সংকলনকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁরা সহীহ, যয়ীফ, মাউযু সকল প্রকার হাদীস সনদসহ সংকলন করতেন, তাঁরা মনে করতেন যেহেতু সনদসহ হাদীস সংকলন করা হয়েছে সেহেতু কোনটি সহীহ, কোনটি যয়ীফ, কোনটি মাউযু তা বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু সনদ উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং পাঠক নিজেই তা বিচার করে নিবেন। তবে অল্প সংখ্যক মুহাদ্দিস এমন ছিলেন যারা শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন। কোনো গ্রন্থে হাদীস সনদসহ উল্লেখ থাকলেই তা সহীহ নয় বরং বেশির ভাগ কিতাবের হাদীস যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণ করা সঠিক কাজ নয়। কেননা, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের মুহাদ্দিসদের সংকলন পন্থা ছিল সহীহ,

---

৭০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

যয়ীফ, মাউযু, বাতিল সকল প্রকার হাদীস সনদসহ সংকলন করা। তারা মনে করতেন সনদ সহ বর্ননার অর্থ হচ্ছে হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়টি রাবীদের উপর চলে যাওয়া এক্ষেত্রে সংকলকের কোন দায় থাকে না। [৭২]

হাদীস সংকলনের সঠিক ইতিহাস ও মুহাদ্দিসগণের সংকলন পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেকেই এ ভ্রান্তিতে পতিত হয় যে, গ্রন্থাবদ্ধ সকল হাদীসই সহীহ। এ ছাড়া সমাজে এ ধারণার লোকের অভাব নেই যে, বড় বড় আলেমগণ হাদীস নামে যা সংকলন করেছেন তা অবশ্যই যাচাই-বাছাই করেই সংকলন করেছেন সুতরাং তাদের সংকলিত সকল হাদীসই সহীহ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) হাদীসের গ্রন্থগুলোকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তিনটি সহীহ হাদীসের সংকলন গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক। এ তিন গ্রন্থের সনদসহ বর্ণিত সকল হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ: সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসাঈ, সুনানু তিরমিযী, মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও সুনানু ইব্‌ন মাযাহ এ পর্যায়ের গ্রন্থ। এ গ্রন্থগুলো মুসলিম উম্মাহর নিকট যোগ্য হলেও এ সকল গ্রন্থের সকল হাদীস সহীহ নয়। এগুলোর মধ্যে অনির্ভর যোগ্য হাদীসরও বিদ্যমান রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থের উপরই নির্ভর করেছেন। [৭৩]

তৃতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থগুলো ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমূখ মুহাদ্দিসগণের পূর্বে অথবা পরে সংকলিত হয়েছে। এ পর্যায়ের গ্রন্থগুলো হচ্ছে: মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, মুসান্নাফে ইব্‌ন আবী শাইবা, মুসনাদে আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ, মুসনাদে তায়ালিসী, ইমাম বায়হাকীর সুনানে কুবরা, দালাইলুন নবুওয়াত, শুয়াবুল ঈমান ইত্যাদি, ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ শারহু মায়ানিল আসার, শারহু মুশকিলিল মুজামুল কবীর, ইমাম তাবরানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ আল মু'জামুল আওসাত, আল মুজামুল সগীর ইত্যাদি। এ সকল গ্রন্থ মুহাদ্দিসগণের নিকট তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এ সকল গ্রন্থে সহীহ, যয়ীফ,

---

৭২. আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার আসকালানী, *লিসানুল মিযান* (বৈরুত: মুআসসাসাতুল আলামী, ১৯৮৬ খ্রি.), ৩য় প্রকাশ, পৃ. ৭৪

৭৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

মাউযু ও বাতিল সকল প্রকার হাদীস বিদ্যমান। বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ব্যতীত এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়।[৭৪]

চতুর্থ পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থগুলো উপর্যুক্ত সংকলন গ্রন্থের কয়েকযুগ পরে সংকলিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইব্‌নু হিববানের আদ দুয়াফা, ইব্‌নু আছীরের আল কামিল, এ ছাড়া খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম আল আসফাহালী, ইব্‌নু আসাফির, ইব্‌নুন নাজ্জার ও দায়লামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ। এ সকল গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়ক হাদীস স্থান পেয়েছে: (১) যে সকল হাদীস পূর্বযুগে অপরিচিত অজানা থাকার কারণে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে স্থান পায়নি। (২) যে সকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল। (৩) লোকমুখে প্রচলিত ও ওয়ায়েজদের প্রচারিত বিভিন্ন কথা যা কোনো কোনো হাদীস গ্রন্থে স্থান পায়নি। (৪) বিভিন্ন দুর্বল ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কথাবার্তা। (৫) যে সকল হাদীস গ্রন্থ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, ইয়াহুদীদের গল্প, পূর্ববর্তী যামানার হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। (৬) কুরআন বা হাদীসের কোন ব্যাখ্যামূলক কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎমানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। (৭) হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূর্বক হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। (৮) বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের বাক্যকে একটি হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এ পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থ সমূহের হাদীস হয় দুর্বল নয়তো মাউযু বা বানোয়াট। এ ধরনের গ্রন্থ পাঠ করা বিলাসিতা বৈ কিছু নয়। এ সকল হাদীস দ্বারা কোনো মতের দলিল গ্রহণযোগ্য নয়।[৭৫]

পঞ্চম পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থসমূহে উপর্যুক্ত চার পর্যায়ের গ্রন্থে যে সকল হাদীসের অস্তিত্ব নেই তাই পাওয়া যায়। এ গ্রন্থ সমূহে সূফী, ফকীহ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচলিত ও তাদের লেখা বইয়ে উল্লেখিত হাদীসই এ সব গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সকল গ্রন্থে এমন সব হাদীস রয়েছে যা কোনো ভাষাজ্ঞানী পাপাচারী পন্ডিত ব্যক্তি তৈরি করেছেন। এ সকল হাদীসের কথা ও ভাষা এমন সুন্দর মনে হয় যে, এ সব হাদীস, হাদীস বিষয়ে বিশেষক্ত পন্ডিত আলিম ছাড়া

---

৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮

এ সকল বানোয়াট হাদীস নির্ণয় সম্ভব নয়। এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপর্যয় ও ফিৎনা সৃষ্টি করেছে।[৭৬]

ইসলামী মতাদর্শের উৎস হিসেবে কুরআন মাজিদ ও হাদীস

''পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামী মতাদর্শের মূল ভিত্তি দু'টি একটি কুরআন মাজিদ অন্যটি হাদীস। পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে এটি আল্লাহর কালাম। অতঃপর বাস্তবতার আলোকে দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণ কুরআন মাজিদ মহানবী সা. এর উপর অবতীর্ণ হয়। কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তায়ারা গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চিতরূপে আমি তার সংরক্ষক।"[৭৭]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ – لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

''অবশ্যই এটি এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোনো অসত্য এতে অনুপ্রবেশ করে না বা করবে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়। প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে তা অবতীর্ণ।''[৭৮]

পবিত্র কুরআন এমন এক মহিমান্বিত গ্রন্থ যা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য অবতারিত হয়েছে। এটি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। এটি জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে সত্য, সুন্দর কল্যাণকর পথে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআন যাবতীয় পাপাচার, কুসংস্কার ও জাহিলিয়্যাত থেকে মুক্তির বার্তা শুনায়। দুনিয়া ও অখিরাতের সমূহ কল্যাণ এ কুরআনে নিহিত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ-

---

৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৭৭ . আল-কুরআন, ১৫ : ০৯

৭৮ . আল-কুরআন, ৪১ : ৪১-৪২

''কুরআন রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়ে যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।"[৭৯]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"আর আমি আপনার প্রতি কিতাব এ জন্য নাযিল করেছি যে, যে সকল বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করছে, যেন আপনি তাদের নিকট তা প্রকাশ করে দেন। আর মু'মিন সম্প্রদায়ের হেদায়াত ও রহমতের উদ্দেশ্যে নাযিল করেছি ।"[৮০]

আর এ কুরআন সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে সংরক্ষিত আছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে পবিত্র কুরআন সন্দেহাতীত ভাবে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্বে পেশ করা হয়েছে।

ইসলামী মতাদর্শের দ্বিতীয় উৎস হাদীস, এটিও ওহী তবে তা পরোক্ষ ওহী বলেই বিবেচিত। এ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস প্রামাণিক ভিত্তি বলে বিবেচিত হবে। সহীহ হাদীস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। পবিত্র কুরআনে এমন নির্দেশ রয়েছে যার বাস্তবায়নে মহানবী (স.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির প্রয়োজন আবশ্যক। এজন্য ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তি হিসেবে পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি হাদীসও রয়েছে। মহানবী (স.) বলেন:

اني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه-

''আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকো তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।"[৮১]

ইসলামী মতাদর্শের দ্বিতীয় উৎস হাদীস সংকলনে সাহাবায়ি কিরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বাস্তব সম্মত প্রচেষ্টা চালিয়ে এমন কিছু কাজ করেছেন যা

---

৭৯ . আল-কুরআনুল, ২ : ১৮৫

৮০ . আল-কুরআন, ১৬ : ৬৪

৮১ . মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, *আল মুস্তাদরাক* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১৭১

পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আর এর কোন নজীর আজ পর্যন্ত অন্য কোন জাতী পেশ করতে পারেনি।

ইসলামী মতাদর্শে উৎস সম্পর্কিত বিভ্রান্তি

ইসলামী মতাদর্শের উৎস সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। ওহী ভিত্তিক এ উৎস দু'টি কুরআন মাজিদ ও সহীহ হাদীস। কিন্তু এ দু'টি উৎসে বিচ্যুতি ঘটিয়ে কিছু লোক ইসলামী মতাদর্শে ভ্রান্তির ভেড়া জাল নিয়ে আবির্ভূত হয়। মতাদর্শগত বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতার পেছনে যে বিষয়টি নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে তা হচ্ছে উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি। এ সম্পর্কে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

কুফর, শিরক, বিদআত, দলাদলি, বিভ্রান্তি ইত্যাদি সবকিছুর মূল কারণ বিশ্বাসের উৎস বা ভিত্তি নির্ধারণের বিষয়ে অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা বা মতবিরোধিতা। আমার দেখেছি যে, বিশ্বাসের বিষয়গুলো গাইব বা অদৃশ্য জগতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আর অদৃশ্য জগতের বিষয়ে কোনো কিছু সঠিকভাবে জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস 'ওহী'। যখনই কোনো মানুষ ওহীর অস্তিত্ব বা গুরুত্ব অস্বীকার করে অথবা কোনো মানুষ ওহীর অস্তিত্ব ওহীর অতিরিক্ত কোনো সূত্র বা উৎসের উপর নির্ভর করে তখনই সে তার জন্য বিভ্রান্তির দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।"[৮২]

অনেকে ওহীর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করে বিশ্বাস করার পরও জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন । এক্ষেত্রে তারা ওহীর কার্যকারিতাকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করেছেন। এদের কেউ কেউ ওহীর স্বাভাবিক ও সরল অর্থ প্রত্যাখ্যান করে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ ওহীর নির্দেশনার একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের জন্য তা প্রযোজ্য নয় বলে দাবী করেছেন।[৮৩]

অনেকে ওহী এবং এর তাফসীরকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ওহীর সঠিক অর্থ গ্রহণ না করে রূপক অর্থ গ্রহণ করেই তারা ক্ষান্ত হননি বরং ওহীর তাফসীরকে ওহীর সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছেন।

---

৮২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত দলগুলো নিজেদের মতাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্য কুরআন মাজিদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে শীআগণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

''তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকুরত।''[৮৪]

এ আয়াতের তাফসীরে আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তি আলী (রা.) বলে অনেকে মতামত পেশ করেছেন। আর এ বিষয়ক বর্ণনাসমূহ অত্যন্ত দুর্বল। আর দুর্বল রেওয়ায়েত ইসলামী মতাদর্শের উৎস নয়। অথচ শীআগণ উল্লেখিত আয়াতকে তাদের মতাদর্শের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা এ আয়াতের তাফসীরের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, আলী (রা.) কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাঁর দলভুক্ত হওয়া ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। ফলে হযরত মুআবিয়া (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবী যারা আলী (রা.) -এর সাথে শত্রুতা করেছেন বা তাঁকে ক্ষমতা দেননি এবং তাঁদের যারা অনুসরণ করেন বা তাদের ভালোবাসেন তারা সকলেই কুরআনের নির্দেশ অস্বীকার করার মাধ্যমে কাফির বা মুরতাদে পরিণত হয়েছেন।[৮৫]

অথচ এ আয়াতের সাধারণ অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে অবশ্যই মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) সালাত কায়েমকারী ও যাকাত প্রদানকারী মুমিনগণকে সামগ্রিকভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে কুরআন ওহী কিন্তু কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা ওহীর সমতুল্য নয়।

উৎসগত বিভ্রান্তির আরেকটি দিক হচ্ছে, অনেকে সামাজিক লোকাচার যা বংশ পরম্পরা চলে আসছে তার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। মক্কার কাফেররা মহানবী (স.) এর আনিত সুমহান আদর্শ গ্রহণে গড়িমসি করছিল এজন্য যে, তারা লোকাচারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলো। বাবা-দাদার রেখে যাওয়া কুসংস্কার থেকে না বেরিয়ে অনেকে বিভ্রান্তির অতল গহবরে নিপতিত হচ্ছিল। তাঁদের নিকট কোন নবীর উপর নাযিলকৃত প্রত্যাদেশ ছিল না। অথচ তারা পবিত্র

---

৮৪ . আল-কুরআন, ৫:৫৫

৮৫ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

কুরআন ব্যতিরেকে বাপ-দাদার ধর্ম যা এমন মতাদর্শ যার কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই তাই তারা আঁকড়ে ধরে থাকলো।

উৎসগত বিভ্রান্তির আরেকটি কারণ হচ্ছে পূর্ববর্তী আলিম ও বুযুর্গের আদর্শ এমনভাবে গ্রহণ করা যে, সঠিক তথ্য তথা সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে সে সব আলিমদের কথার উপর আস্থা রাখা যাদের কথা সহীহ হাদীসের বিপরীতে অবস্থান করে। পূর্ববর্তী যুগের বড় বড় সুফী সাধকের নামে এমন কথা সমাজে প্রচলিত যা ইসলামী মতাদর্শের উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী। তাদের কথার প্রামাণিক ভিত্তি না থাকলেও অনুসারীরা তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে কুরআন হাদীসের বিপক্ষে অবস্থান নিতে দ্বিধা করে না। এ ক্ষেত্রে তারা এমন বক্তব্য রাখে যে, তারা (পূর্ববর্তীগণ) এতো বড় বুযুর্গ ছিলেন তারা কি ভুল করতে পারেন। আরেকদল যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা কুরআন ও হাদীসের চাইতে যুক্তিকেই উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ আকীদা বিষয়ক বিশ্বাসের ভিত্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গায়বের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। আর এসব বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে ওহীর জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, গায়বী বিষয়ে যুক্তি শুধুই বিভ্রান্তি নিয়ে আসবে অন্য কিছু নয়।

ইসলামী মতাদর্শের গুরুত্ব

ইসলামী মতাদর্শ তথা আকীদাগত জ্ঞান ইসলামী জ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ঈমান যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে শত শত বছর ইবাদাত করে এর ক্ষতিপূরণ করা সম্ভবপর হবে না। বিশ্বাস মানুষকে সফলতা দেয়। বিশ্বাস মানুষের পরিচালনা শক্তি হিসেবে কাজ করে। সঠিক বিশ্বাস মানুষকে উচ্চ শিখরে আরোহন করায়। বিশ্বাস যদি সঠিক হয় তাহলে তা জীবনে নিয়ে আসে শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ। বিশ্বাস ও আমল হচ্ছে দ্বীন একটি অপরটির পরিপূরক। আমল যদি আকাশ পরিমাণ হয় আর বিশ্বাসে যদি শিরক অথবা কুফর থাকে তাহলে তার আমল তাকে নাজাত দিবে না। এজন্য বান্দার ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন শিরক ও কুফর মুক্ত ঈমান এবং বিদআত মুক্ত ইবাদাত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا-

''আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায়, সে জন্য চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয় তাহলে তার চেষ্টা ও কর্ম কবুল করা হবে।''[৮৬]

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন, যারা সঠিক ঈমান লালন করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

''যদি কোনো পুরুষ অথবা নারী সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখবো এবং তাদের সর্বোত্তম কর্মের উপর ভিত্তি করে তাদের পুরস্কার প্রদান করবো।''[৮৭]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

''জেনে রাখো ! আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তগ্রস্তও হবে না যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেছে।''[৮৮]

দুনিয়া আখিরাতে কল্যাণ লাভের জন্য প্রথমত ঈমান আনতে হবে সে সাথে ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকতে হবে। ঈমান আনার পর ঈমান বিধ্বংসী বিষয় থেকে নিজের আকীদা-বিশ্বাসকে হিফাজত করতে না জানলে ধ্বংস অনিবার্য। মহান আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনয়নের ব্যাপারে যেমন প্রত্যাদেশ করেছেন তেমটি ঈমান বিধ্বংসী বিষয় থেকে নিজেদের হিফাযতের পথ নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

''নিশ্চয় তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি এ ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।''[৮৯]

---

৮৬. আল-কুরআন, ১৭ : ১৯

৮৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৯৮

৮৮. আল-কুরআন, ১০ : ৬২-৬৩

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

''আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।''[৯০] মহান রাব্বুল আলামীন আরো বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا-

''আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেছেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে মহাপাপ করে।''[৯১]

একজন মুমিনের সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য। মহানবী (স.) যা বলেছেন যা করেছেন এবং যে বিষয়ে অনুমোদন করেছেন তারই অনুসরণ করতে হবে। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ তাই করেছেন। অর্থ্যাৎ মহানবি (স.) এর পদাঙ্ক পূর্ণরূপেই তারা অনুসরণ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ, ইমামগণ ও তাঁর অনুসরণে সুদৃঢ় থেকেছেন। অতঃপর পরবর্তী যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা পূর্ববর্তী অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং অন্যদের বিভ্রান্ত করেছে। ইসলামী খিলাফতের ধ্বংসের পর এ জাতীয় ফিৎনা প্রবল আকার ধারণ করে। তারা মহানবী (স.) এর নামে বিভিন্ন প্রকার জাল হাদীস তৈরি করে, সে সাথে পবিত্র কুরআনের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যামূলক অর্থ গ্রহণ করে। কেউ কেউ আবার অতি যুক্তিবাদী হয়ে উঠে ওহীকে তারা যুক্তির নিরীখে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিতে থাকে। এভাবে বিভিন্ন বাতিল ফিরকার উদ্ভব ঘটে।

সমকালীন রাজন্যবর্গ কোনো কোনো বাতিল ফিরকাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান কে বিভ্রান্তিকে আরো শক্তিশালী করছেন। ফলে সহীহ আকীদার বিশ্বাসী আলিমদের উপর অত্যাচারের খরগ নেমে আসে। এরপর সুফীবাদীদের প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠে। বেশির ভাগ সুফী সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তারা দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করা এমনকি মহানবী (স.) যা করেননি, করতে বলেননি এবং মৌন সম্মতি দেননি এ জাতীয় কাজ করেছেন। অতি

৮৯. আল-কুরআন, ৩৯ : ৬৫

৯০. আল-কুরআন, ৫ : ৫

৯১. আল-কুরআন, ৪ : ৪৮

সরলতার কারণে তারা এমন প্রচলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন যা বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণ নয়।

এভাবে এদের মাধ্যমেও অভিনব মতাদর্শের উদ্ভব ঘটে। সাধারণ মানুষ বুযুর্গ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ায় তাদের ভ্রান্ত আমল ও বিশ্বাসের অংশীদার মনে করে। তারা মনে করে, তিনি এতো মহান সাধক ছিলেন তিনি কি কোন ভুল বা অপরাধ করতে পারেন ? অথচ তাদের কথা ও আমলের বিপরীতে সহীহ হাদীস পেশ করা হলেও তারা সে সব বুযুর্গদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এজন্য বাতিল মতাদর্শ বিষয়ে প্রতিটি মুমিনের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কেননা, না হয় বাতিল মতাদর্শের ফাঁকে পড়ে দুনিয়া ও আখিরাত বিনষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে বিভিন্ন মতাদর্শ: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে বিভিন্ন মতাদর্শের উৎপত্তি

মহানবী (স.)-এর তিরোধানের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন বিষয়টি সামনে চলে আসে। বিষয়টি একপর্যায়ে জটিল আকার ধারণ করে। মদীনার আনসার সাহাবীগণ সাকীফায়ে বনী সায়িদায় একত্রিত হন এবং তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন অবদানের কথা স্মরণ করে তাদের মধ্য থেকে খলীফা নিয়োগের জোর প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের দাবী ছিল আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) কে আশ্রয় দিয়েছি, নিজেদের জান মাল কুরবানী করে দুর্বল ইসলামকে শক্তিশালী করেছি সুতরাং আমাদের মধ্য থেকে কাউকে খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত করতে হবে।[৯২] অন্যদিকে মুহাজিরদের দাবী ছিল ইসলামের বীজ আমরা বপণ করেছি সে সাথে তাতে পানি সিঞ্চন করেছি। সুতরাং খিলাফতের অধিক হকদার আমরাই।[৯৩]

সাকীফায়ে বনী সায়িদায় মুহাজির অবস্থান কম থাকলেও তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আনসারদের বিরোধিতা করছিলেন। তর্ক-বিতর্ক আনসার ও মুহাজিরদের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এ ভয়াবহ অবস্থা অবলোকন করে মুগীরা ইব্ন শোবা (রা.) সেখান থেকে বেরিয়ে মসজিদে নববীতে এসে পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। তখন আবু বকর (রা.) মহানবী (স.)-এর দাফন কাফনের উপকরণ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন। সাকীফায়ে বনী সায়িদার আতঙ্কজনক সংবাদ অবহিত হয়ে তিনি হযরত ওমর ফারুক (রা.) ও আবু উবাইদাহ ইব্নুল জাররাহ (রা.) সহ অতি দ্রুত সেখানে গমন করেন। অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি এক সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন এবং খিলাফতের অধিক হকদার যে কুরাইশ বংশীয়রা তা তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাতে সক্ষম হন। সেই সাথে ওমর (রা.) অথবা আবু উবাইদাহ ইব্নুল জাররাহ (রা.) এ

---

৯২ . ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা* (ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬

৯৩ . *প্রাগুক্ত*

দুজন থেকে কোন একজনকে বেছে নিতে সমবেত জনতাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ওমর ইব্ন ুল খাত্তাব তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আবু বকর (রা.) এর বহুবিদ গুণাবলী ও মর্যাদার উল্লেখ করত: তার হাতে বাইয়াত করে ফেলেন। তার সাথে সাথে আবু উবাইদাহ ইব্ন ুল জাররাহ ও বাশীর ইব্ন সা'দ আল আনসারী (রা.) বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর মুহাজির ও আনসারগণ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।[৯৪]

আবু বকর (রা.) -এর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইসলামের উপর প্রায় চলে আসা একটি ফিৎনা নির্বাপিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলীফা হলেন। তিনি উদ্ভূত প্রতিটি সংকটের যথার্থ মোকাবেলা করে মহানবী (স.) -এর অনুপস্থিতিতে তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীনকে সঠিক স্থানে সুদৃঢ় রাখেন। অতঃপর দুই বছর তিন মাস পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। রোগ যখন বেড়ে গেল এবং যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন পরবর্তী খলীফা নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ওমর ইব্ন ুল খাত্তাব (রা.) উম্মাহর নেতৃত্ব গ্রহণের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। অতঃপর প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট পরবর্তী খলীফা হিসেবে ওমর ইব্ন ুল খাত্তাব (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। তাঁদের মধ্য থেকে অধিকাংশ সাহাবীই এ প্রস্তাব স্বানন্দে গ্রহণ করেন। কেউ কেউ ওমর (রা.)-এর কঠোর মেজাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জবাবে আবু বকর (রা.) এ বলে আশ্বস্ত করেন যে, খিলাফতের কঠিন বোঝা যখন তাঁর উপর আপতিত হবে তখন মেজাজের কাঠিন্য চলে যাবে।[৯৫]

সকল প্রবীণ সাহাবী ঐকমত্য হলে আবু বকর (রা.) ওসমান ইব্ন আফফানকে (রা.) ডেকে খেলাফতের শপথনামা লেখালেন এবং সাধারণ সমাবেশে তা পড়ে শোনাতে নির্দেশ দান করেন। শপথনামাটির সারনির্যাস নিম্নরূপ:

---

৯৪ . মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস,* অনু. মাওলানা আব্দুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী (ঢাকা: ইসলমিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.), ২য় সং. পৃ. ২৫৪

৯৫ . কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, মাওলানা লিয়াকত আলী, *খেলাফতে রাশেদা* (ঢাকা: মাওলানা লিয়াকত আলী, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, ৩য় প্রকাশ, পৃ. ৬৯

"এ শপথ নামা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর খলীফা আবু বকর (রা.) -এর পরকালীন যাত্রার সময়ের। এ সে নাজুক সময় যখন কাফেরও ঈমান আনে এবং গোনাহগারও আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন করতে থাকে। আমি ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) কে আপনাদের শাসক করছি এবং এ নিয়োগে আপনাদের কল্যাণের পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছি। যদি তিনি হকের উপর কায়েম থাকেন এবং ন্যায্যতার সাথে কাজ চালান তাহলে এ-ই আমি তাঁর কাছে আশা রাখি। আর যদি তিনি অত্যাচার করেন এবং হক থেকে বিচ্যুত হন তাহলে আমি তো গায়েব জানি না। আমার তো ইচ্ছা মুসলমানদের সাথে কল্যাণের। সকল মানুষ নিজ কর্মের দায়িত্বশীল।"[৯৬]

অতঃপর আবু বকর (রা.) এক ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে সমবেত মুসলিম জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, ভাইয়েরা আমার! আমি নিজের কোনো আত্মীয় বা ভাইকে খলিফা নিযুক্ত করিনি। বরং সে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছি যিনি আপনাদের মধ্যে উত্তম। আপনারা তাঁকে পছন্দ করেন। উপস্থিত জনতা এ নির্বাচন পছন্দ করলো এবং আবু বকর (রা.) -এর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করলো।[৯৭]

আবু বকর (রা.) ওমরকে (রা.) অনেক উপদেশ প্রদান করলেন যা তাঁর খিলাফত কালের বহু কল্যাণ বয়ে এনেছিল। দ্বিতীয় খলীফা স্বাভাবিক ভাবে নির্বাচিত হওয়ায় মুসলিম বিশ্বে উম্মাহর স্থিতিশীলতা পূর্বের মতোই বহাল থাকলো। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি আরো সুদৃঢ় হলো। দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসক হিসেবে পরিগণিত হন। ২৩ হিজরী যুলহুজ্জাহ মাসের ২৬ তারিখ অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত আবু লুলু ফীরোজ নামক এক গোলামের আঘাতে তিনি আহত হন। সে ছিল মুগীরা ইব্ন শোবা (রা.) -এর গোলাম। এমতাবস্থায় তিনি পরবর্তী খলীফা নিয়োগের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি পরামর্শ সভার ঘোষণা দেন। এ পরামর্শ সভার সদস্যগণ হচ্ছেন: (১) ওসমান (রা.),

---

৯৬ . *প্রাগুক্ত*

৯৭ . *প্রাগুক্ত*

(২) আলী (রা.), (৩) তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রা.), (৪) যুবাইর ইব্‌নুল আওয়াম (রা.), (৫) আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা.) ও (৬) সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা.)।[৯৮]

এ পরামর্শ সভায় আশারায়ে মুবাশশিরার অন্যতম সদস্য সাঈদ বিন যায়িদকে (রা.) অন্তর্ভু করা হয়নি। এটা তিনি এজন্য করেন যে, সাঈদ বিন যায়িদ (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি ছিলেন। এ ছাড়া এ সভায় পরামর্শ প্রদানের জন্য তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমরকে (রা.) অনুমতি দেওয়া হয় এবং এও বলা হয় যে, তিনি খিলাফতের অংশীদারী দাবী করতে পারবেন না।[৯৯] অতঃপর আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা.) -এর মধ্যস্থতায় নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং ওসমান ইব্‌ন আফফান (রা.) তৃতীয় খলীফা মনোনীত হন। ওসমান (রা.)-এর শাসনামলের শেষ দিকে মুসলিম বিশ্বের আয়তন অনেক বেড়ে যায়। পৃথিবীর দিকে দিকে বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হতে থাকে। দলে দলে লোকেরা ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। নও মুসলিমদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা ইসলামের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব ও প্রখ্যাত সাহাবীদের সাহচর্য না পাওয়ার কারণে নতুন প্রজন্মের একদল তরুণ মুসলিম খলীফা ওসমান ইব্‌ন আফফান (রা.)-এর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়। ওসমান (রা.) সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে এর স্বপক্ষে জনমত গঠনে তারা প্রয়াসী হয়। এ সময় আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাবা নামক এক ইয়াহুদী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ওসমান (রা.) -এর খিলাফতকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যাবতীয় অপচেষ্টা চালিয়ে যায়। এ ব্যক্তি প্রথমে দামেশক গমন করে সেখানকার লোকেরা তাকে বহিষ্কার করে। অতঃপর সে মিশর গমন করে এবং ওসমান (রা.) -এর ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন এবং বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাতে থাকে।[১০০]

ওসমান (রা.) সম্পর্কে যে কয়টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তাহলো: (১) সরকারী চারণ ভূমি নিজ স্বার্থে ব্যবহার, (২) কুরআন মাজিদ দগ্ধীভূতকরণ, (৩) মুসাফির অবস্থায় পূর্ণ সালাত

---

৯৮ . আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র), *বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৫১- ২৫২

৯৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২

১০০ . *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, ২য় সং. পৃ. ৪৫

আদায় করা, (৪) প্রবীণ সাহাবীদের বরখাস্ত করে তরুণদের আমীর নিযুক্ত করা ও (৫) বনু উমাইয়ার লোকজনদের চাকুরীতে অগ্রাধিকার প্রধান।

ওসমান (রা.)-এর পরামর্শে আলী (রা.) বিদ্রোহীদের সাথে বৈঠক করেন এবং অভিযোগগুলোর যুক্তিসঙ্গত জবাব দেন। প্রথম অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, সরকারী কিছু সম্পত্তি সীমানা নির্ধারণ করে পৃথক করা হয়েছে এ কারণে যে, এখানে সাদাকার উট চরাবার জন্য যাতে এগুলো মোটতাজা হতে পারে। দ্বিতীয় অভিযোগের জবাবে আলী (রা.) বলেন, কুরআন মাজিদের বিরোধপূর্ণ কিছু অংশ সাহাবায়ি কিরামের পরামর্শে সর্বসম্মতিক্রমে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এরূপ ব্যবস্থা সকল সাহাবীর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তৃতীয় অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, পবিত্র মক্কায় তিনি ১৫ দিনের বেশি থাকার নিয়ত করায় তিনি মুকিম হয়ে যান। ফলে তিনি পূর্ণ সালাতই আদায় করেন। চতুর্থ অভিযোগের প্রেক্ষিতে আলী (রা.) বলেন, তিনি ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্যতা সম্পন্নদেরই নিয়োগ দিয়েছেন। মহনবী (স.) বিশ বছর বয়সী ইতাব ইব্ন উসাইদকে (রা.) মক্কা মুকাররমার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। এ ছাড়া উসামা ইব্ন যায়িদকে (রা.) সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। পঞ্চম অভিযোগের জবাবে বলেন, মহানবী (স.) কুরাইশদের অগ্রাধিকার দিতেন। আর হাকাম ইব্ন আবুল আসকে চাকুরী দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে ওসমান (রা.) -এর পক্ষ থেকে বক্তব্য ছিল, মহানবী (স.) প্রথমে তাকে তায়েফে নির্বাসন দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে ফেরত আসার অনুমতিও প্রদান করেছিলেন।[১০১]

বিদ্রোহীরা আলী (রা.) -এর সাথে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একজন দূতকে দেখে তাদের সন্দেহ হয় এবং তার নিকট তল্লাসী করে একটি চিঠি পাওয়া যায় যাতে ওসমান (রা.) -এর অজ্ঞাতে মারওয়ান ইব্ন হাকাম তাঁর স্বাক্ষর জাল করে মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী সারাকে এ মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে, বিদ্রোহীরা মিশরে পৌঁছলে তাদের অনেককেই যেন হত্যা করা হয়।[১০২] এ পত্র পাঠে বিদ্রোহীরা চরম ক্ষুব্ধ হয়ে মদীনায় ফিরে আসে। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিদ্রোহীগণ কর্তৃক ওসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহর উপর

---

১০১ . আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র), *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৩০৯

১০২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫-৩১৬

এমন এক ফিতনা নেমে আসে যুগ যুগ ধরে যার কুফল মুসলিম সমাজ ভোগ করে আসছে। অতঃপর আলী (রা.) খিলাফত গ্রহণ করেন শুরু হয় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ যার উত্তপ্ত আগুন মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘ দিনের ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, বিদ্রোহীদের একটি অংশ আলী (রা.)-এর কট্টর অনুসারী ছিল। তারা এবং সকল বিদ্রোহীরা আলী (রা.) -এর বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। অন্যদিকে শামের আমীর মুআবিয়া ইব্‌নে আবী সুফিয়ান (রা.) আলী (রা.)-এর নিকট বাইআত গ্রহণে শর্ত দিয়ে দেন যে, আগে ওসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার করতে হবে অতঃপর বাইআত গ্রহণ। পরিশেষে মুসলিম উম্মাহ কয়েকটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে আলী (রা.) ও মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সিফফীনের যুদ্ধ সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুআবিয়া (রা)-এর বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। সেমতাবস্থায় মুআবিয়া (রা.)-এর বাহিনী বর্শার অগ্রভাগে কুরআন বেধে স্বন্ধির প্রার্থনা করে। আলী (রা.) এটাকে শত্রুর একটি জঘন্য কূটকৌশল মনে করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে এক দল লোক বলে, কুরআনের সালিশ যেহেতু তারা চাচ্ছে সেহেতু যুদ্ধ বন্ধ করা উচিৎ। তাদের চাপে পড়ে তিনি যুদ্ধ বিরতি দিয়ে সালিশের অপেক্ষা করতে থাকেন।

সালিশ অনুষ্ঠিত হয় এবং কূটকৌশলের কারণে সালিশ ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। সালিশ ব্যর্থ হওয়ায় ঐ লোকগুলি যারা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আলীকে (রা.) চাপ প্রয়োগ করেছিল তারা আলী (রা.)-এর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তার দল ত্যাগ করে চলে যায় এদেরকে الخوارج বা খারেজী বলে। আর আলী (রা.)-এর কট্টর অনুসারীদেরকে শীআ বলে থাকে। ইসলামী মতাদর্শ ভিন্নতার মূল উৎস হলো এ সকল হত্যা এবং আলী (রা.) ও মুআবিয়া (রা.) এর সংঘাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খারেজী সম্প্রদায় : পরিচিতি ও মতাদর্শ

ইসলামে বিভিন্ন ফিরকার উদ্ভব ঘটেছে ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি আলী (রা) সাহাবায়ি কিরামের ক্রমাগত চাপের সম্মুখীন হয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ওসমান (রা.) -এর শাসনামলের সকল ওয়ালীদের বাইআত গ্রহণের আহবান করলে সবাই তার আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু শামের ওয়ালী মুআবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ান (রা.) বাইআত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি শর্ত জুড়ে দেন আগে ওসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার করতে হবে। আলী (রা.) বলেন, আগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা জরুরী নতুবা বিশৃঙ্খলা আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু কোনো সমাধান না হওয়ায় যুদ্ধের ময়দানকেই উভয় পক্ষ বেছে নেয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ সালিশীতে সম্মত হয় এবং সালিশও ভেস্তে যায়। তখন আলী (রা.)-এর সাথে অবস্থানরত একটি উপদল আবার যুদ্ধের জন্য চাপ দিতে থাকে তখন তিনি এতে অসম্মতি প্রদান করেন। ফলে তার মতামতের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এ উপদলটি বেরিয়ে যায় এদের খারেজী বা দলত্যাগী বলা হয়।

খারেজী শব্দটি আরবী। এটি الخروج ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে বিদ্রোহ করা, অবাধ্য হওয়া। যেহেতু এ দলটি সিফফীনের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আলী (রা.) এর জামায়াত থেকে বিদ্রোহ করে বের হয়ে গিয়েছিল তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয়।[১০৩]

এদের আরো কিছু নাম রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

(১) আল-হারোরিয়্যাহ (الحرورية)

(২) আল-বুগাত (البغاة)

(৩)আল-হাকামিয়্যা বা আল-মুহাককিমা (الحكامية أو المحكمة)

(৪) আল-মারেকা (المارقة)

(৫) আশ-শুরাত (الشراة)

(৬) আন-নাওয়াসিব বা আন-নাসিবী (النواصيب أو الناصبي)

১০৩ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ* (ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী,২০১৪ খ্রি.), ৪র্থ সং. পৃ. ২৩৭

খারেজী মাযহাবের অনুসারীরা ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ। মহানবী (স.)-এর তিরোধানের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এদের সকলেই প্রায় তরুণ যুবক। এসকল যুবক খুবই সৎ, নিষ্ঠাবান, ধর্মপ্রাণ ও আবেগী ছিল। তারা যিকর, কুরআন পাঠ ও তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিল। তারা বিশ্বাস করতো কুরআনের আইন ছাড়া অন্য কোনো কিছু চলতে পারে না। আল্লাহর হুকুম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। আর আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে অবাধ্যদের সাথে অবশ্যই লড়াই করতে হবে। তাদের দলীল ছিল নিম্নোক্ত আয়াতে কারিমাটি: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ 'কর্তৃত্ব বা বিধান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।'[১০৪] সুতরাং মানুষ কখনও ফয়সালা কারী হতে পারে না, মানুষকে ফয়সালাকারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বৈ কিছু নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ-

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী যারা বিচার কার্য ফয়সালা করে না তারাই কাফির।"[১০৫]

খারেজীরা বিশ্বাস করে, আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে কোনোরূপ আপোষ চলতে পারে না। অবাধ্য পাপাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানে ফিরে আসে। এ সম্পর্কে তাদের দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ-

"মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[১০৬]

১০৪. আল-কুরআন, ০৬ : ৫৭

১০৫. আল-কুরআন, ৫ : ৪৪

১০৬. আল-কুরআন, ৪৯ : ৯

Dhaka University Institutional Repository

খারেজীরা আলী (রা.), মুআবিয়া (রা.) ও তাঁদের অনুগামীদের আল্লাহর অবতারিত বিধান অমান্য করার কারণে কাফির মনে করে। তাদের দাবি, তাঁদের তাওবা করতে হবে। আলী (রা.) তাদের দাবী পূরণ না করায় তারা তাদের মতের স্বপক্ষে কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে থাকে এবং আলী (রা.), মুআবিয়া (রা.) এবং তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।[১০৭]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ তাদের এ কথা বুঝানোর চেষ্ট করেন যে, পবিত্র কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝেছেন আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ। সুতরাং তাঁদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এ ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যাখ্যা সঠিক নয়। এতেকরে কিছু সংখ্যক লোকের উগ্রতা কমলেও বেশির ভাগই সাহবীদেরকে দালাল, আপোষকামী ও অন্যায়ের সহযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং এদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। খারেজীরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যথেষ্ট আন্তরিক ছিল। তাদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ও সততা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে কুরআনের মধুর ঝঙ্কারই শুধু শোনা যেতো। কুরআন মাজিদ পাঠ করলে তাদের হৃদয়ে আবেগের মুর্ছনার সৃষ্টি হতো। আখিরাতের ভয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেতো। তাদের রচিত আরবী কাব্য সাহিত্য ইসলামী আবেগের এক ঝরনাধারা। এগুলো ইসলামী অথবা ও জিহাদী প্রেরণার এক অতুলণীয় ভান্ডার হিসেবেই পরিগণিত।[১০৮]

আলী (রা.) যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে কূফার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেন তখন তাঁর বাহিনী থেকে বারো হাজার লোক বের হয়ে যায়। এরাই ছিল খারেজী মতাদর্শের অনুসারী। তারা আলী (রা.) এর সাথে একই শহরে বসবাস করতে অস্বীকার করে এবং হারুয়া নামক স্থানে গিয়ে একত্রিত হয়। [১০৯] আলী (রা.) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) কে তাদের নিকট পাঠান। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) কে তারা সাদরে গ্রহণ করেনি। ইব্‌নুল কাওয়া নামে জনৈক খারেজী তাকে কুরআন সম্পর্কে অনবহিত ও বিতর্ককারী বলে আখ্যায়িত করে; সে সাথে তার

---

১০৭ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৬

১০৮ . আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র), *প্রাগুক্ত* , খ. ৭, পৃ. ৬১৭

১০৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৪

Dhaka University Institutional Repository

সাথে যাতে কেউ কোনো আলোচনা না করে সে সম্পর্কে লোকদের আহবান জানায়। কিন্তু তার কথায় কাজ হয়নি, খারেজীদের অনেকেই তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী হয়। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন এবং তাদের অভিযোগ শুনেন ও তার যথার্থ জবাব দেন। এতে করে চার হাজার লোক তাওবা করে তার সাথে কূফায় আলী (রা.) এর নিকট চলে আসে। উল্লেখ্য যারা আলী (রা.) এর নিকট চলে আসে তাদের মধ্যে ইব্‌ন ুল কাওয়াও ছিল।[১১০]

অতঃপর অবশিষ্ট খারেজীদের আলী (রা.) সতর্ক বার্তা পাঠালেন। বার্তায় তিনি তাদের বললেন, তোমরা যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পার। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত রইল যে, তোমরা অন্যায়ভাবে কারও রক্তপাত ঘটাবে না। ডাকাতি করবে না, রাহাজানি করবে না ও জিম্মিদের উপর অত্যাচার করবে না। যদি এর কোনটিতেও তোমরা লিপ্ত হও তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হব।[১১১]

ইব্‌নে জারীরের এক বর্ণনায় এসেছে, খারেজীদের অবশিষ্ট লোকদের কাছে আলী (রা.) স্বয়ং গমন করেন এবং তাদের সাথে আলোচনা করে সকলকেই কূফায় নিয়ে আসেন। এরপর তারা আলী (রা.) এর বক্তব্যে বাঁধা সৃষ্টি করতে থাকে, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করতে থাকে; সে সাথে তাঁকে গালমন্দ করতে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, হযরত আলী (রা.) একদিন সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁকে লক্ষ্য করে জনৈক খারেজী নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করে:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

''তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে, তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।''[১১২]

---

১১০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৮

১১১ . *প্রাগুক্ত*

১১২ . আল-কুরআন, ৩৯ : ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এর জবাবে আলী (রা.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ -

''অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।'' [১১৩] ইব্‌ন কাসীরের বর্ণনায় এসেছে:

আলী (রা.) খুৎবা পাঠ দিচ্ছিলেন। এ সময় জনৈক খারেজী দাঁড়িয়ে বলল, হে আলী! আপনি মহান আল্লাহর দ্বীনে মানুষকে শরীক করেছেন। অথচ আল্লাহ ব্যতীত হুকুম দেওয়ার অধিকার কারো নেই। এ সময় চারদিক থেকে এক সাথে খারেজীরা আওয়াজ তুললো لا حكم الا الله – لا حكم الا الله - আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুম নেই। আলী (রা.) বললেন, كلمة حق يراد بها الباطل - '' কথাটি সত্য কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ''। তারপর তিনি বললেন, যতোদিন তোমাদের দায়িত্ব আমাদের উপর ছিল ততোদিন আমরা তোমাদের গণীমত দেওয়া বন্ধ করিনি এবং আল্লাহর মসজিদে সালাত আদায়ে বাধা দেইনি। এখন তোমাদের উপর আমরা আগেই হামলা করবো না। যদি তোমরা প্রথমে হামলা না করো।'' এরপর তারা সকলেই কূফা থেকে বেরিয়ে নাহরাওয়ানে সমবেত হয়। [১১৪]

কূফা থেকে বের হয়ে খারেজীরা বিভিন্ন স্থানে হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। তারা আল্লাহর রাসূলের সাহাবীআব্দুল্লাহ ইব্‌ন খাব্বাব ও তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে দ্বৈত সত্তা কাজ করতো। একদিকে তারা ছিল খুব ন্যায়পরায়ণ অন্য দিকে নৃশংসতার প্রতিবিম্ব। তারা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন খাব্বাব (রা.) কে ধরে এনে জিজ্ঞেস করলো তোমার পরিচয় কী? তিনি বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন খাব্বাব। আল্লাহর রাসূলের সাহাবী। তারা বললো, আপনার পিতার লেখা যে হাদীসটি শুনেছেন তা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন:

ستكون فتنة الفاعد فيها خير من القائم و القائم خير من الماشي و الماشي خير من الساعي -

---

১১৩ . আল-কুরআন, ৩০ : ৬০

১১৪ . আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র), *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৫১০

Dhaka University Institutional Repository

‘‘শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন গৃহে অবস্থানকারী ব্যক্তি দন্ডায়মান ব্যক্তি থেকে ভাল অবস্থায় থাকবে, আর দন্ডায়মনা ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির থেকে ভালো অবস্থায় থাকবে, হেঁটে চলা ব্যক্তির দৌড়ে চলা ব্যক্তি থেকে ভালো অবস্থায় থাকবে” ।

অতঃপর তারা তাঁর হাতে বেড়ি পরিয়ে সাথে নিয়ে চলল। পথিমধ্যে তাদের একজন এক জিম্মির শোকর হত্যা করে চামড়া খুলে ফেলল। অন্য আরেকজন বলল এটা এক জিম্মির। তখন সে জিম্মির নিকট গিয়ে এর সমাধান করে আসল। অপর এক ব্যক্তি একটি খেজুর পথে কুড়িয়ে খেয়ে ফেলল। অন্য আরেকজন বলল, এটা তুমি খেয়েছ অথচ এর মালিকের অনুমতি নাওনি এবং এর মূল্য পরিশোধ করোনি। তখন সে বমি করে তা ফেলে দিল। এরপরও তারা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন খাব্বাব (রা.) কে জবাই করে হত্যা করল। অতঃপর তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করতে গেলে তিনি বললেন, আমি অন্তঃসত্তা, আল্লাহকে ভয় কর। তারা তাঁকে জবাই করে পেট ফেড়ে সন্তান বের করে ফেলল! আলী (রা.) এর নিকট এসব সংবাদ যখন পৌঁছল তখন তিনি সিরিয়া অভিযানে বের হয়েছিলেন। কিন্তু খারেজীদের নৃশংসতার ঘটনাবলী জানতে পেরে নাহরাওয়ানের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে এসে তাদেরকে বুঝানোর জন্য কাইস ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন ওবাদা (রা.) ও আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) কে পাঠালেন। তারা দু’জন তাদের অনেক উপদেশ দেন এবং তাওবা করে ফিরে আসতে আহবান জানান কিন্তু তারা তাদের মতের উপর অটল থাকে এবং মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এক পর্যায়ে لا حكم الا الله ‘আল্লাহ ছাড়া কারও কোনো হুকুম নেই’ চলো চলো জান্নাতে চলো বলে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। তুমুল যুদ্ধের পর খারেজীরা পরাজিত হয় এবং তাদের নেতৃস্থানীয়দের প্রায় সকলেই নিহত হয়।[১১৫]

নাহরাওপনের যুদ্ধে পরাজয়ের পর খারেজীরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। একদা তিন খারেজী গোপন পরামর্শে মিলিত হয়। এরা হচ্ছে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ওরফে ইব্‌ন মুলজিম আল হিমায়রী, বারক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ তামিমী ও আমর ইব্‌ন বকর তামীমী। তারা নাহরাওয়ানে

১১৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২১-৫২২

তাদের সমমনাদের নিহত হওয়ায় দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে; সে সাথে তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের দৃষ্টিতে পথভ্রষ্ট নেতাদের অর্থাৎ আলী (রা.), মুআবিয়া (রা.) ও আমর ইব্‌ন আস (রা.) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় আলী (রা.) কে ইব্‌ন মুলজিম, মুআবিয়া (রা.) কে বারক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ও আমর ইব্‌ন আস (রা.) কে আমর ইব্‌ন বকর হত্যা করবে। তারা একটি দিন ও সময় ও ঠিক করে নেয়। তা হচ্ছে রামাদানের ১৭ তারিখ। অতঃপর তারা তাদের তলোয়ারে বিষ মিশ্রিত করে যে যাকে হত্যা করবে তার শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলজিম কূফায় গমন করে সেখানকার খারেজীদের সাথে বসবাস করতে থাকে। সেখানে এক অনিন্দ্য সুন্দরীর সাথে তার পরিচয় ঘটে, যে সর্বদা মসজিদে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতো। তার নাম ইব্‌নে মুলজিম তাঁর সৌন্দর্যে সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তিন হাজার দিরহাম মোহর, একজন খাদেম, একজন দালী ও আলী (রা.) কে হত্যার শর্তে এ প্রস্তাবে সম্মাতি প্রদান করে। ইব্‌ন মুলজিম সব শর্ত পূরণ করলেও শেষেরটি বাকী থাকে। আর এজন্য তার স্ত্রী তাকে প্রতিনিয়ত তাগাদা দিতে থাকে এবং তার সাথী হিসেবে ওয়ারদান নামক এক ব্যক্তিকে জোড়ে দেয়। ইব্‌ন মুলজিম শাবীব ইব্‌ন নাজতাদানকে তার সাথী করে নেয়। অতঃপর তারা তিনজন ১৭ রামাদানে ফজরের সময় মসজিদের সে দরজায় অবস্থান নেয় যে দরজা দিয়ে আলী (রা.) প্রবেশ করেন। অতঃপর আলী (রা.) যখন মসজিদে আস-সালাত, আস-সালাত বলে মসজিদে আসছিলেন তখন প্রথমে শাবীব তাঁকে আঘাত করে, শাবীবের আঘাত ব্যর্থ হলে ইব্‌ন মুলজিম মাথায় আঘাত করলে মাথা ফেটে রক্তে দাঁড়ি ভিজে যায়। শাবীব পলায়ন করতে সক্ষম হয়। ওয়ারদান পালিয়ে গেলেও হাদরামাওতের নিকট এক ব্যক্তি তাকে ধরে হত্যা করে। ইব্‌ন মুলজিম ধৃত হয়। এ পাপীষ্ঠ আলী (রা.) কে আঘাত করার সময় বলছিল:

لا حكم الا الله ليس لك يا علي و لا لاصحابك -

"আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম করার অধিকার নেই। হে আলী! তোমারও নেই এবং তোমার অনুসারীদেরও নেই।"

অতঃপর সে নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র।” [১১৬]

একই দিনে মুআবিয়া (রা.) আক্রমণের শিকার হন কিন্তু অল্পের জন্য বেঁচে যান। আর আমর ইব্ন আস (রা.) অন্য একজনকে তার স্থলাভিষিক্তরূপে মসজিদে পাঠান কেননা, তিনি পেটের পীড়ায় ভূগছিলেন। খারেজী তাকেই হত্যা করে। এ হত্যাকান্ডে অংশ নিতে যাওয়া তিনজনকেই হত্যা করা হয়। আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর ইব্ন মুলজিমকে হাসান (রা.) এর সামনে আনা হয় এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা.) তার দুই হাত-পা কেটে দেয় এবং চোখ উপড়ে ফেলে। এমতাবস্থায় সে সুরাহ আলাক সম্পূর্ণটা পাঠ করে। অতঃপর জিহবা কেটে ফেলতে চাইলে সে চিৎকার করে বলতে থাকে আমার জীবনের এমন একটা মূহুর্তও আমি কাটাতে চাইনা, যে মূহুর্তে আমি আল্লাহর যিকির করতে পারবো না। অতঃপর তাঁর জিহবা কর্তন করে হত্যা করা হয়। [১১৭]

আমিরুল মুমিনীন আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ তাদের ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের কারণে স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁরা এদের চরমপন্থার পথ থেকে ইসলামের মৌলিক আবেদনের দিকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। কিন্তু অতি আবেগী এসব উগ্র যুবক তাদের কর্মপন্থা থেকে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। আলীকে (রা.) একবার প্রশ্ন করা হলো, এরা কি কাফের ? জবাবে আলী (রা.) বললেন, ‘‘ তারাতো কুফরী থেকে পলায়ন করেছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কি মুনাফিক? উত্তরে তিনি বললেন:

ان المنافقين لايذكرون الله الا قليلا , و هولاء يذكرون الله بكرة و اصيلا-

“মুনাফিকরা খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে, অথচ এরা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহকে স্মরণ করে।” আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তবে তারা কী ? তিনি বললেন:

قوم اصابتهم فتنة فعموا وصموا-

“এরা এমন এক সম্প্রদায় , ফিতনায় পতিত হওয়ার ফলে যারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে।”[১১৮]

---

১১৬ . আল কুরআনুল করীম, ২ : ২০৭

১১৭ . আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র), *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৫৭৮-৫৮৭

১১৮ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬

পবিত্র কুরআনের আলোকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অফুরন্ত আবেগ ও জেহাদী উদ্দীপনা নিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ৩৭ হিজরীতে যখন তারা আলী (রা.)-এর দল ত্যাগ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল তিন থেকে থেকে চার হাজার মাত্র অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহরাওয়ান্দে পঁচিশ হাজার খারেজী একত্রিত হয়। আলী (রা.) তাদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যে ফিরিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু নতুন বিপ্লবের নেশায় বিভোর এসব অতি আবেগী যুবক তাদের চরিত্রের কলুষিত দিকটিই প্রদর্শন করে । তারা হিংস্র ও ভয়ংকর সন্ত্রাসের প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে। বহু নিরপরাধ ব্যক্তি তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের শিকার হয়। হাজার হাজার নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষকে তারা হত্যা করে। আলী (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নাহরাওয়ান্দে তারা তাদের সমাবেশ ঘটায়। রক্তক্ষয়ী তুমুল যুদ্ধের পর তারা পরাজিত হয় এবং বহু নিহত হয়। যারা জীবিত থাকে, তারা নব উদ্দীপনায় ঐক্যদ্ধ হতে থাকে। একপর্যায়ে তারা গুপ্ত হত্যার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একই দিনে আলী (রা.), মুআবিয়া (রা) ও আমর ইব্ন আসকে (রা.) হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের বিশ্বাস এ তিন জনকে হত্যা করলেই মুসলিম উম্মাহ খোদাদ্রোহীতা থেকে নাজাত পাবে। আলীকে (রা.) হত্যা করার জন্য আবদুর রহমান ইব্ন মুলজিমকে তারা নিযুক্ত করে। হিজরী ৪০ সালের ২১ রমাদান আলী (রা.) ফজরের সালাত আদায় করতে বের হলে ঘাতক বিষ মিশ্রিত ছুরি দ্বারা তাঁকে আঘাত করে এবং খোলাফায়ি রাশিদার সর্বশেষ মহান ব্যক্তি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আখিরাতের পথে প্রস্থান করেন। অতঃপর ঘাতক আবদুর রহমান ইব্ন মুলজামকে যখন সৈন্যরা হাত-পা কেটে শাস্তি দিতে থাকে তখন কোনো কষ্ট প্রকাশ না করে আনন্দিত হতে থাকে। অতঃপর যখন তার জিহবা কেটে ফেলতে চাইলো তখন সে খুবই আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে এজন্য যে, সে চায় আল্লাহর যিকর করতে করতে শহীদ হবে।[১১৯]

৩৭ হিজরী থেকে খারেজীরা মুসলিম বিশ্বে হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা.) ও উমাইয়া রাজণ্যবর্গের বিরোধে তারা ইব্ন যুবাইর (রা.) -এর সমর্থন করে। তাদের বিশ্বাস ছিল তিনি সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা তাঁর কাছে

১১৯ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৮-৬১৯

দাবী জানায়, তিনি যেন ওসমান (রা.) ও আলীকে (রা.) কাফীর বলে স্বীকৃতি দেন। তিনি তা অস্বীকার করলে তারা তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।[১২০]

মুআবিয়া (রা.) যখন মুসলিম জাহানের খলীফা হলেন এবং কূফায় আগমন করলেন তখন খারেজীদের একটি দল যার সংখ্যা ছিল পাঁচশত, তারা মুআবিয়াকে (রা.) আক্রমণ করতে আসে। মুআবিয়া (রা) একটি সিরীয় অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসে অতঃপর তিনি এর দায়িত্ব কূফাবাসীদের হাতে অর্পন করেন। একপর্যায় খারেজীরা পরাজিত হয়। যিয়াদ ইব্‌ন আবী সুফিয়ান খারেজীদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন তাদেরকে তিনি কঠোরভাবে দমন করে রাখেন। অতঃপর তার মৃত্যুর পর তারা আবার মাথাচারা দিয়ে উঠে। তখন ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ তাদের সাথে দীর্ঘ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সে তাদের কাউকে হত্যা করে আবার কাউকে বন্দী করে রাখে।

হিজরী ৪৩ সালে মুসতাওরিদ ইব্‌ন আলকামার নেতৃত্বে তিন শতাধিক খারেজী ১ শাওয়াল ঈদুল ফিতরের দিন কূফা থেকে বের হয়। মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা.) তখন কূফার গভর্নর ছিলেন। তিনি তাদের প্রতিহত করার জন্য তিনহাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, খারেজীরা তাদের পরজিত করে। এরপর আরো সৈন্য পাঠালে তারাও পরাজিত হয়।। এমতাবস্থায় ইব্‌ন কায়েসের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে প্রথমে উভয় বাহিনীর সেনাপতিদ্বয় মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সাকিল ও মুসতাওরিদ উভয় নিহত হন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খারেজীরা পরাজিত হয় এবং তাদের মাত্র পাঁচ ব্যক্তি বেঁচে থাকে।[১২১] আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরকে (রা.) খারেজীরা পছন্দ করতো। সিরিয়ায় খারেজীদের একটি দল নাফি ইব্‌ন আল আযরাক ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইবাদের নেতৃত্বে তাঁর পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং তারা উসমান (রা.) সম্পর্কে তাঁর আকীদা জানতে চায়। তিনি ওসমান (রা.)-এর মর্যাদা, দীনের জন্য ত্যাগ, তাঁর ঈমান, ন্যায়বিচার, ইহসান ও উত্তম চরিত্র ইত্যাদি বর্ণনা করেন। এতে তারা

১২০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৮

১২১ . মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইয়ের (রা.)-এর প্রতি ঘৃণা নিয়ে ইরাক ও খুরাসানের বিভিন্ন শহরে চলে যায়। সেখানে তাদের বাতিল মতাদর্শ নিয়ে বসবাস করতে থাকে।[১২২]

বসরার বাইরের খারেজীরা আহওয়ায অঞ্চলের দূলাবে সমবেত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বসরার গভর্নর আব্দুল্লাহ ইব্ন হারেস তাদের দমন করার জন্য মুসলিম ইব্ন আবীসকে প্রেরণ করেন। ৬৫ হিজরী জমাদিউসসানী উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং এক পর্যায়ে উভয় বাহিনীর সেনাপতি নিহত হয়। তুমুল যুদ্ধের পর খারেজীরা বিজয় লাভ করে। অতঃপর খিলাফতে আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা.) থেকে মুহাল্লাবকে খারেজী দমনে মনোনীত করা হয়। তিনি বারো হাজার বাছাই করা সৈন্য নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন। উভয় বাহিনী বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং শেষ পর্যায়ে খারেজীরা পরাজিত হয়ে কিরমান ও ইস্পাহানের দিকে পালিয়ে যায়।
[১২৩]

আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফতকালে মুহাল্লাব ইব্ন আবু সুফরাকে খারেজীদের দমন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে আদেশ দেওয়া হয় যেখানেই খারেজীদের পাবে সেখানেই হত্যা করবে। তার সাহায্যার্থে আবদুর রহমান ইব্ন মিখনাফকে পাঠানো হয়। মুহাল্লাবকে মুকাবেলা করার জন্য ইরাক, ইরান ও খোরাসানের খারেজীরা ‘দ্বারে হরমুযে’ একত্রিত হতে থাকে। অতঃপর উভয় বাহিনী দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। খারেজীরা অত্যন্ত ক্ষীপ্ততার সাথে মোকাবেলা করতে থাকে। তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকে, তারা তাদের চাইতে দশগুণ এমনকি বিশগুণ বেশি সৈন্য মেরে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ময়দানে টিকতে পারেনি। কারণ তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। ফলে তারা দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল আরেকদলকে পরাজিত করতে তাবাররিস্তানের দিক তাড়িয়ে দেয়। মুহাল্লাব বিজয়ী বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ

---

১২২ . আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র), *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৪৩৫

১২৩ . মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

তাবাররিস্তানের দিকে পলায়নরত দলটির পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করে। তারা খারেজীদের পর্যুদস্ত করে দেয়।[১২৪]

হিজরী ৭৬ সালে মাওসিলে খারেজীদের একটি দল সংঘবদ্ধ হয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে থাকে। এদের আমীর ছিল সালিহ ইব্ন মুসাররিহ। তাদের দমনের জন্য মাওসিলের আমীর একটি বাহিনী মোতায়েন করে। বহু সংঘর্ষের পর সালিহ ইব্ন মুসাররিহ পরাজিত ও নিহত হয়। পরাজিত খারেজীরা মাদায়েন চলে যায়। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ এ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। তখন খারেজীরা ছিল সাকুল্যে এক হাজার। কিন্তু তাদের নেতৃত্বে ছিল শাবীব নামক এমন এক বীর যোদ্ধা। সাহাবীদের পর তার মতো বীর আরবদের মধ্যে হাতে গুণা কয়েকজন ছিলেন মাত্র। শাবীবের মা ও স্ত্রীও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে শত্রুদের তাক লাগিয়ে দিত। পুরুষ যোদ্ধারাও তাদের সাথে পেরে উঠতো না। হঠাৎ শাবীব তার বাহিনীসহ কূফায় ফিরে আসলো। অতঃপর কিছুদিন অবস্থান করে কূফা থেকে বেরিয়ে গেলো। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ তাদের মোকাবেলায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন কিন্তু খারেজীরা তাদের পরাজিত করে কূফার দিকে তাড়িয়ে দেয়। [১২৫]

অতঃপর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে নিজেই শাবীবের মোকাবেলা করার জন্য ময়দানে বের হন। শাবীব দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে এবং একপর্যায়ে পানিতে পড়ে গিয়ে নিহত হয়। শাবীবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খারেজীদের শক্তি খর্ব হয়ে যায়। শাবীব নিজেকে খলীফা হিসেবে গণ্য করতো। তার অনুসারীরা তাকে আমীরুল মুমিনীন বলে ডাকতো। শাবীবের মা একজন ক্রীতদাসী। নাম ছিল জাহবারা। সে যেমন ছিল সুন্দরী তেমনি সাহসী ও বীরঙ্গনা। পুত্রের সাথে সেও ময়দানে উপস্থিত হয়ে সম্মুখসমরে লিপ্ত হতো। আর তার স্ত্রী গাযালাসে শাবীবের যোগ্য সহধর্মিনী ছিল। অমিত সাহস আর শক্তিমত্তার জন্য সে

---

১২৪ . *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৩৯

১২৫ . *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৪০

ছিল খারেজীদের অন্যতম প্রেরণা। তাকে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ প্রচন্ড ভয় করত। এ সম্পর্কে জনৈক কবি বলেন:

اسد علي و في الحروب نعامة + فتناء تنفر من صفير الصافر-

''শাসনকর্তা হাজ্জাজ আমাদের নিকট আসে সিংহ হয়ে। যুদ্ধে সে কোমল দেহের উটপাখির ছানা হুইসেলের শব্দ শুনে সে দূরে পালিয়ে যায়।"

هلا برزت الي في الوغا+ بل كان قلبك في جنا حي طائر -

"কেন আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে গাযালা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন না ? বরং আপনার অন্তর হলো পক্ষীশাবকের দু'বাহুর মধ্যখানে। আপনার অন্তর পাখির অন্তরের ন্যায় ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত ও দুর্বল।"[১২৬]

শাবীব সম্পর্কে তার এক অনুসারী বলে:

فان يك منكم كان مروان و ابنه _ وعمرو منكم هاشم و حبيب فمنا حصين و بطين وقعنب + و منا امير المومنين شبيب-

''তোমাদের মধ্যে যদি মারওয়ান, তার পুত্র আমর, হাশিম ও হাবীব থেকে থাকে; তাহলে আমাদের মধ্যে রয়েছেন হুসায়ন, বাতীন, কা'নাব এবং আমাদের মধ্যে আছেন আমীরুল মুমিনীন শাবাব।"[১২৭]

ইব্‌ন কাসীর (রহ.) বলেন, শাবীব ছিল একজন দূরদর্শী, সাহসী ও অন্যতম তেজস্বী পুরুষ। সাহাবায়ি কিরামের পর শাবীব, আশতার, তাঁর পুত্র ইবরাহীম, মুসআব ইব্‌ন যুবাইর, তার ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর, কাতারী ইব্‌ন ফুজাআ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া তেমন তেজস্বী পুরুষ খুব একটা দেখা যায়নি।"[১২৮]

উমাইয়া খলীফা ওমর ইব্‌ন আবদুল আজিজ (রহ.) ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তাঁর ধার্মিকতা, নিষ্ঠা, সৎকর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতার কথা সর্বজন বিদিত। তিনি খারেজীদের ধর্মনিষ্ঠার কারণে তাদেরকে ইসলামের মূল আবেদনে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তারাও তাঁর

---

১২৬. *বিদায়া ওয়াল নিহায়া* , প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪১-৪২

১২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

১২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। খারেজীরা তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে এ সিদ্ধন্তে উপনীত হয় যে, তাঁর মতো পূণ্যবান খলীফার বিরুদ্ধে কোনোরূপ বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ মোটেই সমীচীন হবে না। সুতরাং তিনি যতোদিন খিলাফতের মসনদে আসীন থাকবেন ততোদিন তারা কোনো বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করবে না। [১২৯]

খারেজীদের মধ্য থেকে তার আমলে খুরাসানের একটি দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা তাঁর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাদের যুক্তি ছিল, ওমর ইব্‌ন আজিজকে (রহ.) ওসমান (রা.), আলী (রা.) ও অপরাপর উমাইয়া খলীফাদের কাফির বলতে হবে। যেহেতু তিনি এটা বলেন না তাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আবশ্যক। তিনি তাদের নিকট পত্র পাঠিয়ে কয়েকজন পন্ডিত পাঠাতে বললেন বিতর্ক করার জন্য । তারা দু'জনকে মনোনীত করে তার নিকট পাঠালে তিনি তাদের বিতর্কে পরাজিত করেন। ফলে তাদের একজন তাওবা করে স্বধর্মে ফিরে আসে। অন্যরা জীবনের জন্য চুপ করে থাকে।[১৩০]

উমাইয়া যুগে খারেজীরা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। উমাইয়া শাসকগণ তাদের দমন করতে সক্ষম হন। আব্বাসী আমলে খারেজীরা তাদের বিরোধিতা করতে থাকে এবং ইরাক, পূর্ব আরব ও উত্তর আফ্রিকায় তারা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে থাকে। সবশেষে মিশরের ফাতেমী শাসকগণ তাদের সমূলে ধ্বংস করে দেয়। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যারা অবশিষ্ট থাকে তারা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবেই নামে মাত্র টিকে থাকে এবং এক সময় তাও বিলীন হয়ে যায়।[১৩১]

খারেজীদের প্রধান নেতা কে ছিল এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে ইব্‌ন কাছীরের মতে রাবীআ ইব্‌ন উযাইনাই সর্বপ্রথম খারেজী মতবাদের ধারণা দেয়। আবার কেউ কেউ মনে করে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাসেবী তাদের প্রথম নেতা।[১৩২]

---

১২৯ . মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬

১৩০ . *প্রাগুক্ত*

১৩১ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫

১৩২. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র), *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৫০৩-৫০৪

খারেজীদের উপদল সমূহ

খারেজীরা বহু উপদলে বিভক্ত থাকলেও তাদের মৌলিক উপদল হচ্ছে আটটি। যথা:

আল-মুহাককিমা আল-উলা

এ দলটিই সে দল যারা আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা.) -এর বিরুদ্ধে সিফফীনের যুদ্ধ পরবর্তী সালিসের ঘটনাকে সামনে নিয়ে বিদ্রোহ করে এবং হারুরা নামক স্থানে সমবেত হয়। তাদের নেতা ছিল উরওয়া ইব্ন জারীর, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব আর-রাসিবী, আব্দুল্লাহ ইব্ন কাওয়া, আত্তাব ইব্ন্ুল আওয়ার , ইয়াজিদ ইব্ন আবু আমিম আল-মুহারিবী, হারকুস যুহাইর আল-বাজালী প্রমূখ। এ দলটির ধর্ম বিশ্বাস ছিল হযরত ওসমান (রা.), আলী (রা.), জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণকারীগণ, মুআবিয়া (রা.) ও তার অনুসারীগণ কাফের। কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মাত্রই কাফের। তারা এও বলতো, আমাদের বিরোধী যারা তারা কাফের।[১৩৩]

আল-আযারিকা

এ দলটির নেতা ছিল আবু রাশিদ নাফি ইব্ন্ুল আযরাক আল-হানাফী। সে বনু হানীফা গোত্রে জন্ম গ্রহণ করে তাই তাকে আল-হানাফী বলা হতো। খারেজীদের মধ্যে সংখ্যায় তারাই বেশি ছিল। তারা বিশ্বাস করতো যে, নবীরা সগীরা এমনকি কবীরা গুনাহ করতে পারেন। তাদের মতে যে অঞ্চল বা দেশের জনগণ তাদের বিরোধিতা করবে সে দেশ ও অঞ্চল দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত। সেখানকার শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা বৈধ। তাদের বিরোধিতা এমনকি তাদের বিরোধীদের ছোট্ট শিশুরাও অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। আর তাদের প্রত্যেক অনুসারীকে হিজরত করে তাদের মূল জামায়াতের নিকট অবস্থান গ্রহণ ফরজ। যদি কোনো অনুসারী হিজরত না করে তাহলে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে। তারা ব্যভিচারীকে পাথর মারার বিধান অস্বীকার করে থাকে।[১৩৪]

---

১৩৩ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯

১৩৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০

আন-নাজাদাত

এ দলটি নাজদা ইব্ন আমিরের অনুসারী। এ দলটি ইয়ামামা অঞ্চলে বিদ্রোহ করে। এ দলের মতে, তাদের বিরোধিরা সকলেই জাহান্নামী। মদ্যপানের শাস্তি তারা অস্বীকার করে। [১৩৫]

আল-আজারিয়া

এ দলটির নেতা ছিল আব্দুল করীম ইব্ন ুল আজারিদ, দলটি সিজিস্তানে অবস্থান করে। এর নেতৃত্ব নিয়ে আবদুল করীম ইব্ন ুল আজারিদ ও আতিয়্যা ইব্ন ুল আসওয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে। এক পর্যায়ে উভয়ে উভয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৩৬]

আস-সাআলিবা

এ দলটির নেতা সা'আলাবা ইব্ন মিশকান। এ দলটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তারা মনে করতো, গোলাম যখন সম্পদশালী হয়ে উঠবে তখন তাদের থেকে যাকাত নেয়া হবে এবং যখন তারা অভাবী হবে তখন যাকাত দেওয়া হবে।[১৩৭]

আল-ইবাযিয়্যা

এ দলের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইব্ন ইবাদ আল-মায়ী আত-তামিমী। উমাইয়া শাসনের শেষ দিকে এদের আবির্ভাব ঘটে।[১৩৮] এরা মধ্যপন্থী খারেজী। এদের মতে তাদের বিরোধিরা কাফের নয় তবে মুসলিমও নয়। তাঁরা তাদের বিরোধিদের হত্যার নির্দেশ দেয় না। তারা কাফের আভিধানিক অর্থে বলে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অস্বীকারকারীরাও কাফের। তারা এও মনে করে যে, তাদের বিরোধীদের দেশ তাওহীদের দেশ আর তাদের সৈনিক অঞ্চল হল বিদ্রোহীদের অঞ্চল। [১৩৯] আলী (রা.) আবু মূসা আশআরী (রা.) ও আমর

---

১৩৫ . *প্রাগুক্ত*

১৩৬ . *প্রাগুক্ত*

১৩৭ . *প্রাগুক্ত*

১৩৮ . ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (ঢাকা: মেরিট ফেরার, ২০১৩ খ্রি.), ১৭শ সং. পৃ. ১৮৭

১৩৯ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমোয়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০

ইব্ন আসকে (রা.) তারা অবিশ্বাসী মনে করে। দক্ষিণ আলজিরিয়াতে এখনও এ সম্প্রদায়ের কিছু লোক দেখতে পাওয়া যায়। [১৪০]

আস-সাফরিয়্যা আয-যিয়াদিয়্যা (الصفرية الزيا دية)

এ দলটির নেতা ছিল যিয়াদ ইব্ন ুল আসফার। এদের মতে, তাকিয়্যা কথায় বৈধ তবে কর্মে বৈধ নয়। আর যেসব পাপে হদ্দ নেই যেমন সালাত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বর্জন কুফুরী হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ যারা এসব ইবাদত পালন করবে না তারা কাফের।[১৪১] প্রত্যেক কবিরা গুনাহকারী কাফের। [১৪২] তারা এও মনে করে যে, তাদের বিশ্বাসের বাইরে যারা অবস্থান করছে তারাও কাফের। আর মুসলিম বিশ্ব অবিশ্বাসের লীলাভূমি তারাই শুধু বিশ্বাসী মুমিন। [১৪৩]

আল-বায়হাসিয়্যা (البيهسية)

আবু বাইহাস হাইসাম ইব্ন আমির এ দলটির নেতা ছিল। কেউ কেউ তার নাম হাইসাম ইব্ন জাবির বলেছেন। আবু বাইহাসের মতে, হক ও বাতিলকে জানার নাম ঈমান। ঈমান হচ্ছে ক্বলব দ্বারা জানার নাম। মুখে স্বীকার ও আমলে রূপায়ণ ঈমান নয়। তবে সাধারণ বাইহাসিদের মতে, অন্তর দিয়ে জানা, মুখে স্বীকার করা ও আমলে পরিণত করা এসব বিষয়ের সমন্বিত রূপকে ঈমান বলে।[১৪৪]

---

১৪০ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

১৪১ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

১৪২ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

১৪৩ . *প্রাগুক্ত*

১৪৪ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

খারেজীদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসসমূহ

খারেজীদের মৌলিক ধর্ম বিশ্বাস সমূহ নিম্নরূপঃ

১। তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির মনে করে। তাদের কেউ কেউ কবীরা, সগীরা, আলাদা করে না। পাপের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে তারা মানে না। এমনকি তারা মনের ভুলকেও পাপ মনে করে।[১৪৫]

২। তাদের মতে ওসমান (রা.), আলী (রা.), উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মুআবিয়া (রা.), সিফফীনের যুদ্ধ পরবর্তী দুই সালিশ আবু মূসা আশআরী (রা.), আমর ইব্‌ন্‌ুল আস (রা.) এবং তাঁদের দু'জন অথবা কোন একজনকে সঠিক মনে করে যে ব্যক্তি তারা সকলেই কাফের।[১৪৬]

৩। তারা মনে করে খলীফা শুধু কুরাইশী হবে –এমন নয়। সে সাথে কোন আরবী অনারবীর চেয়ে বেশি অধিকার রাখে না। তবে তারা অকুরাইশী খলীফা হওয়াকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কেননা, এ ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে, খলীফা যদি শরীয়তবিরোধী কোনো কিছু করে তাহলে তাকে অপসারণ অথবা হত্যা করা সহজতর হয়।[১৪৭]

৪। তারা বিশ্বাস করে অত্যাচারী ও পাপী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদ করা ফরজ। এমনকি তারা বিশ্বাস করে এ ফরজটি আরকানে ইসলামের মতোই ফরজে আইন ও বড় ফরজ। [১৪৮]

৫। এদের অন্যতম ফিরকা আন-নাজদাত মনে করে, যদি জনগণ পরস্পরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তাহলে ইমাম বা খলীফা নির্বাচনে কোনো প্রয়োজন নেই। যদি জনগণ মনে করে, সত্য ও হকের উপর উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের একজন ইমাম বা খলীফা প্রয়োজন তাহলে খলীফা বা ইমাম নির্বাচন করা জায়েয। তারা এও মনে করে যে, ইসলামী শরীয়াহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত কর্তব্য হিসেবে ইমাম নির্বাচন জনগণের উপর ওয়াজিব নয় বরং

---

১৪৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২

১৪৬ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২০

১৪৭ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২

১৪৮ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২০

তা জায়েয। এটি ওয়াজিব হবে জনগণের কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসলামের আদেশ হিসেবে নয়।[১৪৯]

ড. আমিনুল ইসলাম এদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন:

"ইমাম ও নেতা সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) এর ধারণার অনুরূপ। এ মতে খলীফা নির্বাচিত হবেন সমগ্র মুসলিম সমাজ দ্বারা এবং অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে। তাদের কোনো নির্দিষ্ট পরিবার বা গোত্রের সদস্য হতে হবে না। ভালো মুসলমান হলে একজন ক্রীতদাসও ইমাম হতে পারবে। এমনকি একজন মহিলাও ইমাম হতে পারেন। তাদের কেউ কেউ অকুরাইশী ইমামে বৈধতা স্বীকার করলেও অন্যেরা ইমামের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, একটি মুসলিম শাসকমন্ডলী নিজেদের শাসন করতে সক্ষম। তারা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে পুরনো ধারণা পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। তবে তাঁদের ধর্মীয় মতাবলি ছিল অপরাপরদের মতের বিরোধী। তারা অখারিজীদের অবিশ্বাসী বলে নিন্দা করেন।" [১৫০]

আধুনিক খারিজীগণ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিসরে আধুনিক ইসলামী জাগরণের প্রেক্ষাপটে কিছু নতুন ইসলামী সংঘঠন প্রাচীন খারেজী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করে। তারা খারেজী সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিমালা সঠিক বলে স্বীকার করে। এদেরকে নব্য খারেজী বলে আখ্যায়িত করা হয়। এদের একটি প্রসিদ্ধ সংগঠন হচ্ছে জামাতুল মুসলিম বা জামাতুত তাফকীর ওয়াল হিজরাহ। এ দলটির প্রতিষ্ঠাতা শুকরী আহমদ মুস্তাফা। তিনি মিসরের আসইয়ুত শহরে ১৯৪২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতি তিনি ঝুঁকে পড়েন এবং এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। আসইয়ুতের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ইখওয়ানের সদস্য হওয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তখন তার বয়স ছিল ২৩ বছর। দীর্ঘ ৭ বছর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে নতুন এক বৈপ্লবিক চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে কারাগার থেকে তিনি

---

১৪৯ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২

১৫০ . ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংসস্কৃতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১০৭

বের হন। তিনি ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে, একমাত্র তাদের জিহাদী কর্মকান্ডের মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় সম্ভব হবে। আর অতি দ্রুতই এ বিজয় তারা ছিনিয়ে আনবেন। তাদের এ সকল দাবী এবং দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা যুবক শ্রেণিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তাদের দল জামাতুল মুসলিমীনে যারা অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাদেরকে তারা কাফির বলে ঘোষণা করে এবং তাদের কর্মী বাহিনীকে এদের হত্যা করার নির্দেশ জারী করে। বিশেষকরে যে সকল ইসলামী ব্যক্তিত্ব এ দলের কর্মীদের বিভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট ছিলেন তাদেরকে তারা টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করে এবং গুপ্ত হত্যা করতে থাকে।[১৫১] নব্য খারেজীদের চরমপন্থার অজুহাতে তৎকালীন মিসরীয় সরকার অগণিত আলিম ও ইসলামপন্থী যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ইসলামবিদ্বেষী প্রচার মাধ্যমগুলি এ অজুহাতে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী চিন্তাবিদ, দায়ী ও ধার্মিক লোকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ পেয়ে যায় এবং এটি কাজেও লাগায়। ১৯৭৮ সালে এদের অধিকাংশদের মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয় আর বাকীদের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। বর্তমানে এদের কর্মকান্ড তেমন একটা দেখা যয় না, মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন কর্মকান্ড দ্বারা তারা তাদের উপস্থিতির জানান দেয়। [১৫২]

নব্য খারেজীদের ধর্মবিশ্বাসসমূহ

১। নব্য খারেজী সংগঠন জামাতুল মুসলিমীনের প্রধান নেতা শুকরী আহমদ মুসতাফা দাবী করেন যে, পবিত্র কুরআন বুঝার জন্য কোনো মানুষের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এমনকি মানুষের ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করাকে তিনি কুফরী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মতামতের কোনো মূল্য নেই। এ বিশ্বাসসের আলোকে তারা নিজেদের আবেগ ও যুক্তি দ্বারা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা করতো।[১৫৩]

২। জামাতুল মুসলিমীনের সদস্যরা সাহাবীদের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে ইসলামচ্যুত মনে করতো। সাহাবায়ি কিরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, ইমাম,

---

১৫১ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২১

১৫২ . *প্রাগুক্ত*

১৫৩ . *প্রাগুক্ত*

মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও পূর্ববর্তী ও সমকালীন সকল আলিমকে তারা মূর্খ, স্বার্থপর, আপোষকামী, তাগুত এর অনুসারী বলে অভিহিত করতো। যেহেতু তারা তাগুতী রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোষ করে চলেছেন তাই তারা ইসলামের বাইরে চলে গেছেন। তারা সাহাবায়ি কিরাম থেকে শুরু করে সমকালীন আলিমদের কোনো মতামত ও ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতো না। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের উপর নির্ভর করতো। কুরআন মাজীদ ও হাদীসের পাশাপাশি তারা আকল ও বিবেককে ইসলামের মূল উৎস মনে করতো। কোনো আলিমের লিখিত বই পড়তে অথবা কোন আলিমকে প্রশ্ন করতে তাদের অনুসরীদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়।[১৫৪]

এদের মতে, যদি কোনো মুসলিম ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক ভিন্নতাবলম্বিদের কাফির ফতোয়া প্রদান করে। তারা রাষ্ট্রীয় চাকুরি, রাষ্ট্রের আনুগত্য, ধর্মনিরপেক্ষ অথবা গণতান্ত্রিক কোনো দলকে সমর্থন দান, তাদের দলে যোগ না দেওয়া, তাদের কথিত জিহাদকে সমর্থণ না করার অজুহাতে অনেক আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির আখ্যা দিয়ে হত্যা করেছে।[১৫৫]

৩। তারা উপনিবেশ উত্তর মুসলিম দেশগুলোর বিশেষ করে মিসরের শাসকদের ইসলাম বিরোধী আইন প্রচলনের কারণে কাফির বলে ঘোষণা করে। তারা দাবী করে আধুনিক মুসলিম দেশগুলোর শাসকগণ যেহেতু ইসলামী আইনে বিচার করে না বরং ইসলাম বিরোধী আইনে বিচার কার্য করে থাকে তাই তারা সকলেই কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ হিসেবে গণ্য। আর এ সকল তাগুতী সরকারের আনুগত্যের কারণে এসব দেশের সাধারণ নাগরিকগণ কাফির।[১৫৬]

৪। একজন মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে জামায়াত ও বাইয়াত গ্রহণ। মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে জামায়াতবদ্ধ হওয়া এবং বাইয়াত গ্রহণ করা। তারা তাদের এ মতের পক্ষে কুরআন মাজীদ ও হাদীসের জামায়াত ও বাইয়াত বিষয়ক নির্দেশাবলীকে দলীল হিসেবে পেশ করে। এ সম্পর্কে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন: "তাদের এই দাবী

---

১৫৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২২

১৫৫ . *প্রাগুক্ত*

১৫৬ . *প্রাগুক্ত*

মূর্খতা ও বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল। কারণ তাদের পেশ করা দলীলের কোনোটিতেই বাইয়াত ও জামায়াতকে ঈমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। সর্বোপরি তারা এই পরিভাষাদ্বয়ের অর্থও বুঝতে পারেনি।"[১৫৭]

৫। তারা বিশ্বাস করে যে, পাপী রাষ্ট্র তথা যেখানে আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার কার্য সমাধা করা হয় না, মানুষের তৈরি আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করা হয় তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজে আইন। সে সাথে ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য মুসলিমদের উপর সবচেয়ে বড় ও প্রথম ফরজ হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রধান ও প্রথম ফরজ পালন করতে গিয়ে অন্যান্য ফরজ, ইবাদাত বাদ দিতে হলে কোন সমস্যা নেই। যেমন প্রয়োজনে সালাত বাদ দেওয়া অথবা সালাতের মধ্যকার কোন ফরয কে বাদ দেওয়া। কেননা, এগুলো ছোট ফরজ, এগুলো ছুটে গেলে সমস্যা নেই। তাদের এ মতের প্রেক্ষিতে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন:

"এটিও তাদের মনগড়া একটি মতামত ছিল। কোনো বড় ফরজ বলতে হলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। জিহাদ, দাওয়াত, সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ ইত্যাদি কর্ম কুরআন ও হাদীসে নির্দেশিত ফরজ বটে , কিন্তু কুরআন ও হাদীসে কখনোই এগুলিকে সবচেয়ে বড় ফরজ বলা হয়নি। বরং কুরআন-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, এ সকল ইবাদত বড় ফরজ হওয়াতো দুরের কথা ফরজে আইনও নয়, বরং তা মূলত ফরজে কিফায়া। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওযর ছাড়াও যারা জিহাদ না করে বসে থাকে তবে তাদের মর্যাদা কিছু কমলেও কোনো পাপ হবে না। হাদীস শরীফে পিতা-মাতার খেদমতের জন্য জিহাদ পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের আবেগ এবং কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের কর্মধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদের বিভ্রান্ত করেছে।"[১৫৮]

---

১৫৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩

১৫৮ . *প্রাগুক্ত*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরজিয়্যাহ সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ

মুরজিয়্যাহ শব্দটি আরবী। এটি ارجاء ক্রিয়ামূল থেকে উৎকলিত এর মূল অক্ষর ر+ج+ء অর্থ বিলম্বিত করা, পিছিয়ে দেয়া, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। مرجئ অর্থ বিলম্বকারী, স্থগিতকারী। বহুবচনে مرجئة অর্থাৎ বিলম্বকারীগণ বা স্থগিতকারীগণ।[১৫৯]

মুরজিয়্যা নামকরণের কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তারা কবীরাগুনাহকারী জান্নাতী না জাহান্নামী এ বিষয়ের সিদ্ধান্তকে কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্ব করে দিয়েছিল। দুনিয়াতে তারা এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেনি। কেউ কেউ বলেন, তারা আলীকে (রা.) প্রথম স্তর থেকে নামিয়ে চতুর্থ স্তরে নিয়ে তাঁর মর্যাদাকে পশ্চাতবর্তী করে দিয়েছে। আরেকটি মত হচ্ছে, তারা বলে, ঈমান থাকলে যেমন কোনো গোনাহ দ্বারা ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। তেমনি কুফর থাকলে কোনো ইবাদত দ্বারাই কোনো লাভ হয় না। এভাবেই তারা পাপীদের আশা প্রদান করে থাকে। এজন্য তাদেরকে মুরজিয়্যা বলা হয়।[১৬০] ইব্ন্ুল আমীর বলেন, তারা যেহেতু বিশ্বাস করে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না বা তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন তাই তাদেরকে মুরজিয়্যাহ বলা হয়।[১৬১] আব্দুল কাহির বাগদাদী বলেন, যেহেতু তারা আমল বা কর্মকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে তাই তাদেরকে মুরজিয়্যা বলা হয়।[১৬২]

মুরজিয়্যাদের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট

হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম থেকেই এ মতটি প্রসার লাভ করে।[১৬৩] কবীরা গুনাহকারী মুমিন কী মুমিন না ? এ বিষয়ে একটি বিতর্ক চলছিল। খারেজীরা বলছিল এরূপ ব্যক্তি কাফির আর

---

১৫৯ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৪

১৬০ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩

১৬১ . আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র), খ. ১, ২য় সং. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

১৬২ . আব্দুল কাহির ইব্ন তাহির বাগদাদী, *আল-ফারকু* বাইনাল ফিরাক বৈরুত: দারুল মারিফাহ, তা.বি.), পৃ. ৩২

১৬৩ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৪

মুতাযিলারা বলছিল এ রূপ ব্যক্তি মুমিন নয় তবে মুসলিম। ইমাম হাসান বসরী (রহ.) এবং একদল তাবেয়ী বলছিলেন এরূপ ব্যক্তি মুনাফিক। কেননা, আমল হচ্ছে অন্তরে গ্রন্থিত বিশ্বাসের প্রমাণ কিন্তু যবান অন্তরের বিশ্বাসের প্রমাণ নয়। জমহুর বলেছিল, এরূপ ব্যক্তি পাপী মুমিন। আল্লাহ চাইলে তাকে পাপ পরিমাণ শাস্তি দিবেন অথবা তিনি চাইলে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিবেন। এ বিতর্কে অন্য একটি দল অংশগ্রহণ করে তারা বলে, ঈমান হচ্ছে মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের বিশ্বাস ও পরিচিত। সুতরাং পাপ দ্বারা ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা, পাপ দ্বারা স্বীকৃতি, বিশ্বাস ও পরিচিতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আমল থেকে ঈমান পৃথক বিষয়। এ দলটিই মুরজিয়্যা নামে পরিচিত। মুরজিয়্যাদের প্রবক্তা কে এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তাবেয়ী হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবী তালিবকে এ ফিরকার উদগাতা মনে করা হয়। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়্যাহ পুত্র। তবে গবেষক আলিমদের মতে, তিনি এ অর্থে মুরজিয়্যা ছিলেন যে, আমীরুল মুমিনীন ওসমান (রা.)-এর শাহাদাৎ পরবর্তী বিবদমান সাহাবা-ই- কিরামের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের বিষয়টিকে পশ্চাতবর্তী রেখেছিলেন।[১৬৪]

মুরজিয়্যাদের উপদল সমূহ

মৌলিক ভাবে মুরজিয়্যারা চার দলে বিভক্ত। যথা:

(১) খারেজী ভাবাপন্ন মুরজিয়্যা (المرجئة الخوارج)

(২) কাদরিয়্যা ভাবাপন্ন মুরজিয়্যা (المرجئة القدرية)

(৩) জাবরিয়্যা ভাবাপন্ন মুরজিয়্যা (المرجئة الجبرية)

(৪) খালিস মুরজিয়্যা (المرجئة الخا لصة)

খালিস মুরজিয়্যারা পাঁচ দলে বিভক্ত। যথা:

(১) আল-ইউনুসিয়্যা। এরা ইউনুস ইব্‌ন আওন আন নামিয়ীর অনুসারী।

(২) আল-গাছছানিয়্যা। এরা গাছছান কূফীর অনুসারী।

(৩) আছ-ছাউবানিয়্যা। এরা আবু ছাউবানের আনুসারী।

---

১৬৪ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪

(৪) আত-তুমানিয়্যা। এরা আবু মুআয আত-তুমানীর অনুসারী।

(৫) আল-উবাইদিয়্যা। এরা আল-উবাদ আল মুকতাইবের অনুসারী।[১৬৫]

এছাড়া গবেষক আলেমগণ মুরজিয়্যাদের দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন: (১) হকপন্থী মুরজিয়্যা (২) বিদআতী মুরজিয়্যা। হকপন্থী মুরজিয়্যা হচ্ছে তারা যারা বলে কেউ কবীরা গোনাহ করলে তার পাপ পরিমাণ শাস্তি প্রদান করা হবে। সে অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে না। আবার আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। পক্ষান্তরে বিদআতী মুরজিয়্যা বলা হয় ঐ সকল মুরিজয়্যাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত যাদেরকে মুরজিয়্যা নামে আখ্যায়িত করেছে।[১৬৬] অর্থাৎ যাদের মূলনীতি হচ্ছে:

لا يضر مع الايمان معصية كما انه لا ينفع مع الكفر طاعة

''ঈমান থাকলে কোনো পাপই কোনো ক্ষতি করে না। যেমন কুফর থাকলে কোনো পুণ্যই কাজে লাগে না।''[১৬৭]

মুরজিয়্যাদের মতাদর্শ

মুরজিয়্যাদের বিশ্বাস হচ্ছে, নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট। ইবাদতের কোনো উপকারিতা নেই, পাপেও কোনো ক্ষতি নেই।[১৬৮] তারা মনে করে, ঈমানের সাথে আমালের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান ও আমল সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বিষয়। ঈমানের জন্য অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট। ঈমানের পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য ইসলামের কোনো বিধি-বিধান পালন আবশ্যক নয়। আর ঈমানদার ব্যক্তি কবীরা গোনাহে লিপ্ত হলেও তাঁর জান্নাত লাভে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। যতো গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতে যাবে।[১৬৯]

---

১৬৫ . *প্রাগুক্ত*

১৬৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩-৩০৪

১৬৭ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৪

১৬৮ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

১৬৯ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৪

মুরজিয়্যারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের তাওহীদের ফযীলত ও ক্ষমা বিষয়ক বাণীগুলোকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে বাকী আয়াত ও হাদীসগুলো ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দিয়ে পুর্বোক্ত মতাদর্শ গ্রহণ করে।[১৭০] এ সম্পর্কে ড. রশীদুল আলম বলেন:

‘‘মুরজিয়্যা চিন্তাবিদরা ঈমানের প্রকৃতি সম্পর্কে এক নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কোনো কোনো চরমপন্থী মুরজিয়্যা এমন মন্তব্যও করেছেন যে, বিশ্বাস অন্তরের ব্যাপার; এদের মৌলিক স্বীকৃতি ও বাহ্য অনুষ্ঠান অপরিহার্য নয়। অন্য ধর্মের মৌলিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি অন্তরের দিক দিয়ে মুসলমান থাকতে পারে। বাইরের অনুষ্ঠানের চেয়ে অন্তরের বিশ্বাসের মধ্যেই প্রকৃত ধর্ম নিহিত রয়েছে। মধ্যপন্থী মুরজিয়্যারা মনে করেন যে, বিশ্বাস হৃদয়ের ধারণা ও সেই মোতাবেক কাজ করার ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ধারণা ও কাজের সামঞ্জস্য বিধানই বিশ্বাস। তাদের মতে, বাহ্য অনুষ্ঠান হৃদয়ের বিশ্বাসকে দূরীভূত করে।’’[১৭১]

আহলুস সুন্নাাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি অনন্তকাল জাহান্নামী হবে না। পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর তারা জান্নাতে অবস্থান করবে। এ ছাড়া এটা মহান আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি ইচ্ছা করলে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এটা একান্তই মহান আল্লাহর ইচ্ছা। কবীরা ও সগীরা গুনাহ সম্পর্কে তাদের মতাদর্শ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি শিরক ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না এবং জান্নাতের আনন্দ থেকে সে বঞ্চিতও হবে না। সগীরা গুনাহের জন্য যদি কেউ তাওবা করে তাহলে এর জন্য জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে না। আল্লাহর ভয়ের চেয়ে তারা আল্লাহ প্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছে বেশি। তারা মনে করে আল্লাহ ভীতি মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায় আর আল্লাহর মহব্বত ও আকর্ষণ তার নিকটে নিয়ে যায়। এজন্য তারা আল্লাহর ভয় নয় আল্লাহর প্রেমের জয়গান গায়।[১৭২]

১৭০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৫

১৭১ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

১৭২ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

মুরজিয়্যারা নারীকে ফুলের সাথে তুলনা করে থাকে। ফুলে যেমন বিভিন্ন পাখি ও মৌমাছি বসে থাকে তেমনি বিয়ে ছাড়াই নারীদের ইচ্ছে মতো ভোগ করা যেতে পারে।[১৭৩] এটি নি:সন্দেহে একটি জঘন্য আকীদা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এর কোনো ভিত্তি নেই। এসব নিঃসন্দেহে ব্যাভিচারকে বৈধতা দেয়ার নামান্তর। মুরজিয়্যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মুরজিয়্যাদের মধ্যে উবাইয়্যা উপদল এটি বিশ্বাস করে।

তাদের আরেকটি মত ছিল যে, আল্লাহর বিচারের পূর্বে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহনশীলতা ও দয়া প্রদর্শন করা উচিত। এ যুক্তির ভিত্তিতে তারা উমাইয়া শাসনকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। তারা বলে, খারেজী ও অন্যান্য দলের মতো উমাইয়া শাসকদেরকে হীন প্রতিপন্ন করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। যেহেতু উমাইয়ারা মুসলিম তাই তারা লোকজনের পক্ষ থেকে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। উল্লেখ্য মুরজিয়্যারা যেমন উমাইয়্যাদের প্রতি সহনশীল তেমনি উমাইয়ারাও মুরজিয়্যাদের হিতাকাঙ্খী ছিল। ফলে তারা মুরজিয়্যাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে।[১৭৪] এ সম্পর্কে ড. আমিনুল ইসলাম বলেন: ''মুরজিয়্যারা বলেন, শাসক হিসেবে উমাইয়াদের সহ্য করতেই হবে। যদিও তারা ধর্মের প্রতি উদাসীন, তবু তাদের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করা আবশ্যক। তারা যদি কোনো পাপ করে থাকে, তাহলে স্বয়ং আল্লাহই তাদের বিচার ও শাস্তিবিধান করবেন। সুতরাং তাদের কোনোমতেই পৌত্তলিক বলে নিন্দা করা চলে না এবং তাদের শাসনের বিরুদ্ধে কোনো মুসলমানের বিদ্রোহ করাও উচিত নয়। মুরজিয়্যারা আরও বলেন, মুসলমান সমাজের মঙ্গলের জন্যই উমাইয়া শাসনের প্রতি অনুগত থাকা দরকার, যদিও তাদের ব্যক্তিগত অনেক দোষ ছিল সুস্পষ্ট।''[১৭৫]

মুরজিয়্যাদের কিছু কিছু বিষয় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। ফলে অনেকে না বুঝে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে ভুল করে মুরজিয়্যা সাব্যস্ত করে। এ

---

১৭৩ মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

১৭৪ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭

১৭৫ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

সম্পর্কে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: ''খারেজী, মুতাযেলী এবং তাদের সাথে একমত বিভিন্ন ফিরকা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে মুরজিয়্যা বলে আখ্যায়িত করে। কারণ এ সকল ফিরকা কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিমের বিধান তাৎক্ষণিক বলে দেয় যে, সে অনন্তকাল জাহান্নামে বাস করবে। আহলুস সুন্নাত কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অনন্ত জাহান্নামবাসী না বলে তার বিষয়টি আল্লাহর হাতে বলে বিশ্বাস করে। এভাবে তারা পাপী মুসলিমের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি পিছিয়ে দেন।''[১৭৬]

১৭৬ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাদারিয়্যাহ পরিচিতি ও মতাদর্শ

কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়টি আরবি القدر থেকে উৎকলিত হয়েছে। القدر অর্থ নির্ধারণ করা। ইসলামের পরিভাষায় القدر হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ, পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর।[১৭৭] কাদারী বা কাদারিয়্যাহ দল বা সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাদারী বা কাদারিয়্যাহ হচ্ছে তাকদীর বা আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ক দল। যেহেতু কাদারিয়্যারা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর অস্বীকার করেন তাই তাদেরকে কাদারিয়্যাহ বলা হয়ে থাকে। [১৭৮] কোনো কোনো আলিম কাদারিয়্যাকে মুতাযিলার একটি উপদল মনে করেন।[১৭৯] আবার কাদারিয়্যাগণ নিজেদেরকে اصحاب العدل و التوحيد নামে পরিচয় দিতেন।

কাদারিয়্যাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

খোলাফায়ি রাশিদীনের শেষ আমলে এদের উদ্ভব ঘটে। পবিত্র কাবা ঘরে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। পবিত্র কাবায় আগুন লাগার ঘটনায় জনৈক ব্যক্তি বলল, احرقت بقدر الله অর্থাৎ এটা আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটেছে। অন্য কয়েকজন বলল, আল্লাহ এ রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে এ মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে।[১৮০]

কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রধান উদগাতা কে ছিলেন এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যা (রহ.)-এর মতে, বসরার অধিবাসী সাফওয়াহ নামক এক অগ্নি উপাসক ইরাকে এ মতবাদের সূচনা করেন। আল্লামা আত-তুফী (রহ.) তার নাম বলেছেন সুসান। তবে বেশির ভাগ ঐতিহাসিকই এ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে মাবাদ আল-জুহানীকে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন

---

১৭৭ . *প্রাগুক্ত*

১৭৮ . *প্রাগুক্ত*

১৭৯ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬

১৮০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭

বসরা অধিবাসী আসাভিরা নামক এক প্রাচীন সম্প্রদায়ের আবু ইউনুস সানসওয়াহ নামক জনৈক খ্রিস্টান ব্যক্তির নিকট থেকে। কেউ কেউ বলেছেন মাবাদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী ও গায়লান আদ-দামেশকী উভয়ই আবু ইউনুস সানসওয়াহ থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন। কোনো বর্ণনায় এসেছে গায়লান আদ-দামেশকী মাবাদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করেন। মাবাদ আল-জুহানী বসরা এবং গায়লান আদ-দামেশকী দামেশকে এ মতবাদ ছড়িয়ে দেন।[১৮১]

কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উপদল সমূহ

কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উপদল হচ্ছে বাইশটি। এর মধ্যে দু'টি জঘন্য কুফুরী আকীদায় বিশ্বাসী।[১৮২]

বাইশটি উপদল হচ্ছে নিম্নরূপ:

১) আল-ওয়াসিলিয়্যাহ (الواصيلية)
২) আল আমরাবিয়্যাহ (العمروية)
৩) আছ - ছুমামিয়্যা (الثمامية)
৪) আল-মারিসিয়্যাহ (المريسية)
৫) আল-মামারিয়্যাহ (المعمرية)
৬) আন-নাযযামিয়্যাহ (النظامية)
৭) আল-হিশামিয়্যাহ (الهشامية)
৮) আল-মিরদারিয়্যাহ (المردارية)
৯) আল-জাফরিয়্যাহ (الجعفرية)
১০) আল-ইসকাফিয়্যাহ (الاسكافية)
১১) আল-হুযালিয়্যাহ (الهذالية)
১২) আল-আসওয়ারিয়্যাহ (الاسوارية)
১৩) আশ-শাহ্হামিয়্যাহ (الشهامية)
১৪) আল-জুববাইয়্যাহ (الجبائية)
১৫) আল-বাহশামিয়্যাহ (البهشمية)

---

১৮১ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮

১৮২ . *প্রাগুক্ত*

১৬) আল-খাবিতিয়্যাহ (الخابطية)
১৭) আল-খাইয়াতিয়্যাহ (الخياطية)
১৮) আল-কাবিয়্যাহ (الكعبية)
১৯) আল-বিশরিয়্যাহ (البشرية)
২০) আল-জাহিযিয়্যাহ (الجاحظية)
২১) আল-হিমারিয়্যাহ (الحمارية)
২২) আসহাবু সালাহ কুববা (اصحاب صالح قبة)

আল-ওয়াসিলিয়্যাহ

এ দলের প্রধান ছিলেন ওয়াসিল ইব্‌ন আতা। আবাদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী ও গায়লান আদ-দামেশকীর পর তিনি কাদারিয়্যাদের নেতৃত্ব দেন। তিনি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

আল-আমরাবিয়্যা

এ উপদলের প্রধান ছিলেন বনু তামীমের আযাদকৃত দাস আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন কাব।

আছ-ছুমামিয়্যাহ

এদের নেতৃত্বে ছিলেন ছুমামা ইব্‌ন আশরাস আন-নুমাইরী। তিনি একজন গোত্রপতি ছিলেন। তিনি খলীফা মামুনকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন।

আল-মারিসিয়্যাহ

এ দলটি মুরজিয়্যায়ে বাগদাদ নামেও অভিহিত হয়। বিশর আল মারিসী এ দলের প্রধান নেতা ছিলেন। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি কাযী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তিনি যখন কুরআন সৃষ্ট বলে রায় প্রদান করেন তখন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তাকে বর্জন করেন।

আল-মামারিয়্যাহ

এ দলটি মা'মার ইব্‌ন আব্বাদ আস-সালামীর অনুসারী।

আন-নায্‌যামিয়্যাহ

এ দলের উদগাতা ছিলেন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন সাওয়ার আন-নাযযাম। আবু ইসহাক দার্শনিকদের মতো অবিভাজ্য অনু অস্বীকার করতেন, তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। তিনি

দার্শনিকদের বিভিন্ন মত ও দর্শনকে মুতাযিলাদের মতো দর্শনের সঙ্গে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করেছেন।

আল-হিশামিয়্যাহ

এরা হিশাম ইব্‌ন উমর আল-ফুয়াতী আশ-শায়বানীর অনুসারী। তিনি তাকদীর বিষয়ে প্রচন্ড রকম বাড়াবাড়ি করতেন।

আল-মিরদারিয়্যাহ

এরা আবু মুসা ঈসা ইব্‌ন সাবীহ-এর অনুসারীরা তাকে মুতাযিলা ফিরকার রাহেব বা দরবেশ বলা হতো। তিনি মনে করতেন মানুষ ইচ্ছা করলে কুরআনের অনুরূপ বা এর চেয়ে উচ্চ সাহিত্য মান সম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করতে পারে।

আল-জাফারিয়্যাহ

এদের নেতৃত্বে ছিলেন জাফর ইব্‌ন হারব আস-সাকাফী ও জাফর ইব্‌ন মুবাশশির আল-হামাদানী। এরা দুইজন ছিলেন আবু মুসা ঈসা ইব্‌ন সাবীহের শিষ্য। জাফর ইব্‌ন হারব স্বীয় উস্তাদের অনুসারী ছিলেন। সে সাথে তিনিও কিছু যুক্তি পেশ করে দলটির মধ্যে নতুনত্ব আনেন। জাফর ইব্‌ন মুবাশশির মনে করতেন, উম্মতের মধ্যে যারা ফাসিক তারা ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক ও যিনদীকদের চেয়েও মন্দতর। কিন্তু তিনি এ কথাও বলতেন, ফাসিক মুমিন নয় কাফিরও নয়। তিনি এও মনে করতেন যে, মদ্যপায়ীকে বেত্রাঘাত করার বিষয়ে সাহাবায়ি কিরামের ইজমা ছিল ভুল।

আল-ইসকাফিয়্যাহ

এ উপদলটি আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-ইসকাফীর অনুসারী। তিনি জাফর ইব্‌ন হারব থেকে মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি জাফর ইব্‌ন হারবের বিরোধিতাও করেছেন। তার মতে, আল্লাহ তা'আলা জুলুম করতে সক্ষম কিন্তু আকল ও বিবেকসম্পন্নদেরকে জুলুম করতে সক্ষম নন।

আল-হুযালিয়্যাহ

এরা আবুল হুযায়ল মুহাম্মদ ইব্‌ন হুযায়ল -এর অনুসারী। এরা আল্লাফ নামে পরিচিত। বসরায় আবুল হুযায়ল আল্লাফ এর নামে তাদের পরিচিতি গড়ে উঠে।

আল-আসওয়ারিয়্যাহ

আবুল হুযায়লের অনুগত আলী আল-আসওয়ারী এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন।

আশ-শাহহামিয়্যাহ

এ উপদলটি আবুল হুযায়লের শিষ্য আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইসহাক আশ-শাহহামের অনুসারী। এরা বসরায় বেশ শক্তিশালী ছিল।

আল-জুব্বাইয়্যাহ

এরা আবু আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহাব ইব্‌ন সালাম আল-জুব্বাঈর অনুসারী। তিনি খুজিস্তানে তার মতাদর্শ প্রচার করেন।

আল-বাহশামিয়্যাহ

এরা আবু হাশিম আবদুস সালাম আল-জুব্বাঈর অনুসারী। তিনি ছিলেন আল-জুব্বাইয়্যাহ এর প্রধান আবু আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহাব ইব্‌ন সালাম আল-জুব্বাঈর পুত্র। তিনি পিতার মতের বিরোধিতা করেন এবং নিজেই উপদল তৈরি করেন। এ দলটি কাজ না করার কারণে তিরস্কৃত হওয়ার আকীদা পোষণ করেন। এজন্য তাদেরকে 'আয-যাম্মিয়্যাহ'ও বলা হয়।

আল-খাবিতিয়্যাহ

এ উপদলের প্রধান ছিলেন আহমদ ইব্‌ন খাবিত। তিনি নাযযাম মুতাযিলীর শিষ্য ছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। এরা পুনজর্ন্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ তারা মনে করতেন যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তার প্রাণ পূর্ব আমল অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতিতে আবার এ পৃথিবীতে আগমন করবে। তারা ঈসাকে (আ.) রব মনে করত। তারা এও বিশ্বাস করত যে, কিয়ামতের দিন ঈসা (আ.) সকলের হিসাব নিবেন।

আল-খাইয়্যাতিয়্যাহ

এরা হলো আবুল হুসাইন আমর আল-খাইয়্যাত এর অনুসারী। এরা মাদুমিয়্যা নামেও পরিচিত। আল-খাইয়্যাত খবরে ওয়াহিদকে শরীয়তের দলীল মনে করতেন না। সে সাথে বাস্তব জগতের অনেক কিছুর কার্যক্ষমতা ও গুণাবলী স্বীকার করতেন না।

আল-কাবিয়্যাহ

আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহমুদ আল বালাখী আল-কাবী এদের নেতা ছিলেন। আল কাবী আল খাইয়্যাতের শিষ্য ছিলেন। তবে তিনি স্বীয় উস্তাযের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। যেমন: খবরে ওয়াহিদকে যারা শরীয়তের দলীল হিসেবে মানেন না তাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করেন।

আল-বিশরিয়্যাহ

এরা বিশর ইব্ন মুতামিরের অনুসারী। বিশর মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অন্যতম সেরা আলেম ছিলেন। তার অনুসারীরা কাদারিয়্যা মতাদর্শ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেন। এ দলটি মনে করতো, কেউ কবীরা গুনাহের পর তাওবা করে পুনরায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে পূর্বে তওবাকৃত কবীরা গুনাহের শাস্তি পাবে। তারা এও মনে করতো যে, কোনো কাফের যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় মদ পান করে এবং তা থেকে তাওবা করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে কুফরীর শাস্তি পাবে।

আল-জাহিযিয়্যাহ

এ দলটি আবু ওসমান আমর ইব্ন বাহর আল-জাহিযের অনুসারী। আল-জাহিয ছিলেন আব্বাসী যুগের আরবী সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত। তিনি ছিলেন মুতাযিলা আলিম ও লেখক। তিনি দর্শন শাস্ত্রের প্রচুর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। তার ভাষা শৈলী নিয়ে তার অনুসারীরা গর্ববোধ করতো। তিনি খলীফা মুতাসিম বিল্লা্হ ও মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহর শাসনামল পেয়েছিলেন।

আল-হিমারিয়্যাহ

এরা মুতাযিলাদেরই একটি শাখা। তারা কাদারিয়্যাদের থেকে কিছু আকীদা গ্রহণ করেছে। যেমন: তারা পুনর্জন্মবাদ ইব্ন খাবিত থেকে গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া তারা মনে করে মানুষ কখনো কখনো বিভিন্ন রকম প্রাণী সৃষ্টি করে থাকে। যেমন : মানুষ মাংসকে যখন মাটির নিচে পুঁতে রাখে অথবা সূর্যের তাপে রেখে দেয় অতঃপর তা থেকে বিভিন্ন কীট জন্ম নেয়। তাদের বিশ্বাস, এ সকল কীটের স্রষ্টা মানুষ।

আসহাবু সালেহ কুব্বা

এরা কাদারিয়্যাদের সর্বশেষ উপদল। এদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

কাদারিয়্যাদের মতাদর্শ

কাদারিয়্যাদের বাইশটি উপদলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু মতাদর্শ রয়েছে যা তাদের প্রত্যেকটি উপদলকে পৃথক করে দিয়েছে। তবে এমন কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে যে বিষয়ে তাদের সকলের ঐকমত্য রয়েছে। নিম্নে এমন কিছু মতাদর্শ পেশ করা হলোঃ

১। কাদারিয়্যারা আল্লাহ তা'আলার অনাদি গুণাবলী তথা ইলম, কুদরত, হায়াত, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদিকে অস্বীকার করে থাকে। তাদের বিশ্বাস হলো, অনাদি গুণ তথা সিফাতে আযালী বলতে কিছু নেই। অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম বা গুণাবলী ছিল না।

২। তারা বিশ্বাস করে, মানুষের চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা অসম্ভব। তারা মনে করে আল্লাহ তা'আলাকে কেউই দেখেন না এমনকি আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে দেখেন না। শেষোক্ত বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যেই বিভক্তি রয়েছে। তাদের কেউ কেউ মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখেন। অন্য দিকে আরেকদল মনে করে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দেখেন না।

৩। কাদারিয়্যারা সকলে এ বিষয়ে একমত যে, পবিত্র কুরআন অনিত্য বা সৃষ্ট। মহান আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশ, নিষেধ, সংবাদ সবই আল্লাহর সৃষ্টি বা মাখলুক।

৪। এদের আরকেটি বিশ্বাস হলো, মানুষ নিজেই তার নিজের কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা নন। সে নিজেই নিজের কাজকর্ম করতে সক্ষম এমনকি প্রাণীজগতের কারও কোনো কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা নন।

৫। তাদের বিশ্বাস, উম্মাহর মধ্য থেকে যারা ফাসিক তাদের অবস্থান হল দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্থানে। অর্থাৎ ফাসিক পাপাচারী ব্যক্তি কাফিরও নয় আবার মুমিনও নয়। তাদের মতে, কবীরা গুনাহ করলে ঈমানের গন্ডি থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বেরিয়ে যায়।

৬। তাদের আরেকটি মতাদর্শ হলো, বান্দার যে সব কর্মচিন্তা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো আদেশ নিষেধ করেননি সেসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার কোনো ইচ্ছা বা ইরাদার সম্পৃক্ততা নেই।

৭। তারা মিরাজকে অস্বীকার করে, সে সাথে রুহের জগতে আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার কৃত ওয়াদাকেও অস্বীকার করে।

৮। তারা জানাযার নামাযের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করে থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাবারিয়্যা : পরিচিতি ও মতাদর্শ

জাবারিয়্যা শব্দটি আরবী। এটি الجبر শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, জবরদস্তি, বাধ্য করা, ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি।[১৮৩]

জাবারিয়্যা কাদারিয়্যাদের সম্পূর্ণ বিপরীত আকীদা পোষণ করে। কাদারিয়্যারা ভাগ্যকে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে মানুষই তার ভাগ্যের নিয়ন্তা। অন্যদিকে জাবারিয়্যারা ভাগ্যের উপর শতভাগ নির্ভর করে থাকে।

জাবারিয়্যাদের উপদল সমূহ

জাবারিয়্যারা মৌলিকভাবে দু'টি দলে বিভক্ত। যথা: ১) খালেস জাবারিয়্যা ২) জাবারিয়্যা মুতাওয়াসসিতা।

খালেস জাবারিয়্যাদেরকে কট্টরপন্থী জাবারিয়্যাহ বলা হয়। তাদের মৌলিক বিশ্বাস হলো, মানুষ ও জড় বস্তুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে জাবারিয়্যাহ মুতাওয়াসসিতাহ তথা মধ্যপন্থী জাবারিয়্যারা স্বীকার করে যে, বান্দার মধ্যে কাজকর্ম করার শক্তি সামর্থ আছে, কিন্তু তারা এটা স্বীকার করে না যে, এ শক্তি কর্মের উপর কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

জাবারিয়্যাদের মৌলিক আকীদা সমূহ

জাবরিয়্যারা নিম্নোক্ত মৌলিক আকীদায় বিশ্বাসী:

১। মানুষ পাথর ও জড়পদার্থের মতো নিষ্ক্রিয়, তারা বাধ্যবাধকতার আওতাধীন। তাদের নিজ কর্মে কোনো ইচ্ছা বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। ফলে তাদের পুণ্য বা পাপ কোনো কিছুই নেই।

২। সম্পদ আল্লাহর নিকট প্রিয় বস্তু।

৩। আল্লাহর প্রদত্ত তাওফীক বান্দার কর্ম সংঘটিত হওয়ার পর হয়ে থাকে।

৪। তারা শারীরিক মিরাজকে অস্বীকার করে।

৫। রূহের জগতে আল্লাহ কর্তৃক অঙ্গীকার গ্রহণকে তারা অস্বীকার করে।

৬। তারা জানাযার নামায ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে।

---

১৮৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জাহমিয়্যা: পরিচিতি ও মতাদর্শ

জাহমিয়্যা নামটি এ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইব্‌ন সাফওয়ানের দিকে লক্ষ্য করে রাখা হয়।[১৮৪] এ সম্প্রদায়কে মুআত্তিলাহও বলা হয়। মুআত্তিলাহ শব্দটি আরবী تعطيل থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ বেকার বা নিষ্ক্রিয় করা। [১৮৫] এ সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আল্লাহকে নিষ্ক্রিয় করার প্রয়াস পায় বলে তাদের এ নামে অভিহিত করা হয়। উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে পারস্যের খোরাসানের অন্তর্গত সমরকন্দ মতান্তরে তিরমীয - এর অধিবাসী জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান কর্তৃক এ দলটি প্রতিষ্ঠা পায়। জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান প্রসিদ্ধ যিনদীক জাদ ইব্‌ন দিরহামের শিষ্য ছিলেন। উল্লেখ্য, এই জাদ ইব্‌ন দিরহামই প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআন মাখলুক দর্শনের প্রবর্তণ করেন। জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান তার গুরু জাদ ইব্‌ন দিরহাম থেকেই জাহমিয়্যা দর্শন গ্রহণ করে। অন্য এক বর্ণনা মতে, জাদ ইব্‌ন দিরহাম আবান ইব্‌ন সিমআন থেকে আর তিনি তালুত ইব্‌ন আসাম নামক ইয়াহুদী থেকে এ মতাদর্শ গ্রহণ করেণ। জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান গ্রীক দর্শন ও পারসিক ধর্ম থেকে বিভিন্ন বিষয় জাবারিয়্যা মতাদর্শে গ্রহণ করে। সে প্রচার করে মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই। মানুষ চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের মতোই সৃষ্টি মাত্র। এ গুলো যেমন নিজেদের ইচ্ছাধীন চলে না তেমনি মানুষও নিজের ইচ্ছাধীন নয়।[১৮৬] কেউ কেউ জাহমিয়্যা সম্প্রদায়কে জাবারিয়্যা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব (রহ.) এ সম্প্রদায়কে মৌলিক ফিরকা হিসেবে গণ্য করেছেন।

জাহমিয়্যাদের মৌলিক মতাদর্শ

১। জাহমিয়্যারা আল্লাহ তা'আলাকে এমন কোনো গুণান্বিত করা জায়িয মনে করে না, যে গুণ কোনো মাখলুকের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। তারা যুক্তি উপস্থাপন করে যে, আল্লাহ তা'আলা

---

১৮৪ . *প্রাগুক্ত*

১৮৫ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

১৮৬ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬

কোনো মাখলুকের মতো নন, তাই মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য বিধান করা আর মাখলুকের গুণাবলি তার জন্য সাব্যস্ত করা একই কথা। এজন্য তারা আল্লাহ জীবিত, عالم বা জ্ঞানী, مريد বা ইচ্ছাপোষণকারী ইত্যাদি গুণাবলি অস্বীকার করে। তবে তারা قادر বা শক্তিশালী, خالق বা স্রষ্টা, বা موجد অস্তিত্বদানকারী, محيي বা জীবনদানকারী, مميت বা মৃত্যুদানকারী ইত্যাদি গুণাবলি তারা স্বীকার করে থাকে। কেননা, এসব গুণাবলি মাখলুকের উপর প্রযোজ্য হয় না।

২। জাহমিয়্যারা আল্লাহর কালামকে মুতাযিলাদের মতো সৃষ্ট মনে করে।

৩। তারা মনে করে মানুষ মাজবুর। তারা একেবারেই পরাধীন এবং শক্তি ও সামর্থহীন। শক্তিপ্রয়োগ ও ইচ্ছায় কোনো স্বাধীনতা তাদের নেই। মানুষ এবং অন্যান্য মাখলুকের প্রতি যেসব ক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করা হয় তা রূপক অর্থেই তা করা হয়ে থাকে। যেমন : মানুষ অমুক অমুক কাজ করে, গাছ ফল দেয়, পানি প্রবাহিত হয়, সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয় ইত্যাদি।

৪। তারা বিশ্বাস করে, জান্নাত জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। জান্নাতে জান্নাতীদের নিয়ামত উপভোগ করার পর এবং জাহান্নামে জাহান্নামীদের শাস্তি ভোগ করার পর উভয়টি ধ্বংস হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী হওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা তারা তাগিদ ও মুবালাগা অর্থে গ্রহণ করেছে।

৫। তারা মনে করে, ঈমান হলো অন্তরের বিষয় মুখে প্রকাশের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং কারো অন্তরে যদি ঈমান থাকে আর মুখে অস্বীকার করে, তাহলে সে মুমিনই থাকবে, কাফের হবে না।

৬। তারা এও মনে করে যে, ঈমানের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও আমলে পরিণতি করা এ তিনভাগে ঈমান বিভক্ত নয়। তাই ঈমানের মধ্যে মানগত কোনো পার্থক্য নেই। নবীদের এবং উম্মতের ঈমানের মধ্যে কোনো তারমতম্য নেই। যেহেতু ঈমান বলা হয় পরিচয়কে আর পরিচয়ের মধ্যে কোনো মানগত পার্থক্য থাকে না তাই ঈমানের মধ্যে কোনো মানগত পার্থক্য নেই।

৭। তারা আল্লাহর দিদার, মালাকুল মাউত, আলমে বারযাখ, মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব ও হাউযে কাউসার ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাররামিয়্যা: পরিচিতি ও মতাদর্শ

এ দলটির প্রতিষ্ঠাতা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাররাম আস-সিজিস্তানী। তার নামের সাথে সম্পৃক্ত করেই এ দলটির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। তিনি ১৯০ হিজরী/৮০৬ খ্রি. সিজিস্তানের অন্তর্গত যাবানজের নিকটবর্তী একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮৭] এ দলটিকে মুশাব্বিহাও বলা হয়। কেননা, তারা আল্লাহ তা'আলার বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে এমনকি তারা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে।[১৮৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন কাররাম সর্বপ্রথম عذاب القبر নামে একটি বই লিখেন। এতে তিনি মুনকার ও নাকীর এবং কিরামান ও কাতিবীন কে অভিন্ন হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ তার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে সিজিস্তানের গভর্নর তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি গুরজিস্তান ও খুরাসানে তার মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তিনি তার মতাদর্শ প্রচার কালে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও শীআ সম্প্রদায়কে আক্রমণ করতেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছেই তার মতবাদ প্রচার করতেন। এক পর্যায়ে তাঁতী ও নিম্নশ্রেণির কিছু মানুষ নিয়ে তিনি নিশাপুরে উপস্থিত হন। সাম্প্রদায়িক দাঙার আশংকায় গভর্নর তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। দীর্ঘ আট বছর কারাভোগের পর ২৫১হি. /৮৬৫ খ্রি. কারাগার থেকে মুক্তি পান। অতঃপর নিশাপুর ত্যাগ করে জেরুজালেম গমন করেন এবং জীবনের বাকী সময় এখানেই অতিবাহিত করেন। ২৫৫ হি./৮৬৯ খ্রি. জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারিতে ইন্তেকাল করেন।[১৮৯]

কাররামিয়্যাহদের উপদল সমূহ

শাহরাস্তানী কাররামিয়্যাদের ১২টি উপদলের কথা বলেছেন। তবে তিনি মাত্র ছয়টি উপদলের উল্লেখ করেছেন। যেমন:

---

১৮৭ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮

১৮৮ . *প্রাগুক্ত*. পৃ. ৬২৯

১৮৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯

(১)আল-আবিদিয়্যা (العابدية)

(২)আন-নুনিয়্যাহ (النونية)

(৩) আয-যারীনিয়্যাহ (الزرنية)

(৪) আল - ইসহাকিয়্যাহ (الاسحاقية)

(৫) আল-ওয়াহিদিয়্যাহ (الواحدية)

(৬) আল-হাইসামিয়্যাহ (الهيسمية)

তবে আব্দুল কাহির বাগদাদী কারামিয়্যাদের তিনটি উপদলের কথা উল্লেখ করেছেন। দল তিনটি হচ্ছে:

(১)হাকাইকিয়্যাহ (حقايقية)

(২) তারাইকিয়্যাহ (طرائقية)

(৩) ইসহাকিয়্যাহ (اسحاقية)

কাররামিয়্যাহদের কতিপয় মতাদর্শ

১। কাররামিয়্যাগণ আল্লাহর প্রতি মানবত্ব আরোপ করতো। সেই সাথে তারা আল্লাহকে মানুষের সাথে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করতো। ইব্‌ন কাররাম বিশ্বাস করতো, আল্লাহ এমন এক শরীরী সত্তা, যার সীমা ও প্রান্ত রয়েছে দুই দিক থেকে নিচ দিক থেকে এবং সে দিক থেকে শরীরের যে অংশ আরশের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এছাড়া তিনি খ্রিস্টানদের মতো তারা আল্লাহকে جوهر বা মূল সত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২। তারা আল্লাহ তা'আলার ভারত্ব আছে বলে বিশ্বাস করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ "যখন আকাশ ফেটে যাবে"। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা বলত আকাশ ফেটে যাবে আল্লাহ তা'আলার ভারে।

৩। ইব্‌ন কাররাম الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى " দয়াময় আরশে সমাসীন।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতো, আরশের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার শারীরিক ছোয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান, আরশ হলো আল্লাহর অবস্থানের স্থান।

৪। তারা বিশ্বাস করতো, আল্লাহ তা'আলার সত্তা অনিত্য গুণাবলির আধার। ইচ্ছা, দর্শন, বাকশক্তি ইত্যাদি অনিত্য বিষয়। আর আল্লাহ তা'আলা এসব অনিত্য বিষয়ের আধার।

৫। তারা বিশ্বাস করতো, আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি এমন প্রাণবিশিষ্ট কোনো শরীরী সত্তা হওয়া উচিৎ যা উপদেশ গ্রহণে সক্ষম। কোনো জড় বস্তুকে প্রথমে সৃষ্টি করা হিকমত পরিপন্থি।

৬। তারা বিশ্বাস করতো, যে সকল শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, তাদের মৃত্যু ঘটানো আল্লাহর হিকমত অনুসারে সম্ভব নয়। তাদের মতে, যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু মৃত্যুবরণ করেছে তারা জীবিত থাকলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনতো না।

৭। তারা বিশ্বাস করতো, মুনকার-নাকীর ও কিরামান কাতিবীন অভিন্ন ফেরেশতাদ্বয়।

৮। তারা এও বিশ্বাস করতো যে, যেসব গুনাহের কারণে عدالت রহিত হয়ে যায় অথবা শরয়ী হদ্দ সাব্যস্ত হয় এমন পাপ থেকে নবীগণ নিষ্পাপ। এর থেকে নিচু পর্যায়ের পাপ থেকে তাঁরা নিষ্পাপ ছিলেন না।

৯। তাদের আরেকটি মতাদর্শ হলো, ঈমান শুধু মুখে স্বীকৃতির নাম। অন্তরের বিশ্বাস ও আমাল না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস হলো, একবার কেউ মুখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করলে তার ঈমান চিরস্থায়ী হয়ে যায়। মনে-প্রাণে রিসালাতে অবিশ্বাস করলেও তার ঈমান অটুট থাকবে। একমাত্র মুরতাদ হলেই ঈমান বিনষ্ট হয়।

১০। খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে তাদের মতাদর্শ হল, একমাত্র উম্মাহর সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতেই আমীর নির্বাচিত হতে হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুতাযিলা সম্প্রদায় : পরিচিতি ও মতাদর্শ

‘মুতাযিলা’ নামটি এ মতবাদের অনুসারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত নয়। তারা নিজেদেরকে اصحاب العدل والتوحيد বা ‘ন্যায় বিচার ও একত্ববাদের অনুসারী’ বলে পরিচয় দিত। কেননা, তারা নিজেদেরকে আদল ও তাওহীদপন্থি মনে করতো।[১৯০] মুতাযিলা শব্দটি আরবী। এটি اعتزل ফেল থেকে উৎকলিত হয়েছে। এর মাসদার হচ্ছে اعتزال । এর অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, নিঃসঙ্গ হওয়া, একাকী হওয়া ইত্যাদি। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে আকীদা বিষয়ক দার্শনিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে এ দলটির আবির্ভাব ঘটে।[১৯১]

এ সম্প্রদায়ের নাম মুতাযিলা হওয়ার ব্যপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে, খারেজী সম্প্রদায় পাপী মুসলিমকে কাফির গণ্য করতো এবং আখিরাতে অনন্ত জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করতো। অপর দিকে মুরজিয়্যা সম্প্রদায় পাপী মুসলিমকে পরিপূর্ণ মুমিন ও অনন্ত জান্নাতী বলে বিশ্বাস করতো। এ দু’দলের বাইরে সাহাবায়ি কিরাম ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার তাবেয়ীগণ বিশ্বাস করতেন পাপী মুসলিম পাপী মুমিন হিসেবে পরিগণিত এবং আখিরাতে শাস্তি ভোগের পর এরূপ ব্যক্তি নাজাত লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ইমাম হাসান আল-বসরীর মজলিসে এ জাতীয় একটি প্রশ্ন আসলে তিনি তার সঠিক উত্তর দান করেন। কিন্তু তাঁর এ উত্তরে তাঁর শিষ্য ওয়াসিল ইব্‌ন আতা দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, পাপী মুসলিম কাফেরও নয় মুমিনও নয়, সে দুটির মাঝখানে অবস্থান করবে। ইমাম হাসান আল-বসরী (রহ.) তার এমত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁকে তার মজলিসে আসতে নিষেধ করেন। ওয়াসিল ইব্‌ন আতা তদীয় উস্তাযের মজলিস ত্যাগ করে বসরার মসাজিদের এক কোনে বিচ্ছিন্ন একটি মজলিস বসালেন। তা দেখে হাসান আল-

---

১৯০ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

১৯১ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৬

বসরী (রহ.) বললেন, اعتزل عنا واصل 'ওয়াসিল আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' তাঁর একথার ভিত্তিতে ওয়াসিল ইব্ন আতার অনুসারীদের মুতাযিলা নামকরণ করা হয়।[১৯২] মুতাযিলা মতবাদ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১৯৩] এ সময় উমাইয়া শাসকদের আনুকূল্য লাভে তারা সামর্থ হয়।[১৯৪] উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদের পুত্র ইয়াযিদ ইব্ন ওয়ালিদ মুতাযিলা সমর্থক ছিলেন। একপর্যায়ে ইয়াযিদ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ওয়ালিদকে পরাজিত ও হত্যা করে সিংহাসন আরোহন করে। ইয়াযিদের খিলাফত লাভ মুতাযিলাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাজকীয় সমর্থনের কারণে এ মতবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।[১৯৫]

উমাইয়া খিলাফতের আবসান ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফা আল মানসুরের সাথে মুতাযিলাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ সম্প্রদায়টি সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে তাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে দেয়। খলীফা হারুনুর রশীদ মুতাযিলাদের সমর্থন না করলেও বারমাকী সম্প্রদায় তাদের যার পর নাই পৃষ্ঠপেষকতা করে। অতঃপর খলীফা মামুনুর রশীদের শাসনামলে এ সম্প্রদায় উন্নতির চরম পর্যায়ে উপনীত হয়।[১৯৬] খলীফা মামুন খালকে কুরআন মাসআলা নিয়ে চরম বাড়াবাড়ি করে। সে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) সহ বহু আলিমকে কারাঘারে নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলকে (রহ.) প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করা হয়। কেননা, তারা খালকে কুরআনসহ বেশ কিছু বিতর্কিত মাসআলার ব্যাপারে এ মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এ মতবাদ গ্রহণ করতে মামুন জনগণকে বাধ্য করে। এমনকি সে প্রশাসকদের এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করে যে, তারা

১৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৭

১৯৩ . *প্রাগুক্ত*

১৯৪ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬

১৯৫ , প্রগুক্ত, ২১৬-২১৭

১৯৬ , প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

যেন আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বিচারকদের ডেকে খলীফার নির্দেশ জানিয়ে দেন যে, যে ব্যক্তি খালকে কুরআন আকীদা গ্রহণ করবে না, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৯৭]

খলীফা মামুনের পর খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ ও ওয়াসিক বিল্লাহ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ওয়াসিকের যুগে ইমাম শাফেয়ীর শিষ্য ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াহিয়া বুওয়ায়াতীও নিপীড়নের শিকার হন। এ সময় আহমাদ ইব্‌ন নাসের খুযায়ীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।[১৯৮]

এ মতের অনুসারীরা গ্রীক, পারসিক, মিসরীয় ও ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। সে সাথে তারা ধর্মীয় বিষয়াদির দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিমনা আব্বাসী শাসকগণ তাদের যুক্তিবাদী চিন্তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতঃ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। খলীফা মামুন ও মুতাসিম এ মতকে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মূলধারার আলিমদের উপর এমত গ্রহণে চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু মূলধারায় আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে ক্রমান্বয়ে এর অনুসারীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১৯৯]

মুতাযিলা সম্প্রদায় ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধের মূল পয়েন্ট হচ্ছে প্রজ্ঞা ও ওহীর পারস্পরিক অবস্থান। মুতাযিলারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওহীর উপর প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এসম্পর্কে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"আহলুস সুন্নাতের সাথে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিগত পার্থক্য ছিল বিশ্বাসের বিষয়ে মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেক (Sense, reason, rationality, intellect , intelligence) ও ওহী (Scripture)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান। মুতাযিলা আকীদার মূল বিষয় ছিল মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেকে ওহীর বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা। তাদের মতে আকল ওহীর চেয়ে অগ্রগণ্য। আকল বা মানবীয় বুদ্ধির বিচারে ওহীর মধ্যে

---

১৯৭ , মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯

১৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭

১৯৯ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৮

অসঙ্গতি দেখা গেলে বুদ্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে ওহীর ব্যাখ্যা ও বিচার করতে হবে। কুরআনের বক্তব্যকে তারা রূপক অস্পষ্ট ইত্যাদি যুক্তিতে বাতিল করত এবং হাদীসের বক্তব্যকে তারা খাবারে ওয়াহিদ বা মুতাওয়িয়াতির নয় বলে মনে করত, সে অজুহাতে অর্থগত বর্ণনার সম্ভাবনা আছে এ যুক্তিতে তা বাতিল করত।"[২০০]

এ সম্পর্কে ড. আমিনুল ইসলাম বলেন:

"মুতাযিলাদের মতে, জ্ঞানের প্রধান উৎস বুদ্ধি, তারা ইসলামের আদি একেশ্বরবাদী আদর্শকে সর্বপ্রকার নবত্বারোপ (anthropomorphism) এর অভিযোগ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস পায়। তারা গ্রীক দর্শনের নব-প্লেটোবাদী ব্যাখ্যার প্রভাবে ছিল বলে মনে হয়। উক্ত মত নির্বিচারে গ্রহণ করার ফলে তারা এও বিশ্বাস করে ফেলে যে, এ মত প্রত্যাদেশের পরিপূরক হিসেবে গৃহীত হতে পারে। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা কোরআনের সঙ্গে এরিস্টটলের দর্শনের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম বিশ্বাসকে যুক্তিগ্রাহ্য করা।"[২০১]

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মূলনীতি সমূহ

মুতাযিলা সম্প্রদায় পাঁচটি মূলনীতির ভিত্তিতে তাদের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। মূলনীতিগুলি হচ্ছে:

(১)العدل বা ন্যায়বিচার

(২) التوحيد বা একত্ব

(৩)انفاذ الوعيد বা শাস্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়ন

(৪)المنزلة بين المنزلتين বা দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থান এবং

(৫) الامر بالمعروف و النهي عن المنكر বা সৎ কর্মে আদেশ অসৎকর্ম থেকে নিষেধ।[২০২]

উল্লেখ্য, মুতাযিলাগণ কাদারিয়্যা ও জাহামিয়্যাদের মূলনীতি সমূহ সবই গ্রহণ করে নেয়।[২০৩]

---

২০০. *প্রাগুক্ত*

২০১. ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

২০২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৮

২০৩. *প্রাগুক্ত*

আল আদল (العدل)

মুতাযিলারা নিজেদেরকে 'আসহাবুল আদলে ওয়াত তাওহীদ' বা ন্যায়পরায়ণ ও তাওহীদপন্থি বলে পরিচয় দিত। আল্লাহ ন্যায়বিচারক একথা সকল মুমিনও স্বীকার করেন। এক্ষেত্রে মুতাযিলাগণ দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। এ বিষয়ে তাদের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারক তাই পাপীকে শাস্তিদান এবং পুণ্যবানকে পুরস্কার প্রদান তার উপর ওয়াজিব। এর ব্যত্যয় ঘটলে ন্যায়বিচার ভুলুণ্ঠিত হবে। আর যেহেতু আল্লাহ ন্যায়বিচারক তাই তিনি অন্যায়ের আদেশ দেন না এমনকি ইচ্ছাও করেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি কেবল সে নির্দেশেই দেন যা তার জন্য কল্যাণকর। তারা এও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য জায়েয নয় কোনো অন্যায়ের আদেশ দানের পর এ অন্যায়ের জন্য অপর বান্দাকে
শাস্তি প্রদান করা।[২০৪] মুতাযিলারা নিজেদেরকেও ন্যায় পরায়ণতায় মানুষ বলে দাবী করে থাকে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, মানুষ নিজেই তার কর্মের কর্তা।[২০৫]
স্বাধীনতাবিহীন দায়িত্বের ধারণাকে তারা অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ পরম দয়ালু। তাই তিনি বান্দাকে এমন কাজের জন্য শাস্তি দিতে পারেন না। যার উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বান্দার এমন স্বাধীনতা থাকতে পারে। মুতাযিলারা এভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি হিসেবে বিশ্বাস করে অন্যদিকে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রদান করে।[২০৬]

আত-তাওহীদ (التوحيد) বা একত্ববাদ

মুতাযিলাগণ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করে। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর পরম একত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহ তা'আলার সত্তার বাইরে কোনো সিফাত বা গুণ নেই। তাদের যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। কিন্তু আল্লাহর

---

২০৪ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯

২০৫ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

২০৬ . *প্রাগুক্ত*

গুণ স্বীকার করলে আল্লাহর গুণকেও চিরন্তন ও সত্য সাব্যস্ত করতে হয়। তখন চিরন্তন সত্তার বহুত্ব অবধারিত হয়ে ওঠে। যা আল্লাহর একত্বের পরিপন্থি। আর আল্লাহর বহু গুণাবলী স্বীকার করলে আল্লাহর সত্তায় বহুত্ব আছে বলেই স্বীকার করা হয় যা কখনও সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহর সত্তায় বহুত্ব পাওয়া যেতে পারে না। আল্লাহর সত্তা গুণাবলী থেকে পবিত্র।[২০৭]

শাস্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়ন বা انفاذ الوعيد।

মুতাযিলাদের আরেকটি মূলনীতি হলো, আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। পুণ্যবান লোক পুরস্কৃত হবে আর পাপী লোক শাস্তি পাবে। এক্ষেত্রে তারা এতটাই উগ্র আকীদা পোষণ করে যে, ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দকাজের শাস্তি আল্লাহর জন্য অপরিহার্য। তারা একে আল্লাহর উপর বাধ্যবাধকতারূপে চাপিয়ে দেয়। তারা মনে করে এটি একটি বিধিবদ্ধ বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা এড়াতে পারেন না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেও কাউকে ক্ষমা করতে পারেন না।

আল মানযিলাহ বাইনাল মানযিলাতাইন (المنزلة بين المنزلتين)

পাপী মুমিনের ব্যাপারে মুতাযিলাদের মতাদর্শ হচ্ছে, পাপী মুমিন দুইস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। অর্থাৎ সে মুমিনও নয় আবার কাফিরও নয়। পাপী মুমিন অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আবার এ ঈমানের বহিপ্রকাশ ঘটায় না অর্থাৎ গুনাহেও লিপ্ত হয়। যেহেতু সে ঈমান এনেছে তাই তাকে কাফের বলা যায় না। আবার যেহেতু সে পাপাচারে লিপ্ত হয় তাই তাকে মুমিনও বলা যায় না। তাই এ দু'টির মাঝে তারা আরেকটি স্তর আবিষ্কার করে। আর সেটি হচ্ছে দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তর।

আল-আমর বিল মারুফ ওয়ান্নাহি আনিল-মুনকার (الامر بالمعروف و النهي عن المنكر)

এ বিষয়ে মুতাযিলাগণ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বাস্তবায়নে সরাসরি শক্তি প্রয়োগকে তারা ওয়াজিব মনে করে। এমনকি তারা এ

---

২০৭ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮

ব্যাপারে প্রকাশ্যে লড়াই করাকে জায়িয মনে করে। তাদের বিশ্বাস , ভুল পথ-প্রদর্শনকারী ও হকের বিরোধীদের সত্য গ্রহণে শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। এ মূলনীতির মাধ্যমে আব্বাসী খলীফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিকের শাসনামলে 'খালকে কুরআন' বিতর্কে আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। এ মূলনীতির মাধ্যমেই তারা বহু আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের উপর নিপীড়ন চালিয়েছে।

মুতাযিলাদের কতিপয় মতাদর্শ

আল্লাহর গুণাবলীর অস্বীকৃতি

মুতাযিলাগণ আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে। এসব আয়াত সম্পর্কে তারা বলে, এগুলো আল্লাহর গুণাবলী নয় বরং এগুলো আল্লাহর যাত বা সত্তাগত বিষয়। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর যাত ও আল্লাহর সিফাত একই বস্তু এবং এটি চিরন্তন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহর একত্ববাদের সাথে তাঁর গুণাবলি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আল্লাহ এক, সুতরাং তাঁর কোনো গুণাবলি থাকতে পারে না। চিরন্তন সত্তার গুণাবলিও চিরন্তন হতে হবে -এটাই স্বাভাবিক। আর তার গুণাবলি চিরন্তন হলে বহু চিরন্তন সত্তার স্বীকার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর এমনটিই যদি হয় তাহলে আল্লাহর তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়।[২০৮]

এ বিষয়ে তাদের আরেকটি যুক্তি হচ্ছে, গুণাবলির ধারণা শুধু দেহ সমূহের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। আর আল্লাহ দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তারা আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করে বলে, আল্লাহর গুণাবলি মেনে নিলে, তাঁর পবিত্র সত্তা অসংখ্য বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত বলে মেনে নেয়া হয় অথচ এ রকম আকীদা পোষণ কোনোভাবেই জায়িয নয়। তারা মনে করে আল্লাহর বহু গুণাবলির অর্থ হলো, তাঁর সত্তায় বহুত্ব বিদ্যমান। অথচ আল্লাহর সত্তা বহুত্ব থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহর সত্তা গুণাবলী থেকে মুক্ত।[২০৯]

২০৮ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০

২০৯ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০১

খালকুল কুরআন

মুতাযিলাগণ আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করে। আর এর ধারাবাহিকতায় পবিত্র কুরআনকে তারা সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহর একত্বের কারণে তারা যেমন তাঁর গুণাবলিকে অস্বীকার করে তেমনি এ একত্বের কারণেই পবিত্র কুরআনকে অনিত্য ও সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করে। তারা মানে করে কুরআনকে সৃষ্ট মনে না করলে পাশাপাশি দু'টি চিরন্তন সত্তা হবে - আল্লাহ ও কুরআন। আল্লাহর একত্ব ইসলামের মৌল বিষয়। আল্লাহ চিরন্তন অন্য কিছু নয়। অন্য কোনো কিছুকে চিরন্তন মনে করা শিরক হিসেবে গণ্য।[২১০] এ মাসআলার মাধ্যমে মুতাযিলাগণ সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করে।

আল্লাহর দর্শন

আল্লাহর দর্শন মানব জীবনের পরম কাম্য। আর এ বিষয়ে সকলেই একমত যে আল্লাহর দিদার অবশম্ভাবী। মুতাযিলারা আল্লাহর দর্শন বিশ্বাস করে। কিন্তু এর স্বরূপ সম্পর্কে তারা অন্যদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর চাক্ষুষ দর্শন কখনো সম্ভব নয়। কেউই তাঁকে চোখে দেখতে সক্ষম হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ দৃষ্টি সীমার উর্ধ্বে। অধিকাংশ মুতাযিলা বিশ্বাস করে আল্লাহকে পরজগতে মনের চোখে দেখা বা অনুভব করা সম্ভব। অর্থাৎ হৃদয়ে উপলব্দির মাধ্যমে আল্লাহকে দেখা যেতে পারে। চর্মচক্ষে আল্লাহকে দেখা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। সেটা ইহজগতে হোক অথবা পরজগতে হোক।[২১১]

মুযিজা ও কারামত

মুতাযিলাগণ মুজিযা ও কারামতকে অস্বীকার করে। তারা এ বিষয় দু'টিকে যুক্তির নিরিখে পর্যালোচনা করে দেখে যে এগুলো কোনো বস্তুতান্ত্রিক বিষয় নয় তাই তারা এসব অস্বীকার করে বসে।[২১২]

২১০ . প্রাগুক্ত, পৃ.৩০১; ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১

২১১ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২

২১২ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২

জগতের উৎপত্তি

মুতাযিলা সম্প্রদায় পরিণতি পর্বের শেষ স্তরে গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত হয়। এসময় তারা সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে কুরআনের সাথে গ্রীক দর্শনের সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়।[২১৩] তারা বলে জগৎ চিরন্তন ও সৃষ্ট। উল্লেখ্য, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী জগৎ এক বিশেষ সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছেঃ كن فيكون তিনি যখন কোনো বিষয়ে ইচ্ছা করেন তখন বলে হও, আর তখন হয়ে যায়।[২১৪]

অন্যদিকে এরিস্টটল বলেন যে, জগৎ চিরন্তন। আর মুতাযিলাগণ উভয়টিই গ্রহণ করে। তারা বলে, অনন্তকাল ধরে জগৎ নিশ্চল নিস্তব্ধ অবস্থায় ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ শক্তি প্রয়োগে তাকে গতিশীল করেছেন। তখন থেকে জগত নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে থাকে। অর্থাৎ জগৎ পূর্বে সম্ভাবনাময় অবস্থায় ছিল অতঃপর তা বাস্তবরূপ লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা কুরআনিক ও এরিস্টটলীয় মতবাদ উভয়কে স্বীকার করে।[২১৫]

বস্তুর প্রকৃতি

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের পরিণতি পর্বের শেষ স্তরে বস্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ পর্যায়ে তারা অস্তিত্বকে বস্তুর অপরিহার্য গুণ বলে স্বীকার করেননি। বস্তু ধারণা বিশেষ কিন্তু এটি আমরা জানতে পারি এবং এর সম্পর্কে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করতে পারি। তারা মনে কওে, বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে অপর নাও থাকতে পারে। অস্তিত্ব বস্তুর একটি গুণ বৈ কিছুই নয়। বস্তুর অস্তিত্ব থাকলে বস্তুটি সত্তা হিসেবে পরিগণিত হবে অন্যথায় নয়।[২১৬]

---

২১৩ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

২১৪. আল-কুরআন, ৩৬ : ৮২

২১৫ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

২১৬ . *প্রাগুক্ত*

তৃতীয় অধ্যায়

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় ও মতাদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

اهل শব্দের অর্থ পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, অনুসারীবৃন্দ, স্ত্রী, অধিবাসী, যোগ্য, উপযুক্ত, বাসিন্দা, অভিবাসী, লোকজন।[২১৭] শব্দটি পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

"তুমি বল, হে কিতাবীগণ! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক না করি।"[২১৮]

السنة শব্দের অর্থ: রীতি, নিয়ম, পথ, পন্থা, স্বভাব।[২১৯]

ইসলামী বিশ্বকোষে এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে: পথ, চালচলন, রীতি ও শরীয়ত।[২২০]

আল কামুসুল মুহীত গ্রন্থকারের মতে السنة শব্দের অর্থ : পথ, পদ্ধতি, পন্থা, নিয়ম ইত্যাদি।[২২১]

লিসানুল আরব গ্রন্থকারের মতে السنة শব্দের অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। [২২২] আক্বীদাতুত্ব ত্বহাবীর টীকায় বলা হয়েছে: রীতি নীতি, আদর্শ, অভ্যাস।[২২৩]

---

২১৭ . ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহ্মন, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.),খ. ১ পৃ. ১৫৩

২১৮ . আল-কুরআন, ০৩ : ৬৪

২১৯ . ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহ্মন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৬

২২০ . *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, ২য় সং., পৃ. ৬২৬

২২১ . মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী, *আল-কামুসুল মুহীত* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৩৭

সুন্নাহ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছেঃ রাসূল (স.) তাঁর কথায় ও কর্মে যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন বা যেসব কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন- সুন্নাহ উপর আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ কর্মসমূহকেই বুঝায়।[২২৪] এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য :

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا -

"পূর্বে যে সকল নবী অতীত হয়ে গেছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ছিল আল্লাহর বিধান, আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।"[২২৫]

শব্দটি হাদীসেও এসেছে। যেমন:

من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيئ-

"যে ব্যাক্তি ইসলামে কোনো সুন্দর আদর্শ চালু করবে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার পরে যত লোক ঐ আদর্শের উপর আমল করবে সকলের আমলের প্রতিদানও সে পাবে। এতে তাদের প্রতিদান থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামের নামে কোনো মন্দ প্রথা চালু করবে তাকে তার গোনাহের বোঝা বহন করতে হবে এবং তার পরে যত লোক ঐ প্রথা অনুসারে আমল করবে তাদের প্রত্যেকের গোনাহের বোঝাও তাকে বহন করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও গোনাহের বোঝা বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।"[২২৬]

اهل ও السنة এ দু'টি শব্দ মিলে সম্বন্ধ পদ (مركب اضافى) হয়েছে। এক সাথে অর্থ হলো- সুন্নাতের অনুসারী বা সুন্নাহপন্থি লোক। আর الجماعة শব্দের অর্থ: জামায়াত, দল।

---

২২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাররম ইব্‌ন মানযুর আল-আফরিকী, লিসানুল আরব (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ১৩, পৃ. ২২৪-২২৫

২২৩. *আকীদাতুত্ব ত্বহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২২৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, ২য় সং., পৃ. ৬২৬

২২৫. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৮

২২৬. সহীহ মুসলিম, খ. ২, হা. ৭০৪

ইসলামী বিশ্বকোষে এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে: জামায়াতের আভিধানিক অর্থ- সম্প্রদায় কিন্তু এখানে জামায়াত বলতে সাহাবীগণের জামায়াতকে বুঝানো হয়েছে।[২২৭] অর্থাৎ اهل السنة والجماعة বলতে ঐ দলকে বলে যে দল মহানবী (স.)-এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ি কিরামের জামায়াতের অনুসারী।

পারিভাষিক অর্থ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া (রহ.) বলেন :

اهل السنة والجماعة القوم الصادقون ثم الذين اتبعوا القران وسنة الرسول وسنة صحابته اجمعين-

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলা হয় এমন সত্যপন্থি দলকে যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল কুরআন, রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ ও সকল সাহাবী (রা.)-এর রীতিনীতি অনুকরণ করে চলে।[২২৮]

ইব্‌ন উইয়ানা (রহ.) বলেন:

اهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حين ومكان-

"আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলা হয় এমন এক দলকে যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (স.)-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করে।"[২২৯]

অধ্যাপক হাসান আইয়ুব বলেন: "ইমাম আবুল হাসান আল-আশয়ারী ও আবুল মানসুর আল-মাতুরিদীর অনুসারীদেরকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলা হয়। এরা আকাইদ শাস্ত্রে সালফে সালেহীনের অনুসারী। তারা কুরআনুল কারীম ও সুন্নাতে রাসূলকেই আকাইদ শাস্ত্রের মূল উৎস বলে বিশ্বাস করে।"[২৩০]

---

২২৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, ২য় সং., পৃ. ৬২৬

২২৮. ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত্‌ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

২২৯. *প্রাগুক্ত*

২৩০. অধ্যাপক হাসান আইয়ুব, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি* , অনু. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, (ঢাকা: ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৩৯৯

ইসলামী বিশ্বকোষে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে: "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলতে সেই সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম এবং যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু নবী (স.) -এর সুন্নাহ এবং সাহাবীগণ (রা.)-এর পবিত্র আচার আচরণ।"[২৩১]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে: "যাহারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পথ (সুন্নাহ) এবং তাঁহার সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণ করেন তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী।"[২৩২] কতিপয় আলিমের মতে, 'সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দলই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলা হয় ।'[২৩৩]

মুসলমানদের প্রধান সম্প্রদায় হলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। তারা মহানবী (স.)-এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ি কিরাম (রা)-এর জামায়াতবদ্ধ হয়ে জীবন পরিচালনা করে থাকে। তারা খোলাফায়ি রাশেদীনের সিদ্ধান্তের বৈধতা, ইজমা ও কিয়ামের নীতিসমূহকে কুরআন ও হাদীসের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করে।[২৩৪] আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে সংক্ষেপে সুন্নী জামায়াত বলা হয়ে থাকে। সুন্নাহ শব্দ থেকে সুন্নী শব্দ উদ্ভূত হয়েছে। এ জামায়াত ধর্মীয় সম্প্রদায়, রাজনৈতিক নয়। তবে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশিত রাজনৈতিক মতবাদ তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে পৃথক মতবাদ পোষণ করে যা কুরআন ও হাদীস থেকে উৎসারিত।[২৩৫]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বলেন:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-

---

২৩১ . *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, ২য় সং., পৃ. ৬২৬

২৩২ . *প্রাগুক্ত*

২৩৩ . ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আত্ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

২৩৪ . ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, সংস্করণ ১৭, পৃ. ১৮৭

২৩৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭-১৮৮

"নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চলো অন্যান্য পথে চলোনা। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।"[২৩৬]

উপর্যুক্ত আয়াতদৃষ্টে বোঝা যায়, সঠিক পথ একটিই আর তা হচ্ছে সীরাতে মুস্তাকীম। এ আয়াতের তাফসীরে মুফতী শফী (রহ.) বলেন, এখানে هذا দ্বারা দ্বীনে ইসলাম অথবা পবিত্র কুরআন। আবার এর দ্বারা আনআমও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা এ সুরায় ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি-তৌহিদ, রিসালাত ও মূল বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে। مستقيم হচ্ছে صراط এর বিশেষণ। এর থেকে বোঝা যায়, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। আর ইসলামই যেহেতু আল্লাহর মনোনীত একমাত্র সরল পথ অতএব এ পথের অনুসরণই কাম্য। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ একটিই-সীরাতে মুস্তাকীম। তবে জগতে মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ তৈরি করে রেখেছে। সেগুলোতে চললে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে না বরং তাঁর থেকে দূরেই সরে যাবে।" [২৩৭]

সুরাহ ফাতিহায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের এ পথের প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে প্রার্থনা শিক্ষা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ "আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন।"[২৩৮] মোট কথা, কুরআন ও সুন্নাহর পথ তথা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশিত পথ ও মহানবী (স.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথই হচ্ছে সীরাতে মুস্তাকীম।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সাহাবীদের যামানার অনেক পরে প্রচলিত হলেও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকেই এর উৎপত্তি। অতঃপর তাঁর তিরোধানের পর বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা দেখা দেয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ নানাবিদ ধর্মীয় কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। উম্মাহর নেতৃবৃন্দ যাবতীয় কুসংস্কার থেকে উম্মাহকে রক্ষা করতে ও এ দলভুক্ত করতে

---

২৩৬. আল-কুরআন, ০৬ : ১৫৩

২৩৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, পবিত্র কুরআনুল কারীম, অনু. ও সম্পা. মুহিউদ্দিন খান (মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহ্দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি.), পৃ. ৪২৪-৪২৫

২৩৮. আল-কুরআন, ০১ : ৪

পরিশ্রম করেছেন। সে সাথে যাবতীয় কুফুরী ও শিরকের মুলোৎপাটনে প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যারা মহানবী (স.)-এর সুন্নাহ ও তাঁর সাহাবীদের পদাংক অনুসরণ করেন তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

আব্দুল কাহির বাগদাদী এ দলটিকে ফিরকায়ে নাজিয়ার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তার মতে আহলুর রায়, আহলুল হাদীস এবং এ দুই জামায়াতের ফকীহ, রাবী, মুহাদ্দিস এবং মুতাকাল্লিমগণ এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর সিফাত, নবুওয়াত, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে অকিদাগত ও অন্যান্য ধর্মীয় নীতিতে একমত। ইমাম আবু হানীফা(রহ.) ইমাম সুফিয়ল সাওরী (রহ.), ইমাম আজযাঈ প্রমূখ প্রসিদ্ধ ইমামগণ এ সমপ্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।[২৩৯] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (রহ.)-এর মতে উপর্যুক্ত ইমামদের পূর্বেও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। আর এ জামায়াত বলতে আসহাবুর রাসূল (স.)-এর জামায়াতকে বুঝায়।[২৪০]

এর আগে মূলধারার ইসলামপন্থিদের জামহুরুল উম্মাহ, আহলুস সুন্নাত ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো। অতঃপর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতই প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এ হিসেবে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীকে এর প্রসিদ্ধি অর্জন কাল বলা যেতে পারে।[২৪১] এ নামটি কখন থেকে প্রচলিত হয়েছে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো কিছু বলা যায় না। তবে আব্বাসী খলীফ আল মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে আবুল হাসান আশআরীর ধর্ম-দর্শন আন্দোলন জোরদার হয়। এ আন্দোলনের পর পরই এ নামটি প্রসিদ্ধি অর্জন করে। আবুল হাসান আল-আশ'আরীর আশ'আরী মতবাদ ও আবু মানসুর আল-মাতুরিদীর মাতুরিদী মতবাদ উভয়টি ইসলামী আকীদার সকল মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন মতামত প্রদান করে। এ দু'টি মতবাদের সম্মিলিত আকীদা নিয়েই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয় ।[২৪২] বহু হানাফী আলিম মাতুরিয়্যাতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে অনেক খিদমাত করেছেন।

---

২৩৯ . আদুল কাহের বাগদাদী, *আল-ফিরাকু বাইনাল ফিরাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৪০ . সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩. ২য় সং., পৃ. ৬২৬

২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭

২৪২ . *প্রাগুক্ত*

তাদের মধ্যে অন্যতম আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-বায়যাবী, আল্লামা তাফতাযানী, আল্লামা নাসাফী, আল্লামা ইব্ন হুমাম প্রমূখ। আশ'আরী মতবাদে বিশ্বাসী যে সব আলিম এ সম্প্রদায়ের প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবু বকর আল-বাকেল্লানী, আবদুল কাহির আল-বাগদাদী, ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী প্রমূখ।

আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এজন্য তাঁকে 'মুহিউস সুন্নাহ ' সুন্নাহ পুনরুজ্জীবনকারী নামে অভিহিত করা হয়। সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী (রহ.) এ সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় মতবাদের মর্যাদা দান করে একে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। আইয়ুবী সালতানাতে বিদ'আত রহিত করার আদেশ জারী করা হয়। সেই সাথে মালিকী ও শাফেয়ী ফিকহের শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়া মুসলিম স্পেনেও এ সম্প্রদায়ের মতাদর্শ রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করে। ইমাম গাযালীর শিষ্য মুহাম্মদ ইব্ন তুমায়ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। [২৪৩] যারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত তাদের মাঝে নিম্নোক্ত দশটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১। শাইখাইন তথা আবু বকর (রা.) ও উমর (রা) কে সকল সাহাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা।

২। রাসূল (স)-এর জামাতা উসমান ও আলী (রা) কে সম্মান করা।

৩। উভয় কিবলা-বাইতুল্লাহ ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে সম্মান করা।

৪। মুত্তাকী ও ফাসিক উভয় ব্যক্তির জানাজায় শরীক হওয়া।

৫। মুত্তাকী ও ফাসিক উভয় ইমামের পেছনে সালাত আদায় করা।

৬। ইমাম ও রাষ্ট্রনায়ক জালেম হোক আথবা ন্যায়পরায়ণ হোক তাদের বিরুদ্ধাচরণ না করা।

৭। পায়ের মোজার উপর মাসেহ বৈধ মনে করা।

৮। ভালো মন্দ তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা।

---

২৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৮

৯। কোন মুসলমানকে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী হওয়ার সাক্ষ্য না দেওয়া। তবে নবীগণ ও আশারায়ে মুবাশ্‌শারা সাহাবাগণ এ নীতির বহির্ভূত থাকবেন।

১০। সালাত ও যাকাত আদায় করা।

উল্লেখ্য, এগুলো বড় বৈশিষ্ট্য, এ ছাড়া আরো বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[২৪৪]

আব্দুল কাহির আল বাগদাদী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে আট শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে এই আট শ্রেণির পরিচয় পেশ করা হলো :

১। প্রথম শেণিতে আছেন সেই সব মহামনীষী যাঁরা তাওহীদ, নবুওয়াত, সৎকর্মের প্রতিদানের ওয়াদা, অসৎকর্মের শাস্তির সতর্কতা, ইজতিহাদ, ইমামত তথা মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্বের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে যথার্থ ও সম্যক জ্ঞানের অধিকারী, সেইসাথে পথভ্রষ্ট খারেজী, শীআ, প্রকৃতিবাদী ও মুতাকাল্লিমদের মত ও পথ পরিহার করে চলেছেন। জমহুর তাবেয়ীগণ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

২। দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছেন ফকীহগণ। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী বিধি-বিধান নির্ণয়ের মতো মহান কাজে নিয়োজিত ছিলেন, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ.), ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) ইমাম আওয়াঈ (রহ.), ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.), ইমাম ইব্‌ন আবী লায়লা (রহ.) প্রমূখ। তাঁদের সহযোগীবৃন্দ এবং আহলুজ জাওয়াহিরও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ।

৩। তৃতীয় শ্রেণিতে আছেন মুহাদ্দিসগণ। তাঁরা মহানবী (স.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি তথা হাদীস সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই এবং তা গ্রন্থাবদ্ধ করার দূরহ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম যুহরী (রহ.), ইমাম মালেক ইব্‌ন ইব্‌ন আনাস (রহ.), ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.), ইমাম ইব্‌ন মাজাহ(রহ.), ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী (রহ.), ইমাম দারেমী (রহ.), ইমাম হাকিম (রহ.), প্রমূখ।

---

২৪৪ . ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত্বত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৪। চতুর্থ শ্রেণিতে আছেন সাহিত্য তথ্য বাক্যবিন্যাস চর্চায় যারা নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে খলীল ইব্ন আহমাদ আল ফারাহিদী, আবু আমর ইব্ন আলা, সীবাওয়াইহ, আল আখফাশ, আল-আসমাঈ, আল মাযিনী ও আবু উবায়দার নাম প্রনিধাণযোগ্য।

৫। পঞ্চম শ্রেণিতে আছেন ক্বারীগণ ও মুফাসসিরগণ। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আল্লাম তাবারী, ইব্ন কাসীর, মাহমুদ আলূসী, ইমাম কুরতুবী প্রমূখ।

৬। ষষ্ঠ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন সেই সব মনীষী যারা সুফী সাধনায় নিয়োজিত থেকে দাওয়াতে ইলাল্লাহের কাজ করে গিয়েছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে চরম কৃচ্ছতার অনুশীলন করেছেন এবং রাত দিন আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে মশগুল থেকেছেন।

৭। সপ্তম শ্রেণিতে আছেন সেই সকল মর্দে মুজাহিদ যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠারর জন্য নিজেদের জান এবং মালকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে তারা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এদের অন্যতম হচ্ছেন নূরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.), গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী (রহ.), তারিক বিন যিয়াদ (রহ.), মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম (রহ.), মুসা ইব্ন নুসাইর (রহ.), প্রমূখ।

৮। অষ্টম শ্রেণিভূক্ত হলেন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাধারণ অনুসারীগণ।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হচ্ছে মূল ধারার মুসলিম। সমগ্র বিশ্বে এর সংখ্যাই বেশি। শতকরা ৯০ জন মুসলিমই এ দলের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ দল কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। এর কারণ হচ্ছে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ থাকা। উপর্যুক্ত মতভেদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় চারটি উপদল বা মাযহাব। এগুলো হচ্ছে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। এসব মাযহাবে বিভক্ত হলেও কতগুলো গৌণ বিষয় ছাড়া মৌলিক ও সাধারণ স্বীকৃত বিষয়ে তারা একমত ছিলেন।[২৪৫]

ইসলামের মৌল বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন রূপ মতপার্থক্য ছিল না। গৌণ বিষয়ে শুধু মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কোন কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু।

২৪৫ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

এ চারটি মাযহাব একে অপরকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে। সে সাথে হক বা সত্যের উপর অটল থাকার স্বীকৃতি প্রদান করে। কোন একজন একটি বিশেষ মাযহাব গ্রহণ করতে পারেন। তবে নিষ্ঠার সাথে এ মাযহাবের অনুসরণ করা তার একান্ত কর্তব্য এবং অন্য কোন মাযহাবের সদস্যদের সাথে বৈরীভাব পোষণ করা তার জন্য অনুচিৎ।[২৪৬] উল্লেখ্য, চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতপন্থি সকল মুসলিমের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র। এ চারজনের অনুসারীদের মুকাল্লিদ বলা হয়। এই চার মাযহাবের বাইরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আরেকটি উপদল রয়েছে, তারা মাযহাবের অনুসারী নয় তাদেরকে গায়রে মুকাল্লিদ বলা হয়। তারা আহলে হাদীস নামে সমধিক পরিচিত।[২৪৭] এ পর্যায়ে মাযহাব চতুষ্টয় ও আহলে হাদীসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাব প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এ মাযহাব সবচেয়ে জনপ্রিয়। এ মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে অনেক বেশি। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, মিশর, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান এ মাযহাবের অনুযারী।[২৪৮] এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আবু হানীফা (রহ.)-এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রকৃত নাম আন-নোমান ইব্ন সাবিত ইব্ন যুতা।[২৪৯] তবে তার পৌত্র ইসমাঈল তাঁর বংশধারা বর্ণনায় বলেন: "আমি ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন নোমান ইব্ন সাবিত ইব্ন নোমান ইব্ন মারযুবান। আমরা পারস্য বংশোদ্ভূত এবং কখনো দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইনি। আমার দাদা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাবিত শৈশব কালে আলী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি তাঁর এবং তাঁর বংশের মঙ্গলের জন্য দু'আ করেছিলেন।

২৪৬ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

২৪৭. ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮

২৪৮. ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

২৪৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

আমরা আশা করি তাঁর ঐ দু'আ নিষ্ফল হয়নি।"[২৫০] ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ৮০ হিজরী/৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন।[২৫১] তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁর জন্মসাল ৬০ হিজরী আবার কেউ কেউ ৭০ হিজরী উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার (রহ.) পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে আরবের অভিজাত পরিবার বনী তায়মুল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এজন্য তাঁকে আত-তায়েমী বলা হয়।[২৫২] আমীরুল মুমিনীন আলী (রা.)-এর সাথে তাঁর পিতামহের গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।[২৫৩] তাঁর পিতা সাবিত কূফা নগরীতে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন।[২৫৪]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন পবিত্র কুরআন হিফয করার মাধ্যমে। তিনি কুরআন মাজিদের প্রসিদ্ধ সাত কারীর অন্যতম কারী আসিম ইব্ন আবিন নাজুদ (রহ.)-এর নিকট ইলমুল কিরাআত শিক্ষা করেন।[২৫৫] অতঃপর কুরআন, হাদীস, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন ও কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর মনোনিবেশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি তৎকালীন কুফার খ্যাতিমান ফকীহ হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রহ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নিয়মিত তাঁর মজলিসে যোগদান করতে থাকেন।

ইমাম আবু হানীফা ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আর তখনও অনেক সাহাবী বেঁচে ছিলেন। ফলে কোনো সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কেননা, সাহাবীদের কেউ কেউ ১১০ হিজরী সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এ প্রেক্ষিতে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে তাবেয়ী বলেছেন আবার কেউ কেউ এটা নাকচ করেছেন। প্রখ্যাত শাফেয়ী

---

২৫০ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২১ ; মাওলানা মতিউর রহমান, *চার ইমামের জীবনী* (ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ১৫

২৫১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

২৫২ . মাওলানা মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

২৫৩ . *ইসলামী বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

২৫৪ . *প্রাগুক্ত*

২৫৫ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

ফকীহ ও ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন: "আবু হানীফা চারজন সাহাবীর (রা.) সময় পেয়েছিলেন, (১) বসরার আনাস ইব্‌ন মালিক (২) কূফার আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী আওফা (৩) মদীনার সাহল ইব্‌ন সাদ সায়িদী (৪) মক্কার আবুত তুফাইল আমির ইব্‌ন ওয়াসিল। তাদের কারো সাথেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি এবং কারো থেকেই তিনি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেননি।"[২৫৬]

হানাফী জীবনীকারদের বর্ণনায় সাতজন সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারা হচ্ছেন:

১। জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম আল-আনসারী আল-খাযরাজী আল-মাদানী (রা.)

২। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস (রা.)

৩। ওয়াসিলা ইব্‌ন আনকা ইব্‌ন কাব ইব্‌ন আমির লাইসী শামী (রা.)

৪। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী আওফা আলকামা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হারিস আসলামী কূফী (রা.)

৫। আবুল হারিস আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন জুয ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাদী কারিব যাবীদী মিসরী (রা.)

৬। আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাদর ইব্‌ন দামদাম ইব্‌ন যাইদ হারাম আল-আনসারী (রা.)

৭। আয়শা বিনতু আজরাদ (রা.)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাবেয়ী ছিলেন নাকি তাবে-তাবেয়ী ছিলেন এ বিতর্কে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ঐতিহাসিক ও হানাফী ফকীহ আল্লামা মাহমুদ ইব্‌ন আহমদ বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন: "জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাতের বর্ণনাটি বাহ্যতই সঠিক নয়। তবে অন্যান্যদের সাথে তাঁর সাক্ষাতের সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। যেহেতু তাঁর জীবনীকারগণ তা উল্লেখ করেছেন সেহেতু সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া তা অস্বীকার করা অযৌক্তিক পক্ষপাতমূলক আচরণ বলে গণ্য।"[২৫৭]

তিনি আরো বলেন: "আবু হানীফা (রহ.) তাবেয়ীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিককে (রা.) দেখেছেন। এ বিষয়ে একমাত্র কোনো মূর্খ বা হিংসুক ছাড়া কেউ সন্দেহ

---

২৫৬. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান* (বৈরুত: দার সাদির, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪০৬

২৫৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

করেননি। ইব্‌ন কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, আবু হানীফা (রহ.) সাহাবীদের যুগ পেয়েছিলেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিককে (রা.) দেখেছেন। বলা হয় যে তিনি অন্য সাহাবীকেও দেখেছেন। খতীব বাগদাদী তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবু হানীফা আনাস ইব্‌ন মালিককে (রা.) দেখেছেন। মিযযী তাঁর তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিককে (রা.) দেখেছেন। যাহাবী, 'আল-কাশিফ' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য আলিমও একই কথা লিখেছেন।"[২৫৮]

আল্লাম বদরুদ্দীন আইনী ইমাম আবু হানীফার (রহ.) উস্তায সংখ্যা চার হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী উস্তাযগণের সংখ্যা প্রায় দুইশত।[২৫৯] তাবেয়ীদের মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাযগণ হলেন ইমাম যায়িদ ইব্‌ন আলী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.), ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.), ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাসান (রহ.), আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (রহ.), হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ (রহ.), নাফি (রহ.), ইকরামা (রহ,), আমির ইব্‌ন শুরাহবিল (রহ.) প্রমূখ। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফেয়ী ফকীহ ইমাম ইউসুফ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আবুল হাজ্জাজ মিযযী (রহ.) তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর হাদীসের ৭৭ জন উস্তাযের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের অধিকাংশই তাবেয়ী। এদের কেউ কেউ ইমাম আবু হানীফার (রহ.)-এর সমসাময়িক এবং কেউ কেউ তাবে-তাবেয়ী। এদের অধিকাংশই তৎকালীন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ইলমুল হাদীসের ইমাম বলে গণ্য ছিলেন। এদের অনেকের বর্ণিত হাদীস বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে সংকলিত।[২৬০]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করেন। একপর্যায়ে তিনি ইলমুল কালাম চর্চায় মনোনিবেশ করেন। অতঃপর তিনি হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলাইমানের

---

২৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩

২৫৯. *প্রাগুক্ত*

২৬০. *প্রাগুক্ত*

(রহ.) দরসে যোগ দেন এবং ১৮ বছর তাঁর সাহচর্যে কাটান।[২৬১] তদীয় উস্তায হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমানের (রহ.) মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। উস্তাযের জীবদ্দশাতেই তার খ্যতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাবেয়ী যুগের আর কোনো ফকীহ এতো প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হননি। স্বীয় উস্তাযের মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে ব্যয় করেন।
ইমাম মিযযী (রহ.) তাঁর ৯৭ জন মুহাদ্দিস ছাত্রের তালিকা পেশ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই সে যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন এবং তাদের বর্ণিত হাদীস বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ সকল ছাত্রের অনেকেই পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ জনপদসমূহের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।[২৬২] আল্লামা আইনী (রহ.) এ সকল ছাত্রের বাইরে আরো ২৬০ জন প্রথিতযশা ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন যারা তাঁর নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্হ শিক্ষালাভ করেছেন।[২৬৩]

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবু হানীফার (রহ.) অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাঁর শানিত মেধা গভীর জ্ঞান ও পরিশীলিত যুক্তি প্রয়োগ করে একটি বিধিবদ্ধ আইন শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।[২৬৪] তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারকের (রহ.) মতে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিকাশে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যে অবদান রেখে গেছেন তা এ শাস্ত্রের পাঠকদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিবে।[২৬৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফার (রহ.) তদীয় উস্তায হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান (রহ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর দারসের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইলমে ফিক্হের শিক্ষার্থীগণ

---

২৬১ . মাওলানা মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

২৬২ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৬৩ . *প্রাগুক্ত*

২৬৪ . *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

২৬৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯-৩৬০

তাঁর দারসে অংশ নেওয়ার জন্য ছুটে আসে। মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, দামেশক, বসরা, কূফা, ওয়াসিত, মাওসিল, জাযীরা, রিক্কা, রামাল্লাহ, মিসর, ইয়ামেন, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়ায, কিরমান, ইস্পাহান, হালওয়াল, হামাদান, দাগমান, তাবারিস্থান, জুরজান, সারাখস, নিশাপুর, সমরকন্দ, বুখারা, তিরমিয, বলখ, কুর্দিস্তান, খাওয়ারিজম, সিজিস্তান, মাদায়েন, হিমস ইত্যাদি অঞ্চল থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী তাঁর দারসে শরীক হয়ে কুরআন, হাদীস, ফিকহসহ ইসলামী উলুমের অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করে।[২৬৬] ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর ছাত্রদের মধ্য থেকে বিশজনের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১। কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (রহ.)

২। মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)

৩। যুফার ইব্‌ন হুযাইল আম্বারী (রহ.)

৪। হাম্মাদ ইব্‌ন আবু হানীফা (রহ.)

৫। হাসান ইব্‌ন যিয়াদ (রহ.)

৬। আবু ইসমাত নূহ ইব্‌ন মরিয়ম আল-জামী (রহ.)

৭। কাযী আসাদ ইব্‌ন আমর আল-মুতী (রহ.)

৮। হাকাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বালখী (রহ.)

৯। ফাদল ইব্‌ন মূসা (রহ.)

১০। দাঊদ আত-তাঈ (রহ.)

১১। আবু বকর ইব্‌ন আয়্যাশ (রহ.)

১২। সুফিয়ান সাওরী (রহ.)

১৩। হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (রহ.)

১৪। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মোবারক (রহ.)

১৫। আব্দুর রাযযাক ইব্‌ন ইবরাহীম (রহ.)

১৬। আবদুর রহমান আল-মুকরী (রহ.)

১৭। কাসিম ইব্‌ন মাআন (রহ.)

---

২৬৬ . লেখক মন্ডলী, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৩০

১৮। ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.)

১৯। জাফর ইব্‌ন আওন (রহ.)

২০। মুস‘আব ইব্‌ন কুদাম (রহ.)[২৬৭]

ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর পাঠদান পদ্ধতি ছিল অভিনব ও কার্যকর। তিনি গতানুগতিক সবক পড়াতেন না, যে বিষয়ে পাঠদান করতেন তা নিয়ে তিনি ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। অতঃপর বিষয় সম্পর্কে মুক্ত আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিতেন। শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করতেন এবং নিজ নিজ মত পেশ করে এর পক্ষে দালীলিক যুক্তি পেশ করতেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের নিজস্ব যুক্তি পেশ করার পূর্ণ অধিকার রাখতেন। এভাবে একটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত থাকতো। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা (রহ) সার্বিক পর্যালোচনার পর গভীর চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজের মতামত পেশ করতেন। তিনি আলোচ্যবিষয়ের উপর এমন যুক্তি পেশ করতেন যা সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত মেনে নিতেন।[২৬৮]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইলমে কালাম, ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ সহ অন্যান্য ইলমে পারদর্শী থাকা সত্ত্বেও নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর না করে তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ৪০ জন পন্ডিত আলিমকে নিয়ে একটি ফিক্‌হ বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও মুজতাহিদ ছিলেন।[২৬৯]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর পূর্বে ইলমে ফিক্‌হ চর্চায় এমন অভিনব ও কার্যকর পদ্ধতি আর কেউ অবলম্বন করেনি। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হচ্ছে। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত বোর্ডের সদস্যগণ সবাই ছিলেন জ্ঞানে-গুণে, প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যে সর্বজন স্বীকৃত। মুহাদ্দিস ওয়াকী ইব্‌নুল জাররাহ (রহ.) এ বোর্ডের সদস্যবৃন্দ সম্পর্কে বলেন :

---

২৬৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩১

২৬৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০

২৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

كيف يقدر ابو حنيفة ان يخطئ و معه مثل ابي يوسف وزفر و محمد في قياسهم و اجتهادهم ومثل يحي بن زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل فى حفظهم للحديث ومعرفتهم به والقاسم بن معن يعني ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود في معرفة باللغة العربية و داؤد بن نصير الطائي و فضيل بن عياض في زهدها و ورعهما فمن كان اصحابه هؤلاء الجلساء لم يكن بحطئ و انه ان اخطاء ردوه -

"ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কীভাবে ভুল করতে পারেন? যখন তাঁর সহচর আবু ইউসুফ, যুফার ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতো কিয়াসে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি এবং ইয়াহিয়া ইব্ন আবু যায়িদা, হাফস ইব্ন গিয়াস, হিববান ও মিনদাল এর মতো হাফেযে হাদীস এবং কাসিম ইব্ন মাআন-এর মতে আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ এবং দাউদ ইব্ন নাসীর আত-তাঈ ও ফুযাইল ইব্ন ইয়াযের মতো দুনিয়াবিমুখ মুত্তাকী বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকতেন। যে ব্যক্তির এমন সহচর থাকবে তিনি কখনো ভুল করতে পারেন না। কেননা যদি এমন কোনো ভুল হয়েও থাকে তবে এমন ব্যক্তিগণ অবশ্যই তা সাথে সাথে ধরিয়ে দিবেন।"[২৭০]

ফিকহী মাসাইল রচনা ও লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর অনুসৃত নীতিমালা সম্পর্কে ফিকহে হানাফীর ইতিহাস দর্শন গ্রন্থে বলা হয়েছে: "ফিকহী মাসাইল রচনা ও লিপিবদ্ধকরণে ইমাম আযম (রহ)-এর অনুসৃত নীতি ছিল তিনি প্রথমেই মাসআলার সমাধান পবিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন। কুরআন মাজিদের আহকামের আয়াত সমূহের ইবারাতুন নস, দালালাতুন নস, ইশারাতুন নস, ইকতিদাউন নস অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, স্পষ্ট, সুপ্ত, ইশারা ইঙ্গিত যে কোনো ভাবেই সমাধান খুঁজতেন। পাওয়া গেলে তাই লিপিবদ্ধ করতেন। না পাওয়া গেলে হাদীসে রাসূল (স.) এ সমাধান অনুসন্ধান করতেন। হাদীসে সমাধান না পাওয়া গেলে আসারে সাহাবা ও ফাতাওয়ায়ে সাহাবা অনুসন্ধান করতেন এবং নির্দ্বিধায় যে কোনো সাহাবার অভিমত গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে সমাধানে ব্যর্থ হলে তাবেঈগণের মতামত অনুসন্ধান করতেন। সমাধান না পেলে ইজমার প্রতি মনোনিবেশ করতেন। এখানেও ব্যর্থ হলে কিয়াস তথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা সমাধানকৃত হুকুমের সাথে তুলনামূলক

২৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

পর্যালোচনা করে সামঞ্জস্য বিধান পূর্বক উপমানের হুকুম উপমেয়ের উপর আরোপ করতেন এবং ইসতিহসানের দ্বারা মাসআলা সমাধান করতেন।"[২৭১] ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দীর্ঘ বাইশ বছর সাধনার পর ৮৩ হাজার ফিকহী মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে তা ৫ লক্ষে পৌঁছে।[২৭২] ইসলামী বিশ্বকোষে এর সংখ্যা ১২ লক্ষ ৯০ হাজারের উপরে বলে উল্লেখ করা হয়।[২৭৩]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রশাসনের কোনো দায়িত্ব পালন করা থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চা করাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কূফার উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়াযিদ ইব্‌ন হুবায়রা তাকে কাযীর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে আব্বাসী খলীফা আল-মানসুর তাঁকে কাযীর পদ গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফা আল-মানসুর রাগান্বিত হয়ে তাকে বন্দী করে কারাঘরে নিক্ষেপ করেন। ১৫০ হিজরী/৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে বন্দী অবস্থায় এই মহান মনীষী
শাহাদাৎ বরণ করেন।[২৭৪] বাগদাদের খাইযুরান কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।[২৭৫]
উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) খলীফা মানসুরের আহবানে কূফা থেকে বাগদাদ গমন করেন। অতঃপর খলীফার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় তাকে কারাঘারে প্রেরণ করা হয়। তিনি মৃত্যুবরণ করলে সেখানেই তাঁর জানাযা প্রস্তুত করা হয়। তিনি কূফার মানুষ ছিলেন কিন্তু বাগদাদে নবাগত হলেও তাঁর সুখ্যাতি সেখানে এতো বেশি ছিল যে, তাঁর জানাযায় এত মানুষ উপস্থিত হয় যে, ছয়বার তার জানাযা পড়তে হয়। দাফনের পর খলীফা আল-মানসুর নিজে

---

২৭১ . *প্রাগুক্ত*

২৭২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

২৭৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬০

২৭৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯

২৭৫ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

তাঁর কবরের পাশে জানাযা আদায় করে। অতঃপর ২০ দিন যাবত লোকেরা তার কবরের জানাযার সালাত আদায় করে।[২৭৬]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিধিবদ্ধ সংকলন তৈরি করতে সচেষ্ট হন। তিনি তার ছাত্রদের মধ্য থেকে ৪০ জনের সমন্বয়ে একটি ফিক্‌হ বোর্ড গঠন করেন। এ সকল ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আশ-শায়বানী (রহ.), ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মোবারক (রহ.), ইমাম যুফারের (রহ.) নাম প্রণিধানযোগ্য।[২৭৭] তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মতের সাথে তাঁর ছাত্রদের মতামত সুক্ষ্মভাবে যাচাই করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। 'কিতাবুস সিয়ানা' গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সংকলিত মাস'আলার সংখ্যা বারো লক্ষ নব্বই হাজারেরও বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নীতিমালা সম্পর্কে তিনি নিজে বলেন: "আমি সর্বাগ্রে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধির অনুসরণ করি। সেখানে সুষ্ঠু নির্দেশ না পাই তবে প্রামাণ্য হাদীসের অনুসরণ করি; সেখানে যদি কিছু না পাওয়া যায় তবে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদের ক্ষেত্রে তাহাদের যেই অভিমত অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন বিবেচিত হয় আমি তাহা অনুসরণ করি। তাহাদের সকলের অভিমত পরিত্যাগ করিয়া আমি নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যদি তাঁহাদের কাহারও কোন অভিমত না পাওয়া যায়, শুধু সে ক্ষেত্রে ইমাম নাখঈ, শাবী, হাসান বসরী, ইব্‌ন সীরীন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব প্রমূখ তাবেয়ীর ন্যায় আমি ইজতিহাদ করি।"[২৭৮]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর হাদীস শাস্ত্রের প্রধান উস্তায ছিলেন আলী (রা.)-এর ছাত্র সমকালীন খ্যাতিমান হাদীস বিশারদ ও ফকীহ ইমাম আমীর আশ-শাবী (রহ.)।[২৭৯] ইমাম শাবী (রহ.) ৪৮ জন সাহাবী থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.)-এর খিদমতে প্রায় দশমাস অবস্থান করে ইলমে হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম শাবী (রহ.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করত:

---

২৭৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

২৭৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬০

২৭৮ . *প্রাগুক্ত*

২৭৯ . লেখক মন্ডলী, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

ইলমে দ্বীন বিশেষতঃ ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত থাকেন।[২৮০] ইমাম আবু হানীফা (রহ.) স্বীয় উস্তায ইমাম শাবী (রহ.)-এর মৃত্যুর পর সমকালীন শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমানের (রহ.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১০০ হিজরী থেকে ১২০ হিজরী পর্যন্ত তাঁর সোহবতে থেকে ইসলামী উলুমের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর উস্তায হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান (রহ.)-এর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ দু'জন ছাড়াও ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সেকালের সেরা মুহাদ্দিস ও ফকীহদের নিকট গমন করেন এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন। তিনি যেসব খ্যাতিমান শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন তাদের মধ্য থেকে বিশজনের একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

১। আমীর আশ-শাবী (রহ.)

২। হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান (রহ.)

৩। আমির ইব্ন শুরাহবিল হিমায়রী আল-কূফী (রহ.)

৪। আলকামা ইব্ন মারসাদ আল-কূফী (রহ.)

৫। সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ওমর আল-মাদানী (রহ.)

৬। হাকাম ইব্ন কুতাইবা আল-কূফী (রহ.)

৭। ইকরামা মাওলা ইব্ন আব্বাস আল-মাক্কী (রহ.)

৮। সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার আল-মাদানী (রহ.)

৯। আসিম ইব্ন আবু নাজওয়াদ আল-কূফী (রহ.)

১০। সালামা ইব্ন কুহাইল আল-কূফী (রহ.)

১১। আলী ইব্ন আকমার আল-কূফী (রহ.)

১২। আতা ইব্ন রিবাহ আল-মাক্কী (রহ.)

১৩। যিয়াত ইব্ন আলফাহ আল-কূফী (রহ.)

১৪। আল-বাকির মুহাম্মদ (রহ.)

১৫। ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী (রহ.)

২৮০. *প্রাগুক্ত*

১৬। নাফি মাওলা ইব্ন ওমর আল-মাদানী (রহ.)

১৭। ইব্ন শিহাব যুহরী আল-মাদানী (রহ.)

১৮। আব্দুল্লাহ ইব্ন দীনার আল-মাদানী (রহ.)

১৯। আমর ইব্ন দীনার আল-মাককী (রহ.)

২০। কাতাদাহ ইব্ন দাআমাহ আল-বাসরী (রহ.)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর অনুপম চরিত্র মাধুরিমা

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর চারিত্রিক সৌন্দর্য ও ইবাদাতে নিষ্ঠা সমকালীন নেককার বুযুর্গদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তিনি উচ্চাঙ্গের আরবী ব্যবহার করতেন। তিনি বিরল সাহিত্য প্রতিভা ও অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। তিনি অসাধারণ যৌক্তিক বক্তব্য রাখতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর বাগ্মীতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তিনি যখন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করতেন তখন সাধারণ মানুষও তা বুঝতে সক্ষম হতো।[২৮১]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দেহের রং ছিল কিছুটা বাদামী। মুখমন্ডল ও অবয়ব ছিল সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তিনি খুব লম্বাও ছিলেন না আবার বেটেও ছিলেন না, তিনি মাঝারি আকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি সুন্দর ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করতেন। তিনি সুন্দর জুতা পায়ে দিতেন। সে সাথে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তিনি সর্বদা সুগন্ধময় থাকতেন। তিনি যখন বাড়ি থেকে বের হতেন তখন তাঁর সুগন্ধির মাধ্যমে তাঁর আগমন বুঝা যেতো।[২৮২] এ প্রসঙ্গে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

كان حسن السمت، حسن الوجه ' حسن الثوب-

‘‘তাঁর বাহ্যিক প্রকাশ ও অবয়ব ছিল সুন্দর। মুখমন্ডল ছিল সুন্দর এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সুন্দর।’’[২৮৩]

তাঁর ছাত্র কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (রহ.) বলেন :

---

২৮১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

২৮৩ . কাযী আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইব্ন আলী সাইমারী, *আখবারু আবী হানীফাহ ওয়া আসহাবিহী* (বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ০৩

كان ابو حنيفة ربعا من الرجال ‘ ليس بالقصير ولا بالطوال ‘ و كان احسن الناس منطقا و أحلا هم نعمة ‘ و انبههم علي ما يريد -

‘‘আবু হানীফা ছিলেন মাঝারি আকৃতির মানুষ, বেঁটেও নন এবং বেশি লম্বাও নন। মানুষদের মধ্যে কথাবার্তায় তিনি সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় মাধুর্য ছিল বেশি। আর তিনি তাঁর মনের উদ্দেশ্য সবার চেয়ে ভালো বুঝাতে পারতেন।’’[২৮৪]

ওমর ইব্‌ন হাম্মাদ বলেন :

ان ابا حنيفة كان طوالا ‘ تعلوه سمرة ‘ وكان لبسا ‘ حسن الهيئة، كثير التعطر يعرف يريح الطيب اذا قبل و اذا خرج من منزله قبل ان تراه-

‘‘আবু হানীফা কিছুটা লম্বা ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল কিছুটা বাদামী,তিনি পরিপাটি পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ও অবয়ব ছিল সুন্দর। তিনি সুগন্ধি ব্যবহার খুবই পছন্দ করতেন। তিনি যখন কোথাও যেতেন বা বাড়ি থেকে বের হতেন তখন তাঁকে দেখার আগেই সুগন্ধি থেকেই তাঁর আগমন বুঝা যেতো।’’[২৮৫]

ইমাম আবু হানীফার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কাজ বেশি করতেন আর কথা কম বলতেন। তিনি ইলম ও উলামাদের খুবই সম্মান করতেন। এ সম্পর্কে ফুদাইল ইব্‌ন ইয়াদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

كان ابو حينفة معروفا بلكثرة الا فعال ‘ و قلة الكلام و اكرام العلم و اهله -

“আবু হানীফার অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কাজ বেশি করতেন এবং কথা কম বলতেন। তিনি ইলম এবং আলিমগণকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।”[২৮৬]

আবু হানীফা ব্যবসীয় ছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ব্যবসায়ে বরকত দান করেছিলেন। তিনি অঢেল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর ধন-সম্পদ ইলম ও উলামাদের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করতেন। তিনি মুক্ত হস্তে উলামা ও তালাবাদের জন্য খরচ করতেন। এক্ষেত্রে তিনি

---

২৮৪. আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সাবিত খতীব বাগদাদী, *তারিখে বাগদাদ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৩০-৩৩১

২৮৫. *প্রাগুক্ত*, ৩৩১

২৮৬. কাযী আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইব্‌ন আলী সাইমারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

নিজের পরিবারের চেয়ে উলামা ও তালাবাদের অগ্রাধিকার দিতেন। প্রচুর পরিমাণে তিনি দান-সাদকা ও হাদিয়া প্রদান করতেন। তাঁর ছাত্রদের ভরণপোষণ নিজেই করতেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁর সাহচর্যে এসে সচ্ছল হয়ে যায়। তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (রহ.) ও তাঁর পরিবারকে তিনি দশ বছর প্রতিপালন করেন।[২৮৭]

তাঁর ছাত্র কাযী আবু ইউসুফ ইব্‌ন ইবরাহীম (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন :

انه كا شديد الذب عن محارم الله أن تؤتي ' شديد الورع ان ينطق في دين الله بما لا يعلم ' يحب ان يطاع الله ولا يعصي ' مجانبا لاهل الدنيا في زمانهم ' لا ينا قس في عزها ' طويل الصمت ' دائم الفكر' علي علم واسع ' لم يكن مهزارا ' ولا ثرثارا' ان سئل عن مثئلة كان عنده فيها علم ' نطق واجاب فيها بما سمع ' وان كان غير ذلك قاس علي الحق و اتبعه ' صائنا نفسه و دينه ' بذولا للعلم والمال ' مستغنيا بنفسه عن جميع الناس ' لا يميل الي طمع ' بعيدا عن الغيبة ' لا يذكر احدا الا بخير -

"আল্লাহর দ্বীন বিরোধী সকল কিছুকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও আল্লাহভীরু ছিলেন। দ্বীনের বিষয়ে না জেনে তিনি কিছুই বলতেন না। তিনি চাইতেন যে, আল্লাহর আনুগত্য করা হোক এবং তার অবাধ্য না হোক। তিনি তার যুগের দুনিয়ামুখি মানুষদেরকে পরিহার করে চলতেন। জাগতিক সম্মান-মর্যাদা নিয়ে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন না । গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং চিন্তা-গবেষণায় রত থাকতেন। বেশি কথা বলা বা বাজে কথা বলার কোনো স্বভাব তাঁর ছিল না। কোনো মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শ্রুতি বা হাদীসের ভিত্তিতে তার জবাব দিতেন। সে বিষয়ে কোনো শ্রুতি না থাকলে সঠিক কিয়াসের মাধ্যমে উত্তর দিতেন ও তা অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর নিজেকে ও তাঁর দীনকে সংরক্ষণ করতেন। তিনি সকল মানুষের থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী রাখতেন কোনো লোভ তাঁকে স্পর্শ করতো

২৮৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

না। তিনি গীবত বা পরচর্চা থেকে দূরে থাকতেন। কারো কথা উল্লেখ করলে শুধু ভাল কথাই বলতেন।"[২৮৮]

ইমাম আবু হানীফা ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি আপোষহীন সংগ্রামী মানুষ ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পদ পদবীর কোনো আকর্ষণ তাঁর মাঝে ছিলনা। তিনি রাষ্ট্রীয় পদ ও ক্ষমতা গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উমাইয়া সরকারের কূফার গভর্ণর ইয়াযিদ ইব্ন ওমর ইব্ন হুবাইয়া তাকে বাইতুল মালের দায়িত্ব প্রদান করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর জন্য ইব্ন হুবাইরা রাগান্বিত হয়ে তাকে ২০টি বেত্রাঘাত করে। অত:পর ইব্ন হুবাইরা তাকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন।[২৮৯] আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আল-মানসুর তাকে প্রধান বিচারপতি পদ গ্রহণের অনুরোধ করলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। এজন্য আল মানসুর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং তিনি সেখানেই ইন্তিকাল করেন।[২৯০]

আবু হানীফা (রহ.) তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ আলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা নিয়ে মনীষীগণ তাদের মূল্যায়ন পেশ করেছেন। এ পর্যায়ে সেসব ব্যক্তি বর্গের মূল্যায়ন থেকে দশটি মন্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো :

১। মুগীরাহ ইব্ন মিকসাম দাবী কূফী (রহ.) আবু হানীফা (রহ.)-এর উস্তায পর্যায়ের লোক ছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। বুখারী ও মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিস তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর ছাত্রকে বলেন :

جالس ابا حنيفة تفقه فان ابراهيم النخعي لو كان حيا لجالسه ، والله يحسن ان نتكلم في الحلال و الحرام.

২৮৮. কাযী আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইব্ন আলী সাইমারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২

২৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

২৯০. আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত খতীব বাগদাদী, প্রাগুক্ত, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ১৬৮

"তুমি আবু হানীফার মজলিসে বসবে, তাহলে ফিক্হ শিখতে পারবে। কারণ ইবরাহীম নাখয়ী যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও আবু হানীফার মজলিসে বসতেন। আল্লাহর কসম! হালাল ও হারামের বিষয়ে সে ভালোভাবে কথা বলার যোগ্যতা রাখে।"[২৯১]

২। কূফার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন সুলাইমান ইব্ন মিহরান আল আমাশ। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার হাদীসের উস্তাযও ছিলেন তিনি। তিনি ইমাম আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি এ মাস'আলাটি কোন দলীলের ভিত্তিতে বলেছ? আবু হানীফা উত্তরে বলতেন, আপনার বর্ণিত অমুক হাদীসটির ভিত্তিতে। তখন তিনি অবাক হয়ে বলতেন :

يا معشر الفقهاء انتم الا طباء و نحن الصيادلة

"হে ফকীহগণ! তোমরা ডাক্তার আর আমরা ফার্মাসিস্ট।"[২৯২]

আল-আমাশকে ফিকহী মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন :

انما يحسن الجواب في هذا و مثله النعمان بن ثابت الخزان و اراه بورك له في علمه –

''এগুলোর জবাবতো কাপড় ব্যবসায়ী নোমান ইব্ন সাবিতই বলতে পারে। আমার ধারণা তার ইলমে বরকত প্রদান করা হয়েছে।"[২৯৩]

৩। মিসআর ইব্ন কিদাম ইব্ন যাহীর কূফী ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সমসাময়িক মুহাদ্দিস ছিলেন। বুখারী ও মুসলিমসহ সকল ইমাম তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন:

ما احسن احدا باكوفة الا رجلين ابو حنيفة في فقهه والحسن بن صالح في زهده-

কূফার দু'ব্যক্তি ছাড়া কাউকে ঈর্ষার যোগ্য বলে মনে করি না; আবু হানীফাকে তাঁর ফিক্হের জন্য আর হাসান ইব্ন সালিহকে তাঁর যুহদের জন্য।"[২৯৪]

---

২৯১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২৯২. কাযী আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইব্ন আলী সাইমারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

২৯৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৯৪. আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত খতীব বাগদাদী, প্রাগুক্ত, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৯

৪। কূফার অন্যতম প্রসদ্ধি তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস ছিলেন ইসরাঈল ইব্ন ইউনুস (রহ.)। তিনি আবু হানীফা (রহ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন :

كان نعم الرجل النعمان ما كان احفظه لكل حديث فيه فقه واشد فحصه عنه و اعلمه بما فيه من الفقه و كان قد ضبط عن حماد فاحسن الضبط عنه فاكرمه الخلفاء والامراء والوزراء-

"নোমান খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। যে সকল হাদীসের মধ্যে ফিক্হ রয়েছে সেগুলো তিনি খুব ভালোভাবে ও পরিপূর্ণরূপে মুখস্থ রাখতেন। সেগুলোর বিষয়ে সর্বোচ্চ অনুসন্ধান করতেন এবং সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ফিকহী নির্দেশনাও সবচেয়ে ভালোভাবে জানতেন। এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতি, অনুসন্ধান ও জ্ঞান চিল বিস্ময়কর। তিনি হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান থেকে ফিকহ সংরক্ষণ করেন এবং খুব ভালোভাবেই সংরক্ষণ করেন। ফলে খলীফাগণ, আমীরগণ ও উযীরগণ তাঁকে সম্মান করেছেন।"[২৯৫]

৫। কূফার অন্যতম তাবি-তাবেয়ী মুহাদ্দিস হাসান ইব্ন সালিহ (রহ.)। তিনি তার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাহিদ হিসেবে পরিগণিত। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য ইমামগণ তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন:

كان النعمان بن ثابت فهما متثبتا في علمه اذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يعده الي غيره

"নোমন ইব্ন সাবিত বিজ্ঞ আলিম ছিলেন, ইলমের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে সচেতন ছিলেন। কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হলে তিনি তা পরিত্যাগ করে অন্যদিকে যেতেন না।"[২৯৬]

৬। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ছাত্র ও তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও যাহিদ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক (রহ.)। তিনি তদীয় উস্তায সম্পর্কে বলেন :

---

২৯৫. *প্রাগুক্ত*

২৯৬. ইউসুফ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দিল বার, *আল-ইনতিকা* ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১২৮

لا تكذ ب الله في انفسنا امامنا ابو حنيفة و في الحديث سفيان فاذا اتفقا لا ابا لي بمن خالفهما -

''আমাদের নিজেদের বিষয়ে আল্লাহকে মিথ্যা বলব না। ফিকহের বিষয়ে আমাদের ইমাম আবু হানীফা এবং হাদীসের বিষয়ে আমাদের ইমাম সুফিয়ান সাওরী। আর যখন তাঁরা দু'জন কোনো বিষয়ে একমত হন আমরা তাঁদের বিপরীতে কাউকে পরোয়া করি না।"[২৯৭]

৭। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রধান শিষ্য ছিলেন মুসলিম জাহানের প্রথম প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (রহ.)। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি বলেন :

ما رأيت احدا بتفير الحديث و مواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة-

''হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং হাদীসের মধ্যে ফিকহের যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা অনুধাবন করায় আবু হানীফার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও পারদর্শী আমি কাউকে দেখেনি।"[২৯৮]

৮। কূফার প্রসিদ্ধ তাবি-তাবেয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন হাফ্‌স ইব্ন গিয়াস নাখয়ী (রহ.)। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন :

كلام ابي حنيفة في الفقه ادق من الشعر يعيبه الا جاهل -

''ফিকহের বিষয়ে আবু হানীফার বক্তব্য চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম। জাহিল-মূর্খ ছাড়া কেউ তাঁকে খারাপ বলে না।''[২৯৯]

৯। চার মাযহাবের অন্যতম মাযহাব শাফেয়ী মাযহাব। এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরিস আশ-শাফেয়ী (রহ.)। তিনি আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে বলেন:

الناس علي الفقه عيال علي ابي حنيفة

ইলমে ফিক্‌হের প্রতিটি মানুষ আবু হানীফার পরিবারভূক্ত।"[৩০০]

---

২৯৭. কাযী আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইব্ন আলী সাইমারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০; আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত খতীব বাগদাদী, *তারিখে বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৭

২৯৮. আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত খতীব বাগদাদী, *তারিখে বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৪০

২৯৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৩ হি.) খ. ৬, পৃ.৪০৩

৩০০. লেখক মন্ডলী, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭

১০। হিজরী দ্বিতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কামাল। তিনি বলেন :

لا نكذب الله ما سمعنا احسن من رأي ابي حنيفة و قد اخذنا باكثر اقواله -

"আল্লাহকে মিথ্যা বলব না! আবু হানীফার মতের চেয়ে উত্তম মত আমি শুনিনি। অধিকাংশ বিষয়ে আমরা তাঁর মত অনুসরণ করি।"[৩০১]

হানাফী ফিকহের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ফিকহে হানাফীর বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১। হানাফী ফিকহ এ রিওয়ায়েতের সাথে দিরায়াত তথা যুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে।

২। হানাফী ফিক্‌হ অপরাপর মাযহাবের তুলনায় সরল ও সহজে পালনীয়।

৩। হানাফী ফিকহে বাস্তব জীবন ব্যবস্থার অংশ অত্যন্ত ব্যাপক, সুদৃঢ় এবং নিয়মতান্ত্রিক।

৪। তাহযীব, তামাদ্দুন বা কৃষ্টি কালচারের জন্য যা যা প্রয়োজন তা অন্যান্য ফিকহের তুলনায় হানাফী ফিক্‌হে বেশি পরিমাণে রয়েছে।

৫। হানাফী ফিক্‌হ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও বিচার কার্য পরিচালনা করা খুবই সহজ। কারণ এতে অমুসলিম নাগরিকদের দাবী ও চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৬। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎকলিত মাস'আলা-মাসাইল হানাফী ফিকহে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও যুক্তিসঙ্গত।

৭। হানাফী ফিক্‌হে পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে এমন সমন্বয় করা হয়েছে যার ফলে হাদীস এবং কুরআনের আয়াত আমলের আওতা বহির্ভূত থাকেনি।[৩০২]

হানাফী ফিকহের দলীল সমূহ

হানাফী ফিকহের মূল দলীল হচ্ছে সাতটি। যথা: ১। কিতাবুল্লহ ২। সুন্নাহ ৩। সাহাবায়ে কিরামের অভিমত ৪। ইজমা ৫। কিয়াস ৬। ইসতিহসান ৭। উরফ।

---

৩০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯০

৩০২. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

এসব দলীলের ভিত্তিতেই হানাফী ফিক্‌হ সংকলিত হয়েছে এবং শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এ সব দলীলের আলোকে মাস'আলা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ.) ও মালিকী মাযহাব

তাঁর নাম মালিক। আবু আব্দুল্লাহ তাঁর কুনিয়াত। উপাধি ইমামু দারিল হিজরত। তাঁর বংশধারা হচ্ছে : আবু আব্দিল্লাহ মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবি আমীর ইব্‌ন ওমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন গাযলাস ইব্‌ন জামিল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিস আসবাহী। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বংশের প্রধান ব্যক্তি হারিস আসবাহ বংশের শেখ ছিলেন। তাই তাকে 'যু- আসবাহ' উপাধি প্রদান করা হয়। আসবাহ ছিল ইয়ামেনের সর্বশেষ শাহী খান্দান হিময়ার এর একটি শাখা। এ হিসেবে তিনি ছিলেন খালিস আরবীয় রক্তের অধিকারী। জাহিলী এবং ইসলামী উভয় যুগেই তাঁর গোত্র সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাঁর দাদা মালিক ইব্‌ন আমির একজন প্রভাবশালী তাবেয়ী ছিলেন। তিনি সিহাহ সিত্তার রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইব্‌ন আফফান (রা.)-এর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। ওসমান (রা.)-এর লাশ উদ্ধার করে যারা দাফন করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) এর মাতার নাম আলিফ বিনতু শরীফ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-ওয়াদিয়াহ (রহ) ।[৩০৩]

ইমাম মালিক (রহ) ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসেবে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর চেয়ে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন। তবে তাঁর জন্মকাল নিয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইয়াফিঈ তাঁর জন্মকাল ৯৪ হিজরী ও ইব্‌ন খাল্লিকান ৯৫ হিরী বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০৪] তিনি ১৭৯ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩০৫]

---

৩০৩. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামবাদী, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)*, জীবনী অংশ : *হায়াতে ইমাম মালিক (র)* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০২ খ্রি.), ৪র্থ সং, পৃ. ২১

৩০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৩০৫. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ.) ইলম শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠেন। তাঁর পরিবার ছিল ইলমে নববীর অন্যতম উত্তরধিকারী। তাঁর দাদা তাবেয়ী ছিলেন। তিনি সিহাহ সিত্তার রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার চাচা আবু সুহায়ল নাফিও হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ইমাম যুহরীর উস্তায ছিলেন। তাঁর পিতা ইলমে হাদীসে তেমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে না পারলেও খান্দানের উত্তরাধিকার সূত্রে ইলমের অধিকারী ছিলেন।[৩০৬] তাঁর জ্ঞানার্জনের সময়টা এমন ছিল তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ ইসলামী উলুম বিতরণের সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। মসজিদে নববীর প্রায় প্রতিটি স্তম্ভের নিকট হাদীসের দারস চলতো। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ.) উপযুক্ত সময়ে সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। তাঁর উস্তাযদের তালিকা দেখলেই অনুধাবন করা যায় তাঁর জ্ঞান-গরীমা কেমন হতে পারে। তাঁর উস্তাযদের মধ্য থেকে বিশজনের একটি তালিকা পেশ করা হলো:

১। আবু উসমান রবীয়া ইব্ন আবদুর রহমান আর-রায় আল-মাদানী (রহ.)

২। নাফি মাওলা আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রহ.)

৩। মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবাইদুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন শিহাব যুহরী আল-কুরাইশী (রহ.)

৪। জাফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল-হাশেমী আল-মাদানী (রহ.)

৫। ইবরাহীম ইব্ন আবু আবলা মুকাদ্দেসী (রহ.)

৬। ইবরাহীম ইব্ন উকবাহ আসাদী আল-মাদানী (রহ.)

৭। ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু তালহা (রহ.)

৮। ইসমাঈল ইব্ন আবু হাকীমে আল-মাদানী (রহ.)

৯। ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাদ আল-মাদানী (রহ.)

১০। আইয়ুব ইব্ন হাবীবা আল-মাদানী (রহ.)

১১। সওর ইব্ন যায়িদ আল-মাদানী (রহ.)

১২। যায়িদ ইব্ন আসলাম আল-মাদানী (রহ.)

---

৩০৬. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২৩

১৩। সালিম ইব্‌ন আবু উমাইয়া আল-মাদানী (রহ.)

১৪। যায়িদ ইব্‌ন রাবাহ আল-মাদানী (রহ.)

১৫। সাঈদ ইব্‌ন ইসহাক আল-কুযায়ী আল-মাদানী (রহ.)

১৬। সালমা ইব্‌ন সাফওয়ান আনসারী আল-মাদানী (রহ.)

১৭। সাফওয়ান ইব্‌ন সুলাইমান আল-মাদানী (রহ.)

১৮। শরীক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-মাদানী (রহ.)

১৯। মুসা ইব্‌ন উকবা আল-মাদানী (রহ.)

২০। আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর সিদ্দিক আল-মাদানী (রহ.)

ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ.) জ্ঞান চর্চার পরিবেশে বেড়ে উঠেন। তাঁর ঘরে ও বাইরে আলিমদের সমাবেশ ছিল নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার। মদীনা ছিল ইসলামী উলুমের কেন্দ্র ভূমি। তাবেয়ী ও তাবি-তাবেয়ীদের মধ্য হতে বহু জ্ঞানী-গুণীগণ মদীনায় অবস্থান করতেন এবং জ্ঞান বিতরণে তাঁরা নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ.) মদীনায় অবস্থানরত জ্ঞানী-গুণীদের মজলিসে বসে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। তিনি হজ্জ ব্যতীত কোথাও সফর করেননি। তাঁর হৃদয়ে ছিল মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা। তিনি মদীনার সকল জ্ঞান তাঁর হৃদয়ে সঞ্চিত করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই ইসলামী উলুম অর্জনে সচেষ্ট হন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

اني كنت اتي نافعا و انا غلام حديث السن و معي غلام فينزل فيحدثي-

“আমি নাফি (রহ.)-এর কাছে যেতাম অথচ তখন আমি বালক। আমার বয়স কম। তাঁর নিকট যেতে একজন গোলাম আমাকে সাহায্য করতো। নাফি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন।[৩০৭]

বহু বছর তিনি ইলমে ও হাদীসের জ্ঞানার্জনে নিমগ্ন ছিলেন। যার কারণে তাকে عالم المدينة উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ইলমে কিরাআত শিক্ষা করেন আবু রদীম নাফি ইব্‌ন আবদুর

৩০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

রহমান হতে।[৩০৮] তিনি হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন আবু সুহায়ল নাফি ও নাফি ইব্ন হরমুখ আদ - দায়লামীর নিকট থেকে। নাফি ইব্ন হরমুয ত্রিশ বছর আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা)-এর সোহবতে নিয়োজিত ছিলেন। নাফি (রহ.) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর দারসে বসতেন। ইমাম মালিক (রহ.) বলতেন, ‘‘আমি নাফি হতে আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.)-এর হাদীস শোনার পর অন্য কারও নিকট হতে এর সমর্থন শোনার কোনো তোয়াক্কা করতাম না।’’[৩০৯]

ইমাম মালিক (রহ) এর হাদীসের আরেকজন উস্তায হলেন, ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবাইদুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন শিহাব যুহরী আল-কুরাইশী (রহ.)।[৩১০] ইমাম মালিক (রহ.) একদা তাঁর উস্তায রবীয়াতুর রায় (রহ.)-এর সাথে ইমাম যুহরীর (রহ.) হাদীসের দারসে অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন ইমাম যুহরী (রহ.) ৪০টি হাদীসে বর্ণনা করেন। পরদিন উস্তাযসহ তার দারসে তিনি উপস্থিত হন। দারসের শুরুতে ইমাম যুহরী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, কিতাব উপস্থিত কর, আমি তা দেখে বর্ণনা করি আর গতকাল আমি যা বর্ণনা করেছিলাম এর দ্বারা তোমাদের কী উপকার হয়েছে তা লক্ষ্য করি। এ কথা শুনার পর ইমাম রবীয়াতুর রায় বললেন, “এ মজলিসে এমন ব্যক্তি রয়েছে যে গতকালের সকল হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিতে সক্ষম।” ইমাম যুহরী প্রশ্ন করলেন, ‘‘কে সেই ব্যক্তি ?’’ রবীয়া বললেন, ‘‘সেই ব্যক্তি ইব্ন আমীর।’’ ইমাম যুহরী তাকে শুনাতে বললে ইমাম মালিক (রহ.) ৪০ টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দেন। এতে ইমাম যুহরী (রহ.) বিস্মিত হন এবং বলেন, ‘‘ আমার ধারণা ছিল এই ৪০টি হাদীস আমি ব্যতীত অন্য কারো স্মরণ নাই।’’[৩১১]

ইমাম মালিক (রহ.) হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন মদীনার এ মসজিদের স্তম্ভগুলোর নিকট অনেককে বলতে শুনেছি, قال (ص) رسول الله قال رسول الله (ص) রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন । কিন্তু

---

৩০৮. প্রাগুক্ত

৩০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩১০. প্রাগুক্ত

৩১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

আমি তাদের কারো মজলিসে বসি নাই। তিনি আরো বলতেন, মদীনার এমন কিছু লোক ছিল তারা যাদের নিকট হাদীস শিক্ষা করতো আমি তাদের নিকট হাদীস শিক্ষা করিনি। কেননা হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা অজ্ঞাতসারে মিথ্যা বলতেন এবং হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতেন না। আবার কেউ কেউ একেবার অজ্ঞ ছিলেন।[৩১২]

তিনি আরো বলতেন, "মদীনায় এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা বৃষ্টির জন্য দোয়া করলে তাঁদের দোয়ার বরকতে বৃষ্টি হতো। অনেক হাদীস ও মাসায়িল তাঁরা শুনাইতেন। কিন্তু আমি তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কারণ ফতওয়ার প্রয়োজন তাকওয়া, ইলম ও জ্ঞানের পরিপক্বতার।" তিনি আরো বলতেন, "আমি এ শহরের অনেক দীনদার লোক হতে হাদীস গ্রহণ করিনি। কারণ, তারা যা বলতেন তা নিজে বুঝতেন না।"[৩১৩] ইমাম মালিক (রহ.) সারা জীবন মদীনায় কাটিয়েছেন, হজ্জ ছাড়া তিনি কখনো মদীনার বাইরে যেতেন না। তিনি যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারাও প্রায় সবাই মদীনার অধিবাসী ছিলেন। আর হাতে গুনা যে কজন মদীনার বাইরের তার শায়খ রয়েছেন তারা মদীনায় আসলে তাদের থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন। তিনি ইরাকবাসীদের নিকট থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমাদের শায়খগণ তাঁদের শায়খদের থেকে রেওয়ায়েত করেননি তাই আমরাও পরবর্তীগণ তাঁদের পরবর্তীদের থেকে রেওয়াত করি না।"[৩১৪] ইমাম মালিক (রহ.) বয়োবৃদ্ধদের থেকে হাদীসে বর্ণনা করেননি। কেননা বয়সের কারণে তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করাকে তিনি ত্রুটি মনে করতেন। ইমাম মালিক (রহ.) হাদীস গ্রহণে সতর্কতার কারণে তিনি যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁরা নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক বলে গণ্য হতেন। ইয়াহিয়া ইব্ন মুয়ীন বলেন, আমরা ইমাম মালিকের সম্মুখে কী? আমরা তাঁর পদচিহ্নের অনুসরণকারী মাত্র। যখনই কোনো শায়খের নাম আমাদের সামনে আসে তখন আমরা তা অনুসন্ধান করে দেখি যে, ইমাম মালিক

---

৩১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩১৩. প্রাগুক্ত

৩১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

(রহ.) সেই রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন কি না ? যদি তিনি গ্রহণ না করে থাকেন তবে আমরাও তার থেকে হাদীস গ্রহণ করি না।[৩১৫]

ইমাম মালিক (রহ) এর দারসের মজলিস ছিল আদর্শ মজলিস। তার মজলিস থাকতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি ময়লার টুকরোও বিছানায় পাওয়া যেতো না। মূল্যবান বিছানা ও কার্পেট দিয়ে সুসজ্জিত থাকতো তাঁর মজলিস। ছাত্রদের জন্য মজলিসের বিভিন্ন স্থানে পাখা রাখা হতো। আগুরা কাঠ ও লোবান জ্বালিয়ে ক্লাসকে সুগন্ধময় করা হতো। হাদীস লিখানোর পূর্বে ইমাম মালেক (রহ.) অযু অথবা গোসল করে অতি মূল্যবান ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে মজলিসে আগমন করতেন। তিনি আগমন করার সাথে সাথে ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতো। সবাই মস্তকাবনত হয়ে নীরবতা অবলম্বন করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর ছাত্র ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, "মজলিসে শব্দ হবে, এই ভয়ে আমরা কিতাবের পাতা উল্টাতেও সাবধানতা অবলম্বন করতাম। পুরো মজলিস তাঁর অসাধারণ গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এক অনন্য রূপ লাভ করতো। পর্যটকদের আগমন, ছাত্রদের শিষ্টাচারপূর্ণ অবস্থান, সওয়ারীর সমাগমে তাঁর দারসী মজলিসকে শাহী দরবার বলে মনে হতো।"[৩১৬] ইমাম মালিক (রহ) এর দারসের নিয়ম ছিল তিনি ফজরের সালাত আদায় করে মুসাল্লায় বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত ওয়াজীফা ও দোয়া পাঠে মশগুল থাকতেন। অতঃপর ছাত্রদের সমাগম হলে তাদের দিকে ফিরে দু' একজনের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের তাঁর নিকটে বসাতেন। অতঃপর তিনি সুষ্ঠুভাবে আস্তে আস্তে হাদীস লিখাতেন। তাঁর দারসের একটি নীতি ছিল তিনি নিজে পাঠ করতেন না, তাঁর শাগরিদ পাঠ করতেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সকলকে এক নজরে দেখতেন। ধনী- দরিদ্র সকলেই তাঁর চোখে সমান ছিল। তিনি খলীফা অথবা খলীফার সন্তানদের আলাদা কোনো সুযোগ দেননি। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ও জ্ঞান-গরিমার সংবাদ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইসলামী উলুম অর্জনের জন্য জ্ঞান পিপাসুগণ মদীনায় ছুটে আসে।

---

৩১৫. *প্রাগুক্ত*

৩১৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

মক্কা, আদন, তায়িফ, দামিশক, বৈরুত , তরমুস, হাবল , জেরুজালেম, জর্দান, বাগদাদ, বসরা, কূফা, হামাদান, কিরমান, মাদায়েন, নিশাপুর, কুর্দিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ, হিরাত, খাওয়ারিজম, বলখ, মিশর, তিউনিসিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, মরক্কো, কারতায়া, ইতালি তথা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ এ তিন মহাদেশ থেকে শিক্ষার্থীগণ তাঁর নিকট ছুটে আসে। তাঁর শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৩০০-এর উপরে। এদের মধ্য থেকে ৪/৫ জন ব্যতিরেকে প্রত্যেহৈ যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে ২০ জনের একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

১। আবু জাফর আল-মানসুর

২। আল-মাহদী

৩। হারুনুর রশীদ

৪। মুহাম্মদ আমীন

৫। আব্দুল্লাহ মামুন

উপর্যুক্ত পাঁচজনই খিলাফতের মসনদ অলংকৃত করেন।

৬। হাসান ইব্ন মুহাল্লাব আশ-শায়বানী

তিনি খুরাসানের আমীর ছিলেন।

৭। ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী

৮। হিশাম ইব্ন উরওয়াহ

তাঁরা দুজন তাবেয়ী ছিলেন

৯। মুহাম্মদ ইব্ন আজলান

১০। ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান

১১। সুলাইমান আল-আমাশ

১২। ইয়াহিয়া ইব্ন বুখাইর

তারা চারজন হাদীসের ইমাম ছিলেন।

১৩। ইমাম শাফেয়ী

১৪। ইমাম আবু ইউসুফ

১৫। ইমাম মুহাম্মদ

তারা তিনজন ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন।

১৬। ইবরাহীম ইব্‌ন ইসহাক

১৭। আইয়ুব ইব্‌ন শুআইব

তারা দু'জন বিচারপতি ছিলেন।

১৮। ইবরাহীম ইব্‌ন আদহাম

১৯। বিশর ইব্‌ন হারিস আয-যাহীদ

তাঁরা দু'জন সুফী সাধক ছিলেন।

২০। আবুল আতাহিয়্যা

তিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন।

উল্লেখ্য, সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ এক উস্তাদের মাধ্যমে তাঁর ছাত্র ছিলেন।[৩১৭]

ইমাম মালিক (রহ.) বাজরোষের শিকার হন। আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আল-মানসুরের দু:শাসনের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ নফসে যাকিয়্যা মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি তাঁকে সমর্থন করেন। তিনি ফতওয়াহ দিয়েছিলেন খিলাফাত মুহাম্মদ নফসে যাকিয়্যারই হক। ফলে মদীনার শাসক জাফর তাকে গ্রেফতার করে তার দরবারে নিয়ে যায়। অতঃপর তাঁর দেহ থেকে জামা খুলে তাঁকে ৭০টি বেত্রাঘাত করা হয় এবং উটের উপর বসিয়ে মদীনার অলি- গলিতে ঘোরানো হয়। রক্তমাখা পোশাকসহ তিনি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হন এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাবকে যখন বেত্রাঘাত করা হয়েছিল তখন তিনি মসজিদে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন।"[৩১৮]

খলীফা আবু জাফর আল-মানসুর জাফরের বাড়াবাড়ির কথা জানতে পেরে তাকে গাধার পিঠে সওয়ার করিয়ে বাগদাদে প্রত্যাহার করেন। আল-মানসুর মদীনায় এসে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং জাফরকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু ইমাম মালিক

---

৩১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

৩১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

(রহ.) জাফরকে ক্ষমা করে দেন এবং খলীফাকে অনুরোধ করেন যাতে তাকে কোনো শাস্তি দেয়া না হয়।

ইমাম মালিক (রহ.) দীর্ঘ ও ভারী দেহের অধিকারী ছিলেন। প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, ঘন শশ্রু, টাক মাথা ও বড় কান বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি গোফ বেশি ছোট করতেন না। তিনি মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। রাজা - বাদশাহরা যেসব জামা ব্যবহার করতেন তাই তিনি ব্যবহার করতেন। তিনি সুগন্ধি পছন্দ করতেন। তিনি যে রাস্তায় দিয়ে গমন করতেন সে রাস্তা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুগন্ধময় থাকতো। তিনি আংটি ব্যবহার করতেন। তিনি প্রচুর দান-সাদাকা করতেন। একবার খলীফা আল-মানসুর তাঁকে ২৫ লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে মদীনার দরিদ্রদের মধ্যে তা বিতরণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর শিষ্য ছিলেন। একবার ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাঁর ঘোড়ার আস্তাবল দেখে কিছু ঘোড়ার প্রশংসা করেন। ইমাম মালিক (রহ.) শাফেয়ীকে (রহ.) আস্তাবলটি হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীকে (রহ.) প্রতি বছর ১১ হাজার দীনার সাহায্য প্রদান করতেন।[৩১৯] ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একবার তাঁর দরবারে আগমন করলে তিনি তার জন্য বিছানার উপর নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।[৩২০] তিনি রাসূলুলল্লাহ (স.) কে খুব ভালোবাসতেন। তিনি কখনো (হজ্জ ব্যতীত) মদীনার বাইরে যাননি। মদীনার গলিতে কখনও ঘোড়ার পিঠে অরোহণ করেননি। কেননা, মহানবী (স.) এই গলিতে হেঁটেছেন তাই তিনি কীভাবে এ গলিতে ঘোড়া হাকিয়ে যাবেন।

যাহাবী বলেছেন ইমাম মালেক (রহ.)-এর মধ্যে পাঁচটি অনন্য গুণ ছিল। যথা:

১। সুদীর্ঘ আয়ু ও উচ্চতম মসনদ।

২। প্রকৃষ্ট বুদ্ধি ও বিস্তৃত ইলম।

৩। তাঁর বিশ্বস্ততা ও মর্যাদার বিষয়ে উলামার ঐকমত্য।

৪। সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী।

---

৩১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৩২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৫। ফিক্‌হ ও ফতওয়ায় অসাধারণ দক্ষতা।[৩২১]

সুফিয়ান সাওরী বলতেন, "ইমাম মালিক অপেক্ষা রাবীগণের অবস্থার অধিক অনুসন্ধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন না।" ওহাব ইব্‌ন খালিদ বলেন, "মাশরিক ও মাগরিবে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস বিষয়ে ইমাম মালিক (রহ.) অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না।" ইয়াহিয়া ইব্‌ন মুয়ীন বলেন, "মালিক হাদীসের রাজ্যের বাদশাহ।" আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী বলেন, "ধরাপৃষ্ঠে ইমাম মালিক (রহ.) অপেক্ষা ইলমে হাদীসের বড় আমানতদার আর কেউ নেই।" ইমা শাফেয়ী (রহ.) বলতেন, হাদীস জগতে ইমাম মালিক (রহ.) নক্ষত্রের মতো।" একবার ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো কার হাদীস মুখস্থ করা যায়। উত্তরে তিনি বলেন, "মালিক ইব্‌ন আনাসের হাদীস।" ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, "মালিক (রহ.) এই উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ ছিলেন।"[৩২২]

তার রচনাবলি

১। মুয়াত্তা

২। রিসালাতু মালিক ইলার রশীদ

৩। আহকামুল কুরআন

৪। আল মদীনাতুল কুবরা

৫। রিসালাতু ইমাম মালিক ইলা ইব্‌ন মুতরিফ

৬। রিসালাতু ইমাম মালিক ইলা ইব্‌ন ওয়াহাব

৭। কিতাবুল আকিযিয়াহ

৮। কিতাবুল মানাসিক

৯। তাফসীরু গারীবিল কুরআন

১০। তাফসীরুল কুরআন

---

৩২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৩২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

১১। কিতাবুল মাসাইল

ফিকহে মালেকীর বৈশিষ্ট্য

১। ইমাম মালিক তার ফিকহের ভিত্তি রচনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসের উপর।

২। তিনি ওমর (রা.)-এর মতামতকে অতঃপর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.)-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩। অতঃপর মদীনাবাসী সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও শাফেয়ী মাযহাব

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রকৃত নাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস আশ-শাফেয়ী । তাঁর ছাত্র রবী ইব্‌ন সুলাইমান তাঁর বংশধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন, আবু ওসমান ইব্‌ন শাফী ইব্‌ন সায়িব ইব্‌ন উবাইদিল্লাহ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযিদ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মনাফ আল-কুরাইশী আল-মুত্তালিবী আল-হাশিমী (রহ.)। উপর্যুক্ত সায়িব ইব্‌ন উবাইদিল্লাহ (রা.) বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তার হাতে বনী হাশেমের ঝান্ডা ছিল। মুক্তিপণ আদায়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের বা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাইনি। তাঁর আকার-আকৃতি মহানবী (সা)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। শাফী ইব্‌ন সায়েব একবার তাঁর পিতার সাথে মহানবী (স.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁর মাতার নাম ফাতিমা বিনতু আব্দিল্লাহ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবি তালিব। তবে খতীব বাগদাদী ও কাযী আয়ায ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে ইযদ গোত্রের জনৈক মহিলা তাঁর মাতা।[৩২৩]

তিনি ১৫০ হিজরী সনে সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। দু'বছর বয়সে তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। এখানেই তিনি শৈশব ও কৈশোর কাটান।[৩২৪]

তাঁর জন্মের পরপরই পিতা ইন্তিকাল করেন। তিনি শৈশবেই ঘোড় সওয়ারী ও তীর নিঃক্ষেপে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে তিনি একটি পুস্তিকাও রচনা করেন যার নাম

---

৩২৩. মাওলানা মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮

৩২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮-২২৯; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২-১৪৩

‘ কিতাবুস সবক ওয়াররমী।’ এ বিষয়ে এটিই ছিল সর্বপ্রথম কিতাব।[৩২৫] মক্কা মুকাররামায় থাকাকালে তিনি প্রথমে মক্তবে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বনু হুযাইল গোত্র আরবী ভাষা ও কবিতায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইমাম আসমায়ী হুযাইল গোত্রের কবিতা তাঁর থেকে শুদ্ধ করে নিতেন। তাঁর চাচা মুহাম্মদ ইব্‌ন শাফী ও মুসলিম ইব্‌ন খালিদ যঞ্জী এর নিকট হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। একবার তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য মদীনায় গমন করেন এবং ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাসের (রহ.) নিকট মুয়াত্তা অধ্যয়ন করেন।[৩২৬] ইমাম মালিক (রহ.) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর খানার ব্যবস্থা তিনিই করতেন। সে সাথে বিভিন্ন সময় হাদিয়া প্রদান করতেন। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। স্বীয় উস্তাযের মৃত্যুর পর তিনি মক্কায় চলে আসেন। অতঃপর ইয়ামেনে একটি সরকারি চাকুরী নিয়ে তথায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি একটি গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়লে ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আশ-শায়বানীর হস্তক্ষেপে ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৩২৭] ইমাম মুহাম্মদ (রহ) তাঁকে অত্যন্ত মুহাব্বাত করতেন। এমনকি বিভিন্ন সময় তাঁকে আর্থিক সহায়তাও করতেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর ছাত্রদের লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ সংগ্রহ করেন। বাগদাদ থেকে ফেরার পথে স্বীয় উস্তায সম্পর্কে তিনি বলেন:

خرجت من بعداد و قد من علم محمد بن الحسن وقر بعير

“ইমাম মুহাম্মদ -এর ইলম থেকে এক উটের বোঝা পরিমাণ ইলম নিয়ে আমি বাগদাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করছি।”[৩২৮] ইমাম শাফেয়ী বলতেন, ‘‘ যদি ইমাম মুহাম্মদ না হতেন তবে ইলমী বিষয়ে আমার যবান খুলত না। ” তিনি আরো বলতেন, “মানুষ যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসানের মতো ফকীহ দেখতে পাবে না।”[৩২৯]

---

৩২৫. মাওলানা মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

৩২৬. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

৩২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

৩২৮. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৩২৯. মাওলানা মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বাগদাদ থেকে মক্কা মুকাররমায় আসেন। অতঃপর ইলমী সফরে হিজাজ ও বাগদাদ গমন করেন। এক পর্যায়ে মিশরে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৩০]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মক্কা, মদীনা বাগদাদসহ হিজায অঞ্চলের বহু খ্যাতিমান আলিমের নিকট হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। তাঁর উস্তাযদের মধ্য থেকে বিশজনের নাম নিম্নে পেশ করা হলো:

১। মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন শাফি (রহ.)

২। মুসলিম ইব্‌ন খালিদ যঞ্জী (রহ.)

৩। মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ.)

৪। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহ)

৫। ইব্রাহীম ইব্‌ন সাদ (রহ)

৬। সাঈদ ইব্‌ন সালিশ আল-কাররাহ (রহ.)

৭। ইসমাঈল ইব্‌ন উলাইয়্যা(রহ)

৮। হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল (রহ)

৯। ইব্রাহিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী ইয়াহিয়া (রহ.)

১০। ইসমাঈল ইব্‌ন জাফর (রহ.)

১১। আত্তাফ ইব্‌ন খালিদ মাখযুমী (রহ.)

১২। ইয়াহিয়া ইব্‌ন হাসসান (রহ.)

১৩। মারওয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া (রহ.)

১৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (রহ.)

১৫। ফুযাইল ইব্‌ন আয়ায (রহ.)

১৬। মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আশ- শায়বানী (রহ.)

১৭। দাউদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (রহ.)

---

৩৩০. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

১৮। আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মদ দারাওয়ারদী (রহ.)

১৯। মুতাররাফ ইব্‌ন মাযিন (রহ.)

২০। হিশাম ইব্‌ন ইউসুফ (রহ.)[৩৩১]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সারা জীবন ইলমের খেদমত করে গেছেন। তার মজলিস শুরু হতো ফজরের সালাতের পর থেকে। সূর্যোদয় পর্যন্ত ফিকহের আলোচনা চলতো। এরপর হাদীসের আলোচনা ।হাদীসের দারসের পর ওয়াজ মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। এরপর তর্ক-বিতর্কের ক্লাস চলতো। যোহরের সালাতের পর সাহিত্য, কবিতা, ব্যাকরণ তথা ভাষাগত আলোচনা চলতো। এরপর তিনি বিশ্রামের জন্য ঘরে চলে যেতেন। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকতেন। রাতকে তিনভাগ করে প্রথম ভাগে ঘুমাতেন, দ্বিতীয় ভাগে হাদীস ও ফিক্‌হী কিতাব রচনা করতেন আর তৃতীয় ভাগে কুরআন তেলাওয়াত ও নফল নামাযে কাটিয়ে দিতেন। এভাবে ফজর পর্যন্ত চলতে থাকতো।[৩৩২]

তিনি তাঁর ছাত্রদের খুবই স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর ছাত্র রবী ইব্‌ন সুলাইমানকে বলেন :

يا ربيع ! لو مكنني ان اطعمك العلم لا طعمتك

"হে রবী ! যদি তোমাকে ইলম খাইয়ে দেয়ার শক্তি থাকতো তবে আমি তাই করতাম।"[৩৩৩]

তিনি তাঁর ছাত্রদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) সম্পর্কে বলতেন। বাগদাদ থেকে আসার সময় আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল থেকে অধিক সরল মুত্তাকী ফকীহ এবং আলিম কাউকে রেখে আসিনি। তিনি আরোও বলেন, আমি দু' ব্যক্তি হতে অধিক বুদ্ধিমান আর কাউকে দেখিনি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.), সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ হাশেমী (রহ.)। তিনি তাঁর ছাত্র মুযনী সম্পর্কে বলতেন, "মুযনী আমর মাযহাবের সাহায্যকারী। রবী সম্পর্কে বলতেন, রবী আমার কিতাবের রাবী।"[৩৩৪]

তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিল। তাঁদের মধ্য থেকে বিশজনের একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হলো:

---

৩৩১. মাওলানা মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬-২৩৭

৩৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭

৩৩৩. মাওলানা মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

৩৩৪. *প্রাগুক্ত*

১। হাসান ইব্ন মুহাম্মদ যাফরানী বাগদাদী (রহ.)

২। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল আশ-শায়বানী (রহ.)

৩। আবু ছওর ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ বাগদাদী (রহ.)

৪। হুসাইন ইব্ন আলী কারাবিনী (রহ.)

৫। ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহিয়া মুযনী আল-মিশরী (রহ.)

৬। রবী ইব্ন সুলাইমান আল-মিশরী (রহ.)

৭। রবী ইব্ন সুলাইমান মুরাদী আল-মিশরী (রহ.)

৮। হারমালা ইব্ন ইয়াহিয়া আল-মিশরী (রহ.)

৯। ইউনুস ইব্ন আব্দিল আলা আল মিশরী (রহ)

১০। ইউসুফ ইব্ন ইয়াহিয়া বুওয়াইতী (রহ.)

১১। সুলাইমান ইব্ন দাউদ হাশেমী (রহ)

১২। আবু বকর আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইরী হুমাইদী মাক্কী (রহ)

১৩। ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির হিযাজী (রহ.)

১৪। ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ (রহ.)

১৫। আবু তাহির ইব্ন সিরাজ (রহ.)

১৬। আমর ইব্ন সাওয়াদ আজমিরী (রহ.)

১৭। আবুল ওয়ালিদ মুসা ইব্ন আবিল জারুদ মাক্কী (রহ.)

১৮। আবু উবাইদ (রহ.)

১৯। হারুন আইলী (রহ.)

২০। আহমাদ ইব্ন সিনান ওয়াসিতী (রহ.)

ইমাম শাফেয়ী (রহ) ২০৪ হিজরীতে রজব মাসের শেষ দিন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মিশরে ইন্তিকাল করেন। আর তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। মিশরের আমীর তার জানাযার

নামায পড়ান। অতঃপর তাঁকে মুকাত্তাম পাহড়ের নিকট কারাফায়ে ছোগরা নামক স্থানে সমাহিত করা হয়।[৩৩৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাবের উসূল ছিল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এ ছাড়া তিনি ইসতিসহারকে উসূল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপকহারে তাঁর মাযহাবে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করা হয়। তাঁর মাযহাবে মুরসাল হাদীসের উপর আমল পরিত্যাগ করা হয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মুসনাদে শাফিয়ী ও সুনানে শাফেয়ী নামে দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গুলো তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রণয়ন করেননি বরং তাঁর ছাত্ররা তাঁর থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি হাদীস রিওয়াতের নীতিমালা প্রণয়নে 'আল-উম্ম' রচনা করেন। সে সাথে সুন্নাহ সম্পর্কে আর-রিসালাহ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশ শায়বানী বলেন :

ان تكلم اصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي

"মুহাদ্দিসগণকে হাদীস সম্পর্কে কিছু বলতে হলে ইমাম শাফেয়ীর ভাষায় বলতে হবে।"[৩৩৬]

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) ও হাম্বলী মাযহাব

তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তাঁর প্রবর্তিত মাযহাবের নাম হাম্বলী মাযহাব। তিনি ১৬৪ হিজরী/৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরব বংশোদ্ভূত রবী'আ গোত্রের সাম্যগোত্র বনু শারবানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রথমে বসরার অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর তাঁর পিতামহ হাম্বল ইব্ন হিলালের সাথে লোকেরা মারব শহরে চলে আসে। তাঁর পিতামহ হাম্বল ইব্ন হিলাল বনু উমাইয়ার পক্ষ থেকে সারাখস এর ওয়ালী নিযুক্ত হন। তিনি আব্বাসীদের প্রাথমিক সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর পিতা মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল খুরাসানের সেনাবাহিনীর একজন ফৌজি কর্মচারী ছিলেন। ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর জন্মের তিন বছর পর তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল বাগদাদে কর্মরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। ইমাম আহমাদ (রহ.)

---

৩৩৫. মাওলানা মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯-২৯০

৩৩৬. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

উত্তরাধিকারসূত্রে বাগদাদে একটি ছোট্ট জায়গীর পেয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে থাকেন।[৩৩৭] ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ) বাগদাদে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ফিকহ ও হাদীসে অধ্যয়ন করেন। হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ১৭৯ হি./৬৭৯ খ্রি. ইরাক , হিজায, কূফা সফর করেন। অতঃপর বসরায় চার বার সফর করেন। ১৮৬ হিজরীতে সর্বপ্রথম তিনি বসরা সফর করেন অতঃপর ১৯০, ১৯৪ ও ২০০ হিজরী সনে তিনি তথায় গমন করেন। তিনি বহুবার মক্কা মুকাররামা সফর করেন। তিনি মদীনায়ও সফর করেন। ১৯৭ ও ১৯৮ হিজরী সনে তিনি মদীনা মুনাওয়ারা সফর করেন। পঞ্চম বার অর্থাৎ ১৯৮ হিজরীতে হজ্জ সম্পাদনের পর মদীনায় গমন করেন এবং ১৯৯ হিজরী পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি সানআ গমন করেন এবং খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আবদুর রাযযাকের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৩৩৮]

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) বহু উস্তাযের নিকট হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। বাগদাদে তিনি কাযী আবু ইউসুফ ইব্ন ইবরাহীমের নিকট হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম ইবরাহীম আন- নাখয়ী (রহ.)-এর শাগরিদ হুসায়ম ইব্ন বাশীরের দারসে অংশ নেন। সেখানে তিনি ১৭৯ হিজরী থেকে ১৮৩ হিজরী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।[৩৩৯] তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৩৪০] তিনি বহু উস্তাযের নিকট হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেছেন। নিম্নে তাঁর উস্তাযের মধ্য থেকে বিশ জনের একটি তালিকা পেশ করা হলো:

১। ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (রহ.)

২। হুসায়ম ইব্ন বাশীর (রহ.)

৩। ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়্যা (রহ.)

৪। হাম্মাদ ইব্ন খালিদ আল-খাইয়্যাত (রহ.)

---

৩৩৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯

৩৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৯

৩৩৯. *প্রাগুক্ত*

৩৪০. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৫। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহ.)

৬। আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (রহ.)

৭। ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ (রহ.)

৮। মানসুর ইব্‌ন সালমাহ আল-খুযায়ী (রহ.)

৯। মুজাফফর ইব্‌ন মুদারক (রহ.)

১০। ওসমান ইব্‌ন ওমর ইব্‌ন ফারীস (রহ.)

১১। আবু নযর হাশিম ইব্‌ন কাসিম (রহ.)

১২। আবু সাঈদ মাওলা বনী হাশিম (রহ.)

১৩। মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসিত (রহ.)

১৪। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু আলী (রহ.)

১৫। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.)

১৬। আবু দাউদ তায়ালিসী (রহ.)

১৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর গুণদর (রহ.)

১৮। আবু ওসমান (রহ.)

১৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরিস আশ-শাফেয়ী (রহ.)

২০। আবদুর রাযযাক (রহ.)[৩৪১]

তিনি আজীবন ইলমে দ্বীনের খিদমাত করেছেন। তাঁর যুগের তিনি শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেছে। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদান করা হলো:

১। সালিহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.)

২। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.)

৩। হাম্বল ইব্‌ন ইসহাক (রহ.)

৪। হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ (রহ.)

৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সাগানী (রহ.)

---

৩৪১. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৬। আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ দূরী (রহ.)

৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রহ.)

৮। মুনাদী (রহ.)

৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রহ.)

১০। মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহ.)

১১। আবু হাতিম রাযী (রহ.)

১২। আবু যুরআহ রাযী (রহ.)

১৩। আবু যুরআ দামেশকী (রহ.)

১৪। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ বাগাবী (রহ.)

১৫। আবু দাউদ সিজিস্তানী (রহ.)

১৬। আবুল কাসিম বাগাবী (রহ.)

১৭। মুহান্না ইব্‌ন ইয়াহিয়া আশ-শাফী (রহ.)[৩৪২]

মুতাযিলা মতবাদ ও ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর দৃঢ়তা

আব্বাসী খলীফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের শাসনামলে মুতাযিলা মতাদর্শকে রাষ্ট্রীয় ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। এমনকি এটি রাষ্ট্রীয় মতবাদে পরিণত হয়। মুতাযিলীগণ ‘কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বাণী’ বলে বিশ্বাস করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এমতটি প্রতিষ্ঠিত করতে তারা প্রচেষ্টা চালায়। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন, কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট নয়, কুরআন আল্লাহর চিরন্তন বাণী। একপর্যায়ে বিষয়টি খলীফা মামুন অবগত হন এবং ইমাম আহমদ (রহ.) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন নূহকে (রহ.) তাঁর দরবারে উপস্থিত করতে নির্দেশ প্রদান করেন । তারা উভয়ই যখন রাক্কা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন সংবাদ আসে খলীফা মামুন ইন্তিকাল করেছেন। অতঃপর ইমাম আহমাদ বাগদাদে ফিরে আসেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন নূহ পথিমধ্যে ইন্তিকাল করেন। এর পরপরই তাকে আবার বন্দী

৩৪২. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০১

করে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৩৪৩] নতুন খলীফা মুতাসিমও মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইমাম আহমদকে (রহ.) তাঁর দরবারে উপস্থিত করলে তিনি কুরআন সৃষ্ট মতবাদকে সরাসরি অস্বীকার করেন। এ কারণে তাঁর উপর নির্যাতনের খর্গ নেমে আসে। তাঁকে প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত করা হয় এবং কারাগারে প্রেরণ করা হয়। দু'বছর কারাভোগের পর তিনি নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় তিনি নিজ গৃহেই অবস্থান করতে থাকেন এবং শিক্ষাদানের বিরত থাকেন। খলীফা ওয়াসিকের শাসনামলে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে অল্প কয়েক দিন দারস প্রদান করে তা আবার বন্ধ করে দেন। এ সময় গৃহে অবস্থান করেন এবং নিরাপত্তার জন্য মাঝে মাঝে আত্মগোপন করেন। অতঃপর খলীফা মুতাওয়াকিকলের শাসনামলে আবার পাঠদানে মশগুল হয়ে যান। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) এর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করে। এমনকি খলীফা তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর পরিবারকে একটি বৃত্তিও প্রদান করে। ২৪১ হিজরীতে তিনি সামান্য রোগে আক্রান্ত হন। অতঃপর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বাগদাদের হারবিয়্যা অঞ্চলে শহীদদের কবরস্থান মাকাবিরুশ শুহাদায় তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৪৪]

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) হকের উপর অবিচল ও সুদৃঢ় ছিলেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত, তাকওয়াবান, ফকীহ ও মুহাদ্দিস। স্বীয় যুগের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ আলিম মনীষী। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুতাযিলা মতবাদের মুকাবিলা করেন এবং শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নানাবিধ নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে তাঁর উস্তায ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

خرجت من بغداد و ما خلقت فيها رجلا افضل ولا اعلم ولا او رع ولا اتقي من احمد بن جنبل رحمه الله تعالي -

৩৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৯

৩৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০০

‘‘আমি বাগদাদে আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)-এর চেয়ে মর্যাদাশীল অধিক জ্ঞানী, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও অধিক মুত্তাকী আর কাউকে পাইনি।’’[৩৪৫]

তাঁর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)-এর উসূল ছিল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে মাস’আলা ইসতিম্বাত করা। তিনি হাদীস ও সুন্নাহকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, “কোনো ব্যক্তি বিশেষের অভিমতের চেয়ে যঈফ-দুর্বল হাদীস আমার নিকট অধিক উত্তম।”[৩৪৬] এ মাযহাবে সাহাবায়ি কিরামের রায় ও ফতওয়াহকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ মাযহাবের মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন। হাম্বলীদের মতে কুরআনের শাব্দিক অর্থ ছাড়া কোনো পরোক্ষ বা রূপক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। এ মাযহাবের দ্বিতীয় ভিত্তি হাদীস বা সুন্নাহ। যে হাদীসের বর্ণনা ধারা রাসূলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তার উপর আমল করতে এ মাযহাব উৎসাহিত করে।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অমর কীর্তি তাঁর সংকলিত মুসনাদে ইমাম আহমদ। তিনি তাঁর সংগৃহীত ও মুখস্থ সাত লক্ষ হাদীস এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থমালা ইলমে হাদীসের অনন্য এক গ্রন্থ হিসেবে যুগ যুগ ধরে পঠিত হয়ে আসছে।

উপর্যুক্ত মাযহাবগুলোর মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। তাঁরা শুধু দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে মতভেদ করেছেন। চারটি মাযহাব একে অপরকে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে থাকে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীগণ এ চার মাযহাবকে স্বীকৃতি প্রদান করে। চারটি মাযহাবই সমভাবে মর্যাদার আসনে সমাসীন ও একইভাবে গ্রহণযোগ্য। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের যে কেউ চারটি মাযহাব থেকে যে কোন একটির প্রতি আনুগত্য করতে পারে। মাযহাব চতুষ্ঠয়ের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহনশীল।[৩৪৭]

---

৩৪৫ . *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৩৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৩৪৭ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কোন সুন্নী মুসলিম একটি মাযহাব গ্রহণ করলে তাকে নিষ্ঠার সাথে সে মাযহাবের অনুসরণ করা উচিত। একটি মাযহাবের অনুসারীর পক্ষে অন্য মাযহাবের সদস্যদের সাথে বৈরীভাব পোষণ করা সকল মাযহাবের নীতি অনুসারে নিষিদ্ধ। এই চার মাযহাবের যে কোন মাযহাবের অনুসারীকে মুকাল্লিদ বলা হয়।

আহলে হাদীস

এ চার মাযহাবের বাইরে সুন্নী মুসলমানদের আরেকটি উপদল রয়েছে- যারা কোন মাযহাব অনুসরণ করে না। তাদেরকে গাইরে মুকাল্লিদ বলা হয়। এরা আহলে হাদীস নামে সমধিক পরিচিত। এ পর্যায়ে আহলে হাদীস সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

১২৪৬ হিজরীতে ভারতবর্ষে আহলে হাদীসের উদ্ভব ঘটে। এরা তাকলীদ না করার দিক থেকে জমহুর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে ভিন্নমত পোষণ করে। ইসলামের মৌলিক আকাইদ বিষয়ে তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে একাত্ততা ঘোষণা করে। তবে শাখাগত মাসআলা মাসাঈলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করে যেমনিভাবে চার মাযহাবের ইমামগণ পরস্পর মতানৈক্য করে থাকেন।[৩৪৮] প্রথমে এদের কোন নাম ছিল না। মাযহাবী আলেমগণ যখন তাদেরকে ওয়াহাবী বলে সম্বোধন করতে থাকেন তখন তারা নিজেদেরকে মুহাম্মদী বলে ঘোষণা করে। অতঃপর মুহাম্মদী গাইরে মুকাল্লিদ ও সর্বশেষে আহলে হাদীস নাম ধারণ করে। এ দলটি মাযহাব গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করে না। এরা দ্বীনের ফরঈ-ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করে থাকে। এরা সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করার চেষ্টা করে। তারা তারাবীর নামায আট রাকা'আতের কথা বলে অথচ হযরত ওমর (রা.)-এর যামানা থেকে ২০ রাকা'আত তারাবী চলে আসছে এবং এখন পর্যন্ত মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববীতে তা জারী আছে।

---

৩৪৮ . মুফতী মিযানুর রহমান কাসেমী, *আহলে হাদীস যুগে যুগে* (ঢাকা: ফ্রেন্ডসবুক সেন্টার, ২০১৫ খ্রি.), ২য় সং., পৃ. ১৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীরাই সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে গরিষ্ট। মুসলিম উম্মাহর প্রায় ৯০ শতাংশ এ মতাদর্শে বিশ্বাসী। ভারত উপমহাদেশে এর সংখ্যা আরো বেশি। এর মধ্যে হানাফী মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যাই অগ্রগণ্য। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে শীআ, বাহাই ও কাদিয়ানী। এ পর্যায়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শ তোলে ধরা হবে। মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় দল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। এ পর্যায়ে এদের মৌলিক মতাদর্শসমূহ আলোচনা করা হবে। প্রথমে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের মতাদর্শসমূহ তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রধান মতাদর্শ হলো আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর সাদৃশ্য কোন কিছু নেই। আর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই।[৩৪৯] এ ক্ষেত্রে তাঁদের নিকট কুরআন ও হাদীস থেকে বহু প্রমাণাদি রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ-

"তিনিই আল্লাহ যিনি একক পরাক্রমশালী পরাক্রান্ত।"[৩৫০]

অন্যত্র এসেছে :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ-

"বলুন, তিনি আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়।"[৩৫১] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন :

وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ -

---

৩৪৯. ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আত্‌ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২, ৩৪

৩৫০. আল-কুরআন, ১৩ : ১৬

৩৫১. আল-কুরআন, ১১২: ০১

"আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু এক। আর আমরা তাঁরই আনুগত্যশীল।"[৩৫২]

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا -

"যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন প্রভু থাকতো, তাহলে অবশ্যই তাদের উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত।"[৩৫৩] আল্লাহর কেউ অংশীদার নেই, এ মর্মে সকল আসমানী গ্রন্থে প্রত্যাদেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে এতদসম্পর্কিত বহু যুক্তিসহ বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ -

"বলুন! আমার সালাত আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছু বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই, আমি তাঁর আদিষ্ট হয়েছি।"[৩৫৪] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا-

"আর বলুন। সকল প্রশংসা তাঁর যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, যার রাজত্বে কোন অংশীদার নেই, আর তিনি দুদর্শাগ্রস্তও হননি যাতে তাঁর সাহায্যকারী প্রয়োজন।"[৩৫৫] আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য কিছুই নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"কোন বস্তুই তাঁর সাদৃশ্যশীল নয়। তিনি সর্বশ্রুতা সর্বদ্রষ্টা।"[৩৫৬]

---

৩৫২. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৬

৩৫৩. আল-কুরআন, ২১ : ২২

৩৫৪. আল-কুরআন, ০৬ : ১৬২

৩৫৫. আল-কুরআন, ১৭ : ১১১

৩৫৬. আল-কুরআন, ৪২ : ১১

আল্লাহ অনাদি ও অনন্ত

আল্লাহ তা'আলা অনাদি যাঁর প্রথমত্বের কোন শুরু নেই। সেই সাথে তিনি অনন্ত যাঁর কোন অন্ত বা শেষ নেই। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা এমন এক মহান সত্ত্বা যাঁর শুরু ও শেষ নেই। তাঁর সত্ত্বা সব সময় ছিল। তিনিই সর্ব অনন্ত। এ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল হচ্ছে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-

"তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য তিনিই অদৃশ্য। তিনি সর্ব বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।"[৩৫৭]

উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমা ও হাদীসে রাসূলে দু'টি শব্দ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সেগুলো হলো الاول ও الإخر। এর অর্থ হচ্ছে এমন শুরু যার প্রারম্ভের কোন সীমা নেই। আর الاخر। দ্বারা এমন শেষকে বুঝায় যে, যার শেষত্বের পরিসীমা নেই। মোট কথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জাম'আতের বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলা প্রথম এবং শেষ, তবে তাঁর প্রথমত্ব ও শেষত্বের পরিসীমা নেই।

আল্লাহর বিনাশ ও ধ্বংস নেই

মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কোন ধ্বংস বা বিনাশ নেই। তিনি চিরঞ্জীব মহান সত্ত্বা- তার কোন ক্ষয় বা লয় নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

"সব কিছুই ধ্বংসশীল একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত।"[৩৫৮] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

৩৫৭. আল-কুরআন, ৫৭ : ০৩

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ – وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ-

"জগতের সব কিছুই ধ্বংসশীল শুধু আপনার মহিমান্বিত ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তাই স্থিতিশীল।"[৩৫৯]

মহান আল্লাহ চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনি চিরকাল আছেন ও থাকবেন। ক্ষয়, লয় ও ধ্বংস তার অস্তিত্বকে স্পর্শ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ-

"আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারবে না। [৩৬০]

আল্লাহ স্রষ্টা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা ও পুনরুত্থানকারী

ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। জগতে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর মাখলুক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ-

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, 'হও', তখন তা হয়ে যায়।"[৩৬১]

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন:

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ-

৩৫৮. আল-কুরআন, ২৮ : ৮৮

৩৫৯. আল-কুরআন, ৫৫ : ২৬-২৭

৩৬০ আল-কুরআন, ০২ : ২৫৫

৩৬১. আল-কুরআন, ২ : ১১৭

“আপনি বলুন! আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি একক পরাক্রমশালী।[৩৬২]

আল্লাহ তা’আলা জগতের সবকিছুর স্রষ্ঠা সে সাথে তিনি সবকিছুর নমুনা উদ্ভাবনকারী- আকৃতি দানকারী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ-

“তিনিই আল্লাহ। তিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী ও আকৃতি দানকারী।[৩৬৩]

উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহ তা’আলা শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন বরং তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যথার্থ আকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে যথাযোগ্য আকৃতি দিয়েই তাঁর সৃষ্টিকে প্রকাশ করেছেন। শুধু মাত্র মানুষের আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান নিয়ে, চিন্তা করলেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে নিম্লের আয়াতে কারীমা প্রণিধানযোগ্য:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ-

“আমি মানুষকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।”[৩৬৪]

আল্লাহ তা’আলা বিনা পরিশ্রমে তাঁর সকল মাখলুকের রিযিকদাতা। তিনি নিজ অনুগ্রহে এ বিশাল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতে তাঁর কোনরূপ কষ্ট, ক্লেশ ও পরিশ্রম হয় না। সকল সৃষ্টজীবের রিযিকের দায়িত্ব তাঁকে কেউ চাঁপিয়ে দেয়নি বরং তা তিনি নিজ করুণায় গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا-

“ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর নিকট ন্যস্ত।” [৩৬৫]

---

৩৬২. আল-কুরআন, ১৩ : ১৬

৩৬৩. আল-কুরআন, ৫৯ : ২৪

৩৬৪. আল-কুরআন, ৯৫ : ০৪

আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন ক্ষমতা ও অসীম শক্তির অধিকারী। সমগ্র জগতের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করা তার জন্য সামান্য ব্যাপার মাত্র। বিশাল জগতের রিযিক আঞ্জাম দিতে গিয়ে তাঁর সামান্যতম কষ্ট ক্লেশ হয় না। আর রিযিক বণ্টনে তিনি কোন প্রকার ত্রুটিও করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা, অধিক ক্ষমতাশালী, শক্তিধর।"[৩৬৬]

তিনি অন্য আয়াতে বলেন:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ-

"আপনি বলুন, আমি ঐ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যকারী স্থির করবো কি ? যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং তিনি সকলকে আহার দান করেন; তাঁকে কেউ আহার দেয় না।"[৩৬৭]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টি জীবের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি কোনরূপ ব্যতিক্রম করেন না- তাঁর বণ্টনে সামান্যতম ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয় না। মহান আল্লাহর সীমাহীন কুদরাতের নিকট এই দায়িত্বটি সামান্য থেকে সামান্যতর। এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে তাঁর কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ অনুভূত হয় না।

আল্লাহ মৃত্যুদাতা

আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা সে সঙ্গে তিনি মৃত্যু দাতাও। ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুর তিনিই মৃত্যু দান করেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

৩৬৫. আল-কুরআন, ১১ : ০৬

৩৬৬. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৮

৩৬৭. আল-কুরআন, ৬ : ১৪

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

"ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের রাজত্ব তারই জন্য, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৩৬৮] আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ হলো মৃত্যু অনিবার্য একটি বিষয়। সকল সৃষ্টজীবের মৃত্যু অবধারিত। আর এটি একমাত্র আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত।

আল্লাহ পুনরুত্থানকারী

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আরেকটা মতাদর্শ হলো আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানকারী।[৩৬৯] البعث বা পুনরুত্থান হচ্ছে মৃত্যুর পর মহাপ্রলয়ের দিন আবার জীবন ফিরে পাওয়া ও মহাবিচারের মখোমুখি হওয়া। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণীর মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটাবেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ-

"আর নিশ্চয়ই কিয়ামত অত্যাসন্ন। এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যারা কবরে রয়েছে তাদের পুনরুজ্জীবন দান করবেন।" [৩৭০] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ-

"আর তিনি এমন এক সত্ত্বা যিনি প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন অতঃপর দ্বিতীয়বার তাকে সৃষ্টি করবেন, আর এটা তার জন্য অতি সহজ।"[৩৭১]

---

৩৬৮. আল-কুরআন, ৫৭ : ০২

৩৬৯. ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত্‌ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত, পৃ.*

৩৭০. আল-কুরআন, ২২ : ০৭

৩৭১. আল-কুরআন, ৩০ : ২৭

বহু বিপদগামী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে। অথচ এটা অনিবার্য বিষয়, আর একাজটি আল্লাহ তা'আলার জন্য কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ জন্য তাঁর কোনরূপ কষ্ট ক্লেশ হবে না। পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের মতাদর্শ বাতিল করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ – وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ-

"আর তাঁরা বলে, আমাদের এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন আর আমরা পুনরুত্থিত হবো না, আর যদি আপনি দেখতে পেতেন ঐ অবস্থা যখন তাদেরকে তাদের প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, কসম আমাদের রবের! নিশ্চয়ই সত্য। অতঃপর (তিনি বলবেন) তোমরা তোমাদের কুফুরির কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।"[৩৭২]

প্রাণীর মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা তার পুররুত্থান ঘটাতে পরিপূর্ণ সক্ষম। এক্ষেত্রে তাঁর কোনরূপ কষ্ট ক্লেশ হবে না। কেননা, প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা সহজতর। আর আল্লাহর জন্য প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি কোনটিই কষ্টকর নয়। তাঁর জন্য সব কিছুই সহজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ-

"কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুজ্জীবিত হবে না। হে নবী! আপনি বলে দিন, তারা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে। আমার রবের শপথ! অবশ্যই তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকার্য সম্পর্কে অভিহিত হবে। আর এটা মহান আল্লাহর জন্য অতি সহজ।"[৩৭৩]

---

৩৭২. আল-কুরআন, ০৬ : ২৯-৩০

৩৭৩. আল-কুরআন, ৬৪ : ০৭

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীরা এসব দলীলের আলোকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনোরূপ কষ্ঠ ক্লেশ, ক্লান্তি ছাড়াই পুনরুত্থান ঘটাতে সক্ষম। এর বিপরীত আকীদা কুফুরীর শামিল।

আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যনির্ধারক

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্যতম মতাদর্শ হলো আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যনির্ধারক। এসম্পর্কে ইমাম ত্বহাবী বলেন:

خلق الخلق بعلمه وقدرلهم اقدارا وضرب لهم اجالا-

"আল্লাহ তা'আলা নিজ জ্ঞানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন আর তিনিই তাদের সময় (বয়স) নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"[৩৭৪]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাস অনুযায়ী তাকদীরে বিশ্বাস রাখা ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। এই বিশ্ব জাহানের ভালো মন্দ, আনন্দ বেদনা যাই ঘটুক না কেন- সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারেই ঘটে থাকে। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই ঘটে না। এ বিশ্বপরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য সুশৃঙ্খল নিয়ম ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ -

"আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।"[৩৭৫] অন্য এক আয়াতে এসেছে:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا-

"তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন।" [৩৭৬]

---

৩৭৪. ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আত্বত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

৩৭৫. আল-কুরআন, ৫৪ : ৪৯

৩৭৬. আল-কুরআন, ২৫ : ০২

আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান জগতের সকল স্থানে ব্যাপৃত। তিনি সৃষ্টির আগে ও পরের সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁর জ্ঞান সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়- তিনি সর্বাবস্থায় বর্তমান। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী তথা এতদুভয়ে যা কিছু অস্তিত্বশীল অথবা অস্তিত্বলাভ করবে সব কিছু সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। আর জগতের প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাপ তিনিই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ-

"প্রত্যেক নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা বাড়ে ও কমে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আর তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই রয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণ।[৩৭৭] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ-

"আমার নিকট রয়েছে প্রত্যেক জিনিসের ভান্ডার আর আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।"[৩৭৮]

মহান আল্লাহ সৃষ্টজীবের ভাগ্যলিপি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বহু আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এর কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে,"আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীবের ভাগ্যলিপি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন যখন তাঁর সিংহাসন পানির উপর স্থাপিত ছিল। যা কিছু ঘটবে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই।"

প্রতিটি বস্তুর পরিমাণ, সময়, কাল, হ্রাস, বৃদ্ধি জগত সৃষ্টির বহু কাল পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন জগতে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটবে সব বিষয়ে তিনি সুপরিজ্ঞাত। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাস অনুযায়ী তাকদীরে ঈমান রাখা ফরজ।

---

৩৭৭. আল-কুরআন, ১৩ : ০৮

৩৭৮. আল-কুরআন, ১৫ : ২১

তাকদীরের বিষয়াবলি পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা:

১. আল্লাহ তা'আলার একত্বে বিশ্বাস

২. আল্লাহ তা'আলার লিখনে বিশ্বাস

৩. আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বিশ্বাস

৪. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে বিশ্বাস

৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস

তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য বিশ্বাস। একে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। প্রতিটি সৃষ্টির নির্ধারিত একটি সময় রয়েছে তা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তার মৃত্যু অনিবার্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ-

"প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। অতঃপর যখন তার নির্ধারিত সময় আসবে তখন সে এক মুহূর্ত পিছু হটতে পারবে না এবং এক মুহূর্ত আগেও আসতে পারবে না।"[৩৭৯] আর তাকদীর এমন একটি বিষয় যার পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই রয়েছে। এটি একটি রহস্যও বটে। এ রহস্য আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল ও ফিরিশতাদেরও জানাননি।[৩৮০]

আল্লাহর নিকট কোন বস্তু গোপন নয়

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা এমন এক সত্ত্বা যাঁর নিকট বস্তুজগতের কোন কিছুই গোপন নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার বহু পূর্বেই জানতেন যে, কে কী করবে। সৃষ্টজগতের নিয়ম হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ফলাফল জানা যায় কিন্তু মহান আল্লাহর ইলম শুধু বর্তমান নয় ভূত ও ভবিষ্যত সবকিছুই তাঁর নিকট সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

৩৭৯. আল-কুরআন, ১০ : ৪৯

৩৮০. ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আত্বত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ -

"আল্লাহর নিকট আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই অস্পষ্ট বা গোপন নয়।"[৩৮১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -

"হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের কর্মের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও-আল্লাহ তা'আলা তার সবই জানেন এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তিনি জানেন। [৩৮২] আরেক আয়াতে তিনি বলেন:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ-

"আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন-যা তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন করো।[৩৮৩]

আল্লাহ সৎকাজের আদেশ দাতা এবং অসৎকাজের নিষেধকারী

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মতাদর্শ হলো, আল্লাহ সৎকাজের আদেশদাতা এবং অসৎকাজের নিষেধকারী। এ প্রসঙ্গে তাঁরা নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ

"আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে।"[৩৮৪]

---

৩৮১ . আল-কুরআন, ০৩ : ০৫

৩৮২ . আল-কুরআন, ০৩ : ২৯

৩৮৩ . আল-কুরআন, ২৪ : ২৯

৩৮৪ . আল-কুরআন, ১৩ : ৩৬

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা ন্যায় বিচার, সদাচার এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার আদেশ দিয়েছেন আর অসৎ অসঙ্গত ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।"[৩৮৫] মোট কথা আহলু সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। তাঁরা মনে করেন আল্লাহ তা'আলাই সৎকাজের আদেশ দানকারী ও অসৎ কাজের নিষেধকারী। আল্লাহ তা'য়ালা যদি এ রকম না হতেন তাহলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতো।

আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানকারী

হিদায়াত আল্লাহ তা'আলার হাতেই ন্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা দয়া ও অনুগ্রহ পূর্বক হিদায়াত দান করেন। মহান আল্লাহ হিদায়াতের মালিক। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

"আপনি বলুন, আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন ও নিজের দিকে তাকে পথ নির্দেশ করেন যে তাঁর অভিমুখী হয়।[৩৮৬]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ -

---

৩৮৫. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

৩৮৬. আল-কুরআন, ১৩ : ২৭

“আল্লাহ তা‘আলা যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা কি মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নয়?”[৩৮৭] অন্য এক আয়াতে এসেছে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

“সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য যিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন আর আল্লাহ যদি আমাদের পথ না দেখাতেন তাহলে আমরা পথ প্রাপ্ত হতাম না।”[৩৮৮] অন্যত্র তিনি ইরশাদ বলেন:

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا-

“যাকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, (হে নবী!) আপনি তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক বা অভিভাবক পাবেন না।”[৩৮৯]

উপর্যুক্ত আয়াতের দলীল পেশ করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীরা তাদের মতামত সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীরা এও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা’য়ালা যেমন হিদায়াত দানকারী তেমনি তিনি আশ্রয় ও নিরাপত্তা দানকারী। আল্লাহ যদি কাউকে আশ্রয় ও নিরাপত্তাদান করেন তাহলে পৃথিবীর তাবৎ শক্তি তার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তা’আলার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় ও অনিবার্য

আহলসু সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত মনে করে আল্লাহ তা’য়ালার সিদ্ধান্ত আনিবার্য ও অপরিবর্তনীয়। তাঁর সিদ্ধান্ত কেউ রদ করতে পারবে না। তাঁর কাজের উপর কেউ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম ত্বহাবী (রহ.) বলেন:

لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره-

“আল্লাহ তা’য়ালার সিদ্ধান্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারেন না। তাঁর হুকুমকে প্রলম্বিত করতে পারে না। আর তাঁর কাজের উপর কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।[৩৯০]

---

৩৮৭. আল-কুরআন, ৩৯ : ৩৭

৩৮৮. আল-কুরআন, ০৭ : ৪৩

৩৮৯. আল-কুরআন, ১৮ : ১৭

আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ কেউ নেই

মহান আল্লাহ সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষতার উর্ধ্বে। তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্ঠা, সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তাঁর সমকক্ষ হওয়া তার কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। সকল সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ-

"তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই"[৩৯১] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন:

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

"তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বানিয়ো না"[৩৯২]

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বজগৎ এবং তাতে যা কিছু আছে সব কিছুর স্রষ্টা। তাঁর সমকক্ষ হওয়া সৃষ্টির কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও সিফাতে কারো কোনোরূপ অংশীদারিত্ব নেই। তিনি সুমহান সত্তা, তার শক্তিমত্তা ও বহুবিদ গুণাবলি শুধু মাত্র তারই-এখানে কারো অনুপ্রবেশ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সকল গুণের আধার, সত্তাগত ভাবেই তিনি নিজ গুণাবলির অধিকারী। তিনি কোন গুণ কারো কাছ থেকে পাননি বরং তিনি তাঁর সৃষ্টিকে বহু গুণ দান করেছেন। তাই তার গুণাবলির সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর তুলনা করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে ইমাম ত্বহাবী (রহ.) বলেন:

ومن وصف الله تعالى بمعنى من معانى البشر فقد كفر-

"যে ব্যাক্তি মানবীয় বিশেষণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত করবে সে কাফির হয়ে যাবে।"[৩৯৩] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

---

৩৯০ . ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত্ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

৩৯১ . আল-কুরআন, ১১২ : ৪

৩৯২ . আল-কুরআন, ০২ : ২২

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -

"তাঁর সাদৃশ্য কোন বস্তু নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"[৩৯৪]

আল্লাহ্ তা'আলাকে দর্শন সম্পর্কিত মতাদর্শ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে জান্নাতবাসীরা দর্শন লাভ করে ধন্য হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ – إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ-

"ঐ দিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল ও সজীব হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাতে থাকবে।" [৩৯৫]

এ সম্পর্কে মহানবী (স.)-এর নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر-

"নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুকে (জান্নাতে) দেখতে পাবে, যেমনিভাবে পূর্ণিমার রাতে তোমরা চাঁদ দেখতে পাও।"[৩৯৬]

মোটকথা, কিয়ামতের দিন ও জান্নাতে সকল মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে হবে। তবে দুনিয়াতে আল্লাহকে চর্মচক্ষে অবলোকন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাহর গুণাবলির উপর বিশ্বাস

আল্লাহর তা'আলার বহু গুণ রয়েছে এগুলোর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি অস্বীকার করা যাবে না, আবার আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের সাথে তুলনা করাও বৈধ নয়। তিনি সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সাথে সৃষ্টির কোন তুলনা হতে পারে না। ফলে আল্লাহর নিকট যে প্রার্থনা করা হয় তা মানুষের কাছে করা যাবে না। আল্লাহ এক, একক। তাঁর

---

৩৯৩. ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আত্ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

৩৯৪. আল-কুরআন, ৪২:১১

৩৯৫. আল-কুরআন, ৭৫ : ২২-২৩

৩৯৬. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ০১, হা. ২৭৭

রবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, নামসমূহ এবং গুণসমূহে কোন শরীক নেই। তিনি সকল সৃষ্টির রব এবং যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনিই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ তোমরা তাকে সে নামে ডাক।"[৩৯৭]

ইবাদত হবে একমাত্র মহান আল্লাহর

মহান আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি, নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক। তিনিই এ জগত এবং এখানে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং সৃষ্টির প্রধান কাজ হচ্ছে তাঁর নিদের্শ পালন করা। ইবাদত করার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা। বিপদে-আপদে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। দু'আ, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা, ভরসা, ভয়-ভীতি, আশা, ভালোবাসা এবং সকল প্রকার ইবাদত তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। মোট কথা ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।"[৩৯৮] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মানুষ, তোমরা মহান আল্লাহর ইবাদত করো যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের সৃষ্টি করেছেন, আশা করা যায় তোমরা যাবতীয় সংকট থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। তিনিই সে মহান সত্ত্বা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা বানালেন, আকাশকে

---

৩৯৭. আল-কুরআন, ০৭ : ১৮০

৩৯৮. আল-কুরআন, ০১ : ০৪

বানালেন ছাদ এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন, তার সাহায্যে তিনি নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন, অতঃপর তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করো না।"[৩৯৯]

কেউ যদি এসব অন্য কারো জন্য করে থাকে-তাহলে তা শিরক। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ–

আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, ভয়, আশা ও ভালোবাসা সহকারে তাঁর ইবাদাত করা। শুধু ভয় অথবা আশা অথবা ভালোবাসা সহকারে তাঁর ইবাদাত করা বৈধ নয়। উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় ইবাদাতের মধ্যে আবশ্যক ভাবেই থাকতে হবে।[৪০০]

গায়েবের বিষয়াবলি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন,আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে-এটা বিশ্বাস করা কুফুরী, তবে আল্লাহ তা'আলা গায়েব সংক্রান্ত কোনো কোনো বিষয় তাঁর নবী ও রাসূলকে জানিয়েছেন।[৪০১]

৩৯৯. আল-কুরআন, ০২: ২১-২২

৪০০. ড. নাসের ইবন আবুল করীম আল-আকল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪০১. *প্রাগুক্ত*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবী ও রাসূল (আ.) সম্পর্কিত মতাদর্শ

النبى শব্দটি আরবী। যা ن-ب-ى মাদ্দা থেকে উৎকলিত। এর অর্থ খবর দেওয়া, সুসংবাদ দেওয়া, আবার এটি যদি ن-ب-ء মাদ্দা থেকে আসে তাহলে এর অর্থ হয়- উচ্চ হওয়া, মর্যাদাবান হওয়া।[৪০২]পরিভাষায় বলা হয়, যাকে পূর্ববর্তী রাসূলের উপর অবতারিত কিতাব অনুসারে দ্বীনের দাওয়াত সৃষ্টির কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনে শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহারে একথা সুস্পষ্ট যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সংবাদ প্রদানের অর্থেই নবী বলা হয়।[৪০৩] অন্যদিকে رسول শব্দটি ر - س- ل মাদ্দা থেকে উৎকলিত। رسول শব্দটির অর্থ সংবাদ বাহক, দূত, প্রেরিত পুরুষ । পরিভাষায় বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নবী হিসেবে নির্বাচন করার পর, আসমানী কিতাব দিয়ে সৃষ্টির নিকট তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনিই রাসূল। নবী ও রাসূলের পারিভার্ষিক অর্থ সম্পর্কে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, "নবী হচ্ছে যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত কল্যাণ অকল্যাণ, শুভ অশুভ বিভিন্ন কর্মের পথ ও পরিণতি সম্পর্কে সকল সংবাদ মানুষকে জানান, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষদেরকে সংবাদ দান করেন। আর রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বার্তা বা শিক্ষা আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে মানুষদের কাছে পৌঁছে দেন।"[৪০৪] অতএব, একথা বলা যায় যে, নবী ও রাসূলগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মনোনীত বান্দা। যারা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সমকালীন মানুষদের শিক্ষা দান করেছেন, যে জ্ঞান কোনো সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। নবী ও রাসূলের মধ্যে শরয়ী কোন পার্থক্য আছে কিনা এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । যিনি নবী তিনি রাসূল আবার যিনি রাসূল তিনি নবীও। তবে অধিকাংশ আলিম মতপ্রকাশ করেছেন যে, শব্দ দুটির পারিভাষিক ও ব্যবহার পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষই নবী। আর ওহী প্রাপ্ত নবী

---

৪০২ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

৪০৩ . *প্রাগুক্ত*

৪০৪ . *প্রাগুক্ত*

যদি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন বিধানাবলী পেয়ে থাকেন এবং তা প্রচারের নির্দেশ পান তাহলে তিনি রাসূল। এ হিসেবে প্রত্যেক রাসূল নবী আর প্রত্যেক নবী রাসূল নন।[৪০৫]এ ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মূসা (আ.) ছিলেন রাসূল। তিনি নতুন শরীয়াত নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর আরো অনেক নবী এসেছেন। তাঁরা নতুন কোনো বিধান প্রচার করেন নি বরং মূসা (আ.)-এর আনিত বিধানাবলীই প্রচার করেছেন। সুতরাং তাঁরা নবী, রাসূল নন।[৪০৬]

নবী -রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দা। নবুওয়াত সাধনা বলে অর্জন করা যায় না। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ -

"আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে থেকে রাসূল মনোনীত করেছেন।"[৪০৭]

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ-

আল্লাহ তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পন করবেন তা তিনিই ভাল জানেন।[৪০৮]

উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ এ বিষয়টি প্রমাণ করতে চান যে, নবুওয়াত সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র একান্ত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেউ চেষ্টা-সাধনা করে তা অর্জন করতে পারে না। নবী-রাসূলগণ চিরকাল রিসালাতের দায়িত্বে বহাল থাকেন। তাঁদের নিকট থেকে কখনও নবুওয়াত ও রিসালাত কেড়ে নেওয়া হয় না। আর এ পদে আসীন থাকা অবস্থায় তারা শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশই পালন করে থাকেন। তাঁরা মানুষ তাঁরা অতিমানব বা খোদা নন। খোদার পুত্র বা খোদার রূপান্তরও নন, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মানুষ। তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী অনুসারে জিন ও মানবজাতিকে হিদায়াতের জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত

---

৪০৫ . *প্রাগুক্ত.* পৃ. ২৮৮

৪০৬ . *প্রাগুক্ত*

৪০৭ . আল-কুরআন, ২২ : ৭৫

৪০৮ . আল-কুরআন, ০৬ : ১২৪

হয়েছেন।[৪০৯] নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا – أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا -

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফুরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে আমরা কতকের প্রতি ঈমান রাখি এবং কতকের প্রতি ঈমান রাখি না, আর তারা এর মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারা প্রকৃত পক্ষে কাফের।" [৪১০]

নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বাণী হুবহু মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের কোন ক্রুটি বিচ্যুতি হয়নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ -

"তাঁরা আল্লাহর বাণী প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করতো আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতো না।[৪১১]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে, প্রত্যেক জাতির নিকট নবী অথবা রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। এমন কোনো জাতি নেই যার নিকট নবী রাসূল প্রেরণ করা হয়নি। এ সম্পর্কে তাদের দলীল হচ্ছে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"প্রত্যেক জাতিতেই সতর্ককারী প্রেরণকরা হয়েছে।"[৪১২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

৪০৯. মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৪১০. আল-কুরআন, ০৪ : ১৫০ - ১৫১

৪১১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৯

৪১২. আল-কুরআন, ৩৫ :২৪

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন রাসূল। আর যখন কোনো জাতির রাসূল তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তখন তাদের মধ্যে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ফয়সালা দান করা হয়েছে, এবং জুলুম করা হয়নি।"[৪১৩]

নবীগণের সংখ্যা কত তা আল্লাহ তা'আলাই সুপরিজ্ঞাত। সর্বপ্রথম নবী আদম (আ.) আর সর্বশেষে নবী মুহাম্মাদ (স.)। এঁদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

"আর আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেছি। আর কারো কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেনি।"[৪১৪] প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীসে নবীগণের সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তবে এসব বর্ণিত হাদীসে সংখ্যার বিশাল তারতম্য রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিস খাবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা আকীদা বিষয়ক সিদ্ধান্তে নির্ভর করার বিপক্ষে। তাই তারা এর সঠিক সংখ্যা আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেওয়া উত্তম মনে করেন। এ সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, "উত্তম এই যে, নবীগণের সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না করা। কারণ খাবারুল ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীসের উপরে আকীদার বিষয়ে নির্ভর করা যায় না। বরং জরুরী এই যে, আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে সাধারণভাবে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা। ফিরিশতাগণের সংখ্যা, কিতাব সমূহের সংখ্যা, নবীগণের সংখ্যা, রাসূলগণের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ না করা।"[৪১৫] পবিত্র কুরআনে পঁচিশ জন নবীর নাম এসেছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এদেরকে নবী হিসেবে অকুণ্ঠ বিশ্বাস করে। তাঁরা হচ্ছেন, আদম (আ.), ইদ্রিস (আ.), নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালিহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), লূত (আ.), ইসমাঈল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.), আইয়ুব (আ.), শুআইব (আ.), মূসা (আ.) , হারুন (আ.), ইউনুস (আ.), দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), ইলইয়াস (আ.), ইলইয়াসা (আ.), ফুলফিকহুল

---

৪১৩ . আল-কুরআন, ১০ : ৪৭

৪১৪ . আল-কুরআন, ৪০ : ৭৮

৪১৫ . মোল্লা আলী কারী, *শারহুল ফিকহিল আকবার* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রি.), ১ম প্রকাশ, পৃ. ১০১

(আ.), যাকারিয়া (আ.), ইয়াহিয়া (আ.), ঈসা (আ.) ও মুহাম্মদ (স.)।[৪১৬]এসকল নবী-রাসূল ছাড়াও পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে কিছু সংখ্যক মনীষীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : লুকমান, উযাইর, খিযির, ইউশা ইব্ন নূন প্রমূখ। তাদের ব্যাপারে যেহেতু পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে নবী অথবা রাসূল হিসেবে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই তাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের ব্যাপারে নিরব থাকেন। অর্থাৎ তারা নবী হতে পারেন, নাও হাতে পারেন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে তারা নিঃসন্দেহে নেককার মানুষ ছিলেন। নির্দিষ্টভাবে কুরআন ও হাদীসে যে সকল নবীর আলোচনা করা হয়েছে; তাদের উপর নির্দিষ্টভাবে ঈমান আনতে হবে। অন্যান্যদের উপর সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে।[৪১৭]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

"আমরা তাঁর রাসূলগণের মাঝে ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করি না।"[৪১৮]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আরো বিশ্বাস করে, নবীগণ মানুষ এবং পুরুষ ছিলেন। নারীদের মধ্য থেকে কেউ নবী-রাসূল হননি। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর বান্দা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

"তাদের রাসূলগণ তাদের বলতেন, আমরা তোমাদের মতই মানুষ কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।"[৪১৯] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

"আপনার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষ লোক ছাড়া কাউকে প্রেরণ করিনি, যাদেরকে আমি ওহী প্রদান করেছিলাম।"[৪২০] নবী -রাসূলদের দায়িত্ব ছিলো বোধগম্য ভাষায় তাঁর স্বজাতিকে

---

৪১৬ .ইসমাঈল ইব্ন উমর ইব্ন কাসীর, তাফসীরু কুরআনিল আযীম (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬ খ্রি.), ১ম প্রকাশ,খ. ১, পৃ. ৫৮৬

৪১৭ . ড. নাসের ইবন আবুল করীম আল-আকল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

৪১৮ . আল-কুরআন, ০২ : ২৮৫

৪১৯ . আল-কুরআন, ১৪ : ১১

৪২০ . আল-কুরআন, ১২ : ১০৯

পথ-প্রদর্শন করা। আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষি করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষি করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" [৪২১] আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে নবী রাসূলগণ অতি মানব ছিলেন না। তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তাদের নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তারা মানুষের মধ্য নবুওয়াত অথবা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

"আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।[৪২২]

নবী-রাসূলগণ সাধারণ মানুষের মতোই ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম করেছেন। এটা তাদের নবুওয়াত অথবা রিসালাতের জন্য দুষণীয় কিছু নয় বরং তা স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

"আপনার পূর্বে যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেইতো আহার করতো এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতো।"[৪২৩] একজন নবী অথবা রাসূলের পক্ষে সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করা দোষের কোনো কাজ নয়। বরং এটাই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ

৪২১. আল-কুরআন, ১৪ : ০৪

৪২২. আল-কুরআন, ১৩ : ৩৮

৪২৩. আল-কুরআন, ২৫ : ২০

"মারইয়াম তনয় মাসীহ তো একজন রাসূল মাত্র তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তাঁর মাতা সত্যনিষ্ট ছিল। তাঁরা উভয়ে খাদ্যাহার করতো।"[৪২৪] নবী ও রাসূলগণ সাধারণ মানুষের মতোই জন্মগ্রহণ করেছেন, বেড়ে উঠেছেন, জীবন যাপন করেছেন অতঃপর এক সময় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের নিকট এমন কিছু ছিল না যার জন্য তাদেরকে অতিমানব বলা যায় বরং তারা আল্লাহর মনোনীত মুখলিছ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ -

"মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর পূর্বে রাসূলগণ গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।" [৪২৫] আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নবী ও রাসূল সম্পর্কে যে আকীদা পোষণ করে তা সারনির্যাস হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স.) নবী-রাসূলদের সর্দার। তিনি সবার চেয়ে উত্তম। তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল, আর তাঁকে সকল মানুষের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে ওহীর ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে। এর বিপরীত আকীদা পোষণকারী কাফির হিসেবে গণ্য হবে। [৪২৬]

২। নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ, ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। তাঁরা কখনও কোন ভুল করেননি। কোনো কোনো নবী অপেক্ষাকৃত অনুত্তম কাজ করায় আল্লাহ তা'আলায় নিকট লজ্জিত হয়েছেন।

৩। মহানবী মুহাম্মদ (স.) নিষ্পাপ ও ভুল-ক্রুটির উর্ধ্বে। সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহও ভ্রান্তির উপরে একত্রিত হওয়া থেকে মুক্ত। সমগ্র সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যে মুহাম্মদ (স.) শ্রেষ্ঠ মানুষ।

৪। নবী-রাসূলগণের মুজিযা সত্য। এ সবের উপর ঈমান আনা আবশ্যক।

৫। নবী-রাসূলগণের স্ব-স্ব যুগে সত্যের বার্তাবাহক ছিলেন। তাঁদের আনিত দ্বীনের আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। তবে মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের মধ্যে অন্যান্য সকল নবী-রাসূলগণের শরীয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর শরীয়াত ও আনুগত্যই চলবে।

---

৪২৪ . আল-কুরআন, ০৫ : ৭৫

৪২৫ . আল-কুরআন, ০৩ : ১৪৪

৪২৬ . ড. নাসের ইবন আবুল করীম আল-আকল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

৬। ঈসা মসীহ (আ.) কে ইহুদীরা হত্যা অথবা ক্রুশে চড়াতে পারেনি। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা আদাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি কিয়ামাতের পূর্বে মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মত হিসাবে আগমন করবেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا - بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"তাঁরা তাঁকে হত্যাও করেনি। ক্রুশবিদ্ধও করেনি কিন্তু তাদের সামনে সদৃশকরণ ঘটানো হয়েছিলো। যারা তাঁর সম্পর্কে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চিতই এ ব্যাপারে সন্দেহে ছিল, এ সম্পর্কে অনুমান ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৪২৭]

নবীগণ নিষ্পাপ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে নবীগণ নিষ্পাপ। নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বিভ্রান্তি ও পাপাচার থেকে হিফাজত করেন। সকল নবী আল্লাহ তা'আলার মনোনীত, বিশেষ রহমত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত, নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন। । তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণ করেন ফলে তারা বিভ্রান্তি বা পাপে নিপতিত হন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"আল্লাহ অধিক জানেন যে, কোথায় তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।"[৪২৮] মহান আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণের পবিত্রতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা সর্বোপরি অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পবিত্র কুরআন বহু স্থানে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। মানবজাতিকে তাদের অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। এতে সুস্পষ্ট যে, কোনে পাপাচারী ব্যক্তি অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে না। তাই বলা যায় যে, নবী-রাসূল নি:সন্দেহে নিষ্পাপ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

৪২৭. আল-কুরআন, ০৪ : ১৫৭

৪২৮. আল-কুরআন, ৬ : ১২৪

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

"এরা নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তারা আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম।"[৪২৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ- أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ -

"এরাই ছিল সেসব লোক , যাদেরকে আমি কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়ত দান করেছি, যদি তারা তা অস্বীকার করে, আমিতো এমন এক সম্প্রদায়ের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, যারা কখনো প্রত্যখ্যান করেনি। এরা হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ তা'আলা যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন, অতএব তুমিও এদের হিদায়াতের পথের অনুসরণ করো এবং বলো, আমি এর উপর তোমর কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; এ হচ্ছে মানুষের জন্য একটি স্মরণিকা মাত্র।"[৪৩০]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা বার বার পবিত্র কুরআনে নবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। এসব আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ঠ যে, নবীগণ ছিলেন একনিষ্ঠ, সৎ ও নিষ্ঠাবান আল্লাহর মনোনীত, বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত বান্দা। তাঁরা সকলেই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর অনুসরণতো তাঁদেরই করা যায় যারা যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত। নবী-রাসূলগণ নিস্পাপ ছিলেন, তাঁরা যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

---

৪২৯. আল-কুরআন, ১৯ : ৫৮

৪৩০. আল-কুরআন, ০৬ : ৮৯-৯০

الانبياء كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح و قد كانت منهم زلات وخطيائات و محمد (صلعم) نبيه، وعبده و رسوله، و صفيه و نقيه، ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالي طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط -

"নবীগণ সকলেই সগীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও মুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো তাদের সামান্য পদস্খলন ও ভুল-ত্রুটি হয়েছে। আর মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর মনোনীত , তাঁর বাছাইকৃত। তিনি কখনো মূর্তি পূজা করেননি এবং এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেননি। তিনি কখনোই কবীরা বা সগীরা কোনো গোনাহেই লিপ্ত হননি।"[৪৩১]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ আলেমের মতে, নবীগণ কবীরা গোনাহ থেকে সংরক্ষিত। তবে অনিচ্ছাকৃত ভাবে অথবা ভুলক্রমে সগীরা গোনাহ করে ফেলা থেকে তাঁরা সংরক্ষিত নন। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নবীগণের সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া অথবা ভুল করাকেও অসম্ভব বলে অভিহিত করেছেন। তবে আহলুস সুন্নাতের সকলেই একমত যে, নবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে কেনো নিষিদ্ধকর্মে লিপ্ত হতে পারেন না। অসতর্কতা বা ভুলের কারণে যা ঘটে তা পদস্খলন বা অপেক্ষাকৃত অনুত্তম কাজ বলে অভিহিত।[৪৩২]

মুজিযাতুল আম্বিয়া

মুজিযা শব্দটি আরবী। এর অর্থ অক্ষমকারী, অলৌকিক নিদর্শন। নবীগণ তাঁদের নবুওয়াতের দাবী প্রমাণ করতে আল্লাহর নির্দেশে যে অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করেন তাকে মুজিযা বলা হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে একে আয়াত বা নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটি হিজরী দ্বিতীয় শতকের পর প্রচলিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মুজিযা বুঝাতে আয়াত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

---

৪৩১ . মোল্লা আলী কারী (রহ.), *শারহুল ফিকহিল আকবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০১

৪৩২ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

والايات ثابتة للانبياء عليهم الصلاة والسلام، والكرامات للاولياء حق - واما التي تكون لاعدائه مثل ابليس و فرعون والدجال مما روي في الاخبار انه كان و يكون لهم لانسميها ايات ولاكرامات، ولكن نسميها قضاء حاجات لهم، و ذلك لان الله تعالي يقضي حاجات اعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا و كفرا، و ذلك كله جائز وممكن-

"নবীগণের জন্য আয়াত প্রমাণিত এবং ওলীগণের কারামত সত্য। আর ইবলিস, ফিরআউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, যে সকল অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে; সেগুলিকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না বরং এগুলিকে আমরা তাদের প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর শত্রুদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদের ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে। তারা ধোঁকাগ্রস্ত হয় এবং আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপতিত হয়। এগুলি সবই সম্ভব।"[৪৩৩]

পবিত্র কুরআনে নবীগণের অনেক মুজিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নূহ (আ.)-এর নৌকা, নমরুদের অগ্নিকুন্ডে ইবরাহীম (আ.)-এর নিরাপদ থাকা, মুসা (আ.)-এর লাঠি ও অন্যান্য, ঈসা (আ.)-এর মৃতকে জীবিত করা, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চন্দ্রকে দ্বি-খন্ডিতকরণ, ইসরা, মিরাজ ইত্যাদি মুজিযা আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীসেও বহু মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর ওহী ও মুজিযা লাভ করেছেন। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ও নির্দেশে তাঁরা অনেক মুজিযা প্রদর্শন করে অবিশ্বাসীদের সরল সঠিক পথে আহবান করেছেন। অবিশ্বাসীরা নবী-রাসূলগণের আহবান উপেক্ষা করে নিদর্শন দেখতে চেয়েছে, ফলে মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নবী-রাসূলগণ মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর মনোনীত বান্দা ছিলেন। অলৌকিক কোনো কিছু প্রদর্শন করা তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। তাঁরা তা প্রদর্শন করেছেন আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায়। এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

৪৩৩ . মোল্লা আলী কারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩৪

قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ-

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ -

"তারা (কাফিররা) বলত, তোমরা (নবী-রাসূলগণ) আমাদের মতই মানুষ। আমাদেও পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ (মুজিযা) উপস্থিত কর। তাদের রাসূলগণ তাদের বলতেন, আমরা তোমাদের মত মানুষ বৈ কিছু নই, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ (মুজিযা) উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। মুমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।[৪৩৪]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ-

"তোমার পূর্বে রাসূলগণ প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন (মুজিযা) উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।"[৪৩৫]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

৪৩৪ . আল-কুরআন, ১৪ : ১০-১১

৪৩৫ . আল-কুরআন, ১৩ : ৩৮

“তারা দৃঢ়তার সাথে শপথ করে বলে যে, যদি তাদেরকে অলৌকিক নিদর্শন দেখান হয় তাহলে তারা ঈমান গ্রহণ করবে। আপনি বলুন, অলৌকিক নিদর্শনাবলীতো একান্তই আল্লাহর কাছে।”[৪৩৬]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

“আপনার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাদের থেকে কারো কথা আপনার নিকট বর্ণনা করেছি কারো কথা আপনার নিকট বর্ননা করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো রাসূলই কোনো নিদর্শন (মুজিযা) আনতে পারেন না। আর যখন আল্লাহর নির্দেশ এসে যায় তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করা হয় এবং তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।”[৪৩৭]

আহলুস সুন্নাত ওয়াত জামায়াত নবী-রাসূলদের মুজিযা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারা অরো বিশ্বাস করে যে, মুজিযা আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশে প্রদর্শিত হয় এতে নবী অথবা রাসূল মুজিযার প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখেন না, তারা শুধু আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন মাত্র।

রাসূল (স.)-এর মুজিযা

মুজিযা মহান আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট নবী (আ.)-এর জন্য এটি প্রমাণ বা দলীল। মহানবী (স.) এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য এমন উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে মুজিযা না হলেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে কোন দলীলের প্রয়োজন ছিল না। তাঁর সুমহান চরিত্রই নবুওয়াত প্রমাণে যথেষ্ট ছিল। তথাপি মহান আল্লাহ রাসূল (স.) কে অসংখ্য মুজিযা দান করে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেছেন। মহানবী (স.) এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা পবিত্র কুরআন । অন্যান্য নবীদের মুজিযা নবীর মৃত্যুর সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মহানবী (স.) -এর শ্রেষ্ঠ মুজিযা কুরআন মাজিদ এমন এক মুজিযা যার শ্রেষ্ঠত্ব, অলৌকিকত্ব কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। আর এর হিফাজতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে নিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

---

৪৩৬. আল-কুরআন, ০৬ : ১০৯

৪৩৭. আল-কুরআন, ৪০ : ৭৮

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চই কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর হিফাজতের দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করেছি।"[৪৩৮] পবিত্র কুরআন এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে যখন আরব জাতি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে চরম উৎকর্ষ নিয়ে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা আরব জাতির সামনে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলে তারা সে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি আজ পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। মহানবী (স.)-এর অসংখ্য মুজিযার কয়েকটি যা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তা নিম্নে পেশ করা হলো:[৪৩৯]

১) মহানবী (স.) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া।

২) ইসরা ও মিরাজের রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহানবী (স.) কর্তৃক একটি বাণিজ্য কাফেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদান ও বাইতুল মুকাদ্দাসের সঠিক চিত্র তুলে ধরা।

৩) বদর যুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের আগাম মৃত্যু সংবাদ প্রদান যা সত্যে পরিণত হয়েছে।

৪) মসজিদে নববীর মিম্বরের কান্না এবং মহানবী (স.) কর্তৃক জড়িয়ে ধরার মাধ্যমে তার শান্ত হয়ে যাওয়া।

৫) তাঁর হাতের আঙুল থেকে পানির স্রোত বের হওয়া যার পানি পান করে একটি পুরো বাহিনী তৃপ্তি লাভ করে।

৬) সামান্য খাবার দিয়ে কয়েক হাজার লোকের তৃপ্তি সহকারে খাদ্য গ্রহণ করা।

৭) তাঁর হাতের পাথরকনা কর্তৃক তাসবীহ পাঠ করা।

৮) তাঁর হাতের ইশারায় গাছ নিকটে আসা এবং চলে যেতে বললে চলে যাওয়া।

৯) হিজরতে পথে উম্মে মাবাদের ছাগী থেকে দুধ দোহন করা অথচ ছাগীটি বাচ্চাই প্রসব করেনি।

১০। তাঁর ভবিষৎবাণী সমূহ বাস্তবে রূপ নেওয়া। যেমন সিরিয়া, মিশর পারস্য, ইস্তাম্বুল বিজয় সম্পর্কিত খবর। খলীফাদের সংখ্যা তাদের সময়কাল ও রাজতন্ত্র চালু হওয়া সম্পর্কিত সবই বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে।

---

৪৩৮ . আল-কুরআন, ১৫ : ০৯

৪৩৯ . হারুন মাদানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

কারামাতুল আউলিয়া

ওলী শব্দটি আরবী। এর বহুবচন আউলিয়া। ওলী শব্দের অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি। ওলীউল্লাহ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সৌভাগ্যবান বান্দাদের বুঝায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ – الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ –

"জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলে বা তাকওয়াহ অবলম্বন করে চলে।[৪৪০]"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

"আল্লাহ মুমিনগণের বন্ধু। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে বের করেন। আর কাফেররা শয়তানের বন্ধু। শয়তান তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে আনে।"[৪৪১] এ সম্পর্কে ইমাম তাহাবী (রহ.)-এর বক্তব্য প্রনিধাণযোগ্য। তিনি বলেন :

المؤمنون كلهم اولياء الرحمن-

"সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী।"[৪৪২] ওলীদের কারামত বিষয়ে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, "ওলীদের থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। যদি কোনো বাহ্যত নেককার মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায় তাহলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা বা কারামত বলে বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো নেককার বুযুর্গ মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধ সূত্রে জানা যায় তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। তা অস্বীকার করা বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া মুতাযিলা ও অন্যান্য

---

৪৪০ . আল-কুরআন, ১০ : ৬২-৬৩

৪৪১. আল-কুরআন, ০২ : ২৫৭

৪৪২ . ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত্‌ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকিদা। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে নবী ছাড়াও অন্যান্য মুমিন মুত্তাকী মানুষের অলৌকিক কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে এরূপ অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।" [৪৪৩] এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আরেকটি বিশ্বাস হচ্ছে, তারা কোনো ওলীকে নবীর উপর প্রাধান্য দেন না। তারা মনে করে একজন নবী সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ। এ সম্পর্কে ইমাম তাহাবী (রহ.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

لا نفصل احدا من الاولياء علي الانبياء عليهم السلام، و نقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء- و نؤمن بما جاء من كراماتهم- وصح عن الثقات من رواياتهم-

"আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর উপর প্রাধান্য দেই না। বরং আমরা বলি, একজন নবী সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ। তাদের যে সকল কারামত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের মাধ্যমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি।" [৪৪৪]

কারামত শব্দটিও আরবী। এর অর্থ ভদ্রতা, সম্মান, সম্মাননা, সম্মান-চিহ্ন ইত্যাদি। পরিভাষায় কারামত বলা হয়, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী, ফরজ ও নফল ইবাদাত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে কারামত বলে।[৪৪৫] কারামত হচ্ছে স্বভাব বিরোধী অলৌকিক এমন ঘটনা যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলী বা প্রিয় বান্দাদের থেকে প্রকাশ করেন।[৪৪৬] ওলীদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যে অসাধারণ কাজ দেখিয়ে থাকেন, তাকে বলা হয় কারামত। [৪৪৭]

ওলীদের থেকে কারামত প্রকাশিত হতে পারে। যদি কোনো নেককার মুমিন মুত্তাক্বী মানুষ থেকে কোনো অলৌকক কর্ম প্রকাশ পায় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোনো নেককার লোক থেকে কোনো অলৌকি কর্ম প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধ সূত্রে জানা যায়–তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে,

---

৪৪৩ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৪৪৪. ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আত্ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৪৪৫ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৪৪৬ . হারুন মাদানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

৪৪৭ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

একজন নেককার মানুষ বেলায়েত ও কারামত লাভের পরও বিভ্রান্ত হতে পারেন। আর কারামত প্রকাশিত হওয়া ওলী হওয়ার প্রমাণ নয়, বরং ঈমান ও তাকওয়ার উপর দৃঢ় থাকাই ওলী হওয়ার প্রমাণ।[৪৪৮]

পবিত্র কুরআনে কারামতের স্বপক্ষে দলীল রয়েছে। হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট অমৌসুমী ফল আসা একটি কারামত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ-

"যখনই যাকারিয়া তার (মারইয়াম) কাছে ইবাদতখানায় সাক্ষাৎ করত, তার কাছে খাদ্য দ্রব্য পেত। সে বলত, হে মারইয়াম! এটা কোথা থেকে তোমার কাছে এল? সে (মারইয়াম) বলত, আল্লাহর কাছ থেকে।"[৪৪৯]

এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে সুলাইমান (আ.)-এর একজন অনুসারীর কারামত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي-

"যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর যখন সে (সুলাইমান আ.) সেটাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখল তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ।[৪৫০]

হাদীস শরীফেও কারামতের বর্ণনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অশ্লীল কর্ম হতে পাদ্রী জুরাইজকে নির্দোষ প্রমাণ করতে কোলের শিশুর কথা বলা। বনী ইসরাঈল বংশের তিন ব্যক্তির পাহাড়ের গুহায় আটকে যাওয়া এবং প্রত্যেকের নেক আমলের উসিলায় তা থেকে বেরিয়ে আসা কারামতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইসতিদরাজ

ইসতিদরাজ শব্দটি আরবী। এটি আরবী ج + ر + د ক্রিয়ামূল থেকে উৎকলিত। এর অর্থ হাটা, অগ্রসর হওয়া, ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ইসতিদরাজ এর আভিধানিক অর্থ ক্রমান্বয়ে

---

৪৪৮ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭

৪৪৯ . আল-কুরআন, ০৩ : ৩৭

৪৫০ . আল-কুরআন, ২৭ : ৪০

এগিয়ে নেওয়া, উপরে তোলা বা নিচে নামানো, ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেওয়া, এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উন্নীত করা এবং দুনিয়াতে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় কোনো পাপী অথবা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।[৪৫১] এমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা যা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে তাঁর শত্রুদের অবকাশ বা সুযোগ দান করণার্থে তাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।[৪৫২] সকল অলৌকিক কর্মই কারামত নয়; আবার কারো অলৌকিক কর্ম বেলায়েতের প্রমাণ বহন করে না। অলৌকিক কর্ম মুমিন, মুত্তাক্বী থেকে প্রকাশিত হতে পারে আবার পাপী বান্দা থেকেও প্রকাশিত হতে পারে। মুমিন, মুত্তাক্বী থেকে প্রকাশিত হলে তাকে কারামত আর পাপী বান্দা–যার মাঝে ঈমান, তাকওয়াহ ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত না থাকে তার থেকে যে অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয়ে তাকে ইসতিদরাজ বলে।

অবিশ্বাসী কাফিরদের আল্লাহ তা'আলা ইসতিদরাজের সুযোগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে শয়তান সবচেয়ে বেশি সুযোগ লাভ করেছে। শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়া অতিক্রম করা পুর্ব-পশ্চিমের সবার মাঝে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। এমনকি মানবজাতির রক্তের শিরা উপশিরায় চলার ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে খোদাদ্রোহী ফিরআউনও ইসতিদরাজের সুযোগ লাভ করেছিল। নীলনদ তার হুকুমে প্রবাহিত হত। আর সে যখন ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বের হতো অথবা প্রবেশ করত তখন প্রয়োজন অনুসারে তার ইচ্ছানুযায়ী ঘোড়ায় উভয় পা লম্বা বা ছোট হয়ে যেত।[৪৫৩] শেষ যামানায় সবচেয়ে বড় ফিতনা দাজ্জালের ইসতিদরাজ অন্যতম দৃষ্টান্ত। দাজ্জালকে আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু ক্ষমতা দিবেন। এর মধ্যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে আবার জীবিত করা সে দুনিয়ায় চাকচিক্য প্রদর্শনকরবে এবং যমিনকে উর্বর করে তোলবে। আর তার বিচরণ হবে মেঘের মত দ্রুত যাকে বাতাসে ধারণ করে নেয়। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.) ও দ্বীনের এসব শ্রত্রুদের অস্বাভাবিক কর্মকান্ড মুজিযা বা কারামত নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহর দুশমনদের প্রয়োজন মেটানো মাত্র। এর মাধ্যমে আল্লাহ

---

৪৫১ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

৪৫২ . হারুন মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৪৫৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

তা‘আলা তাঁর দুশমনদের অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং এ কারণে তিনি তাদের পাকড়াও করে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করবেন।

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর বিশ্বাস

আল্লাহর উপর বিশ্বাসের পর মহানবী (স.)-এর রিসালাতের স্বাক্ষ্য প্রদান করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। প্রথমত তিনি ছিলেন মানুষ। আহলু সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাঁকে রক্ত মাংসের মানুষ বলেই মনে করে, তারা কোনোক্রমেই তাঁকে অতি মানব মনে করেন না। এ সম্পর্কে তাদের দলিল হচ্ছে নিম্নোক্ত কুরআনের বাণী; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

“হে রাসূল আপনি বলুন! আমি তোমাদের মতোই মানুষ, আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। আর তোমাদের ও আমার ইলাহ একজন।”[৪৫৪] আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি অতি মানব ছিলেন না বরং মানুষ ছিলেন। তিনি অন্যান্য নবীদের মতোই মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন। তবে নবী - রাসূলদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ট তথা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি আরবের সবচেয়ে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ-কৌলিন্যে ও উন্নত চরিত্র মাধুরিমায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুরিমার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

‘‘নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।”[৪৫৫] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।”[৪৫৬] মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন কিন্তু কোনোভাবেই তাকে অতি মানব ভাবার সুযোগ নেই। বরং তিনি যেমন মহামানব ছিলেন তেমনি আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা বা দাস ছিলেন। আহলুস

---

৪৫৪ . আল-কুরআন, ১৮ : ১১০

৪৫৫ . আল-কুরআন, ৬৮ : ০৪

৪৫৬ . আল-কুরআন, ৩৩ : ২১

সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে একজন মুসলিম যেমন আল্লাহর উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করে তেমনি রাসূলুল্লাহ (স.)- এর রিসালাতের স্বাক্ষ্যও প্রদান করবে। রিসালাতের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের স্বাক্ষ্য দিবে। তাহলো, আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা বা দাস সেই সাথে তিনি আল্লাহর রাসূল। এ সম্পর্কে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বক্তব্য প্রণিধাণযোগ্য। তিনি বলেন:

"ইসলামী ঈমানের মধ্যে 'মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর মহত্তম সৃষ্টি ও তাঁর প্রিয়তম। কিন্তু সর্বাবস্থায় তিনি বান্দা দাস ও মানুষ। তিনি স্রষ্টার অবতার নন, স্রষ্টার সত্তার অংশ নন। স্রষ্টা বা তাঁর কোনো গুণের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাননি, কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী তিনি নন। তাঁর মর্যাদা আল্লাহর পূর্ণতম বান্দা ও উপাসক হওয়ার মধ্যে। তাঁকে পরিপূর্ণ ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদানের সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক মূলত বাড়াবাড়ি ও অতিভক্তি থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার জন্য এই বিশ্বাস রক্ষা কবজ।"[৪৫৭] আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য। এটি ঈমানের ভিত্তি। সেই সাথে তিনি নবী ও রাসূল এটাও বিশ্বাস করতে হবে।[৪৫৮] মহানবী (স.) এর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হচ্ছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ যা কিছুর নির্দেশ দিয়েছেন, যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন, সে সাথে যা কিছু তিনি করেছেন সবকিছুকে সন্দেহাতীত বলে বিশ্বাস করা। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর মহানবী (স.)-এর রিসালাত বিষয়ক শিক্ষাসমূহকে তিনভাবে বিভক্ত করেছেন। যথা:

এক. তাঁর নবুওয়াতে বিশ্বাস।

দুই. তার আনুগত্য ও অনুসরণে বিশ্বাস।

তিন. তাঁর মর্যাদা ও ভালোবাসায় বিশ্বাস। [৪৫৯]

---

৪৫৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৪৫৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

৪৫৯ . প্রাগুক্ত

একজন মুমিন অবশ্যই এই বিশ্বাস করবে যে, মহানবী (স.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত রাসূল ও নবী। তিনি গোটা মানবজাতির সমূহ কল্যাণে আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে এসেছেন। এই পথ নির্দেশে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا -

"হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি স্বাক্ষীরূপে, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।"[৪৬০] উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা এটি সুস্পষ্ট হয় যে, মহানবী (স.) কে আল্লাহ তা'আলা নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছেন। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ কোনো একটি বংশ বা গোত্র অথবা কোনো একটি অঞ্চলে প্রেরিত হতেন। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) সমগ্র বিশ্বের সব জাতির সকল মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। তাঁর আগমনের সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাঁর রিসালাতের বিশ্বাসের মাধ্যমেই সকল মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি। তাঁর রিসালাতের স্বাক্ষ্য ব্যতীত কোনো মানুষ নাজাত পাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"বলুন! হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান ; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূল ও উম্মি নবীর প্রতি। যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।"[৪৬১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

৪৬০. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪৫-৪৬

৪৬১. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৮

"আমিতো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।"[৪৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

"তিনিই মহিমান্বিত যিনি তার বান্দার উপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কুরআন মাজিদ) নাযিল করেছেন, যেন তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।"[৪৬৩] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

فضلت علي الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرغب واحلت لي الغنائم و جعلت لي الارض طهورا و مسجدا و ارسلت الي الخلق كافة وختم بي النبيون-

"ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের উপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। (১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক উচ্চাঙ্গের ভাব ও ভাষাময় বাক্য প্রদান করা হয়েছে। (২) আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ গনীমত বৈধ করা হয়েছে। (৪) পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রতার উপাদান ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (৫) আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন।" [৪৬৪]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا و انما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث الي قومه خاصة و بعثت الي الناس كافة واعطيت الشفاعة-

"আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে প্রদান করা হয়নি। (১) এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করে দেওয়া হয়েছে। আমার উম্মতের যে কোনো মানুষ যেখানেই তার সালাতের সময় উপস্থিত হবে সেখানেই সে সালাত আদায় করবে। (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ গণীমতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, (৪) পূর্ববর্তী নবীদেরকে পাঠানো হতো বিশেষ

৪৬২ . আল-কুরআন, ৩৪ : ২৮

৪৬৩ . আল-কুরআন, ২৫ : ১

৪৬৪ . সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ৩৭১

ভাবে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের জন্য আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের জন্য এবং (৫) আমাকে শাফায়াত প্রদান করা হয়েছে।"[৪৬৫] উপর্যুক্ত দলীলের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে মহানবী (স.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল সেই সাথে তিনি বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা জাতির নবী নন বরং তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর নবী ও রাসূল।

নবুওয়তের দায়িত্ব পালন

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মহানবী (স.) সম্পর্কে এও বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ প্রদত্ত নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। মহান আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে তিনি জাতির সামনে পেশ করেছেন, এ ক্ষেত্রে কোন কিছুই গোপন করেননি। দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পরও অনেকে ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে বিমুখ থাকায় তিনি খুব কষ্ট পেতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্তনা দিতে গিয়ে বলেন :

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ-

''আর তারা (কাফিররা) যদি আপনার আহবানে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষাকর্তারূপে প্রেরণ করিনি। আপনার উপরে তো শুধু পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব।"[৪৬৬]

মহানবী (স.) -এর দ্বীনের পূর্ণতা

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স.) -এর মিশনের পূর্ণতার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"[৪৬৭]

---

৪৬৫. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ১৬৮

৪৬৬. আল-কুরআন, ৪২ : ৪৮

৪৬৭. আল-কুরআন, ৫ : ৩

উপর্যুক্ত আয়াতটি বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়। আর বিদায় হজ্জের ভাষণ শেষে আল্লাহর রাসূল (স.) সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, আমি কি আল্লাহর বাণীসকল প্রচার করেছি? সাহাবীগণ সমবেত কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ। মহানবী (স.) বলেন :

وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا شهد انك قد بلغت و اديت و نصحت-

''আমার ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা কী বলবে ? তারা বলেন, আমরা স্বাক্ষ্য দিব যে, আপনি প্রচার করেছেন। রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনায় তাদের মঙ্গলের সকল উপদেশ তাদেরকে জানিয়েছেন।'' [৪৬৮]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

ما بقي شيئ يقرب الي الجنة و يباعد من النار الا وقد بين لكم -

জান্নাতের নিকটে নেওয়ার ও জাহান্নাম থেকে দূরে নেওয়ার সকল বিষয়ই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে ।"[৪৬৯]

উপর্যুক্ত হাদীস ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের আলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর রিসালাত ও নবুওয়াতের সমূহ দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করেছেন।

খতমে নবুওয়ত

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রাসূলুল্লাহ (স.) কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। তাঁর পরে আর কোনো নবী ও রাসূল আসবে না, আর কোনো ওহী নাযিল হবে না। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا-

"মুহাম্মদ (স.) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।"[৪৭০] আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

---

৪৬৮ . সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, হা. ৮৯০

৪৬৯ . সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ তাবরানী, *আল-মুজাম আল-কবীর* (মাওসিল, ইরাক: ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৫৫-১৫৬

كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي و انه لا نبي بعدي و سيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال : فوا ببيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استد رعاهم-

"বনী ইসরাঈলদের শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর অমার পরে কোনো নবী নেই, কিন্তু খলীফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন। উপস্থিত সাহবীগণ বলেন, আপনি আমাদেরকে তাদের বিষয়ে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন, ধারাবাহিকভাবে প্রথম ব্যক্তির পরে পরবর্তী ব্যক্তি এভাবে তাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের অধীনস্ত জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।"[৪৭১]

সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আলী (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

انت مني بمنزلة هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي

"মুসার সাথে হারুনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ, ব্যতিক্রম এই যে, আমার পরে কোনো নবী নেই।" [৪৭২]

যুবাইর ইব্‌ন মুতয়িম (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

ان لي اسماء انا محمد و انا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر و انا الحاشر الذي يحشر الناس علي قد مي و انا العاقب الذي ليس بعده احد (نبي)

''আমার অনেক নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমাদ, আমি মাহী (উচ্ছেদকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন। আমি হাশির (একত্রকারী) , আমার পদদ্বয়ের নিকটেই মানুষেরা কিয়ামতের দিন একত্রিত হবে। আর আমি আকিব (সর্বশেষ), যার পরে আর কোনো নবী নেই।" [৪৭৩] অন্য এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন :

---

৪৭০ . আল-কুরআন, ৩৩ : ৪০

৪৭১ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, হা. ১২৭৩

৪৭২ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, হা. ৯৬০ , খ. ৩, হা. ১৩৫৭ , খ. ৪, হা. ১৫৫১; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হা. ১৮৭০

৪৭৩ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩/, হা. ১২৯৯; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হা. ১৮২৮

مثلي و مثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بنيانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنت من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين -

"আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ এক ব্যক্তির মত যিনি একটি খুবই সুন্দর ও মনোরম ইমারত তৈরি করেছেন। কিন্তু ইমারতের একদিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। মানুষেরা আশ্চর্য হয়ে এ মনোরম ইমারতটির চারিদিকে ঘুরতে থাকে এবং বলতে থাকে, এ ইটটি যদি স্থাপন করা হতো। তিনি বলেন, আমিই এ সর্বশেষ ইট, আমিই সর্বশেষ নবী।" [৪৭৪]

অন্যত্র রাসূলুলুল্লাহ (স.) বলন:

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى-

"নিশ্চয় রিসালাত ও রাসূলের পদ এবং নবুওয়ত বা নবীর পদ শেষ হয়ে গেছে , সুতরাং আমার পরে রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।"[৪৭৫]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রাসূলের আলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে রাসূলুল্লাহ (স.) সর্বশেষ নবী –তাঁর পরে কোনো নবী আসবে না। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মহানবী (স.) -এর মাধ্যমে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি বিষয়ে ৩৭ জন সাহাবীর বর্ণনায় ৬৫টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ (স.) -এর পরে আর কোনো নবী -রাসূল এসেছেন, আসতে পারেন বা আসার সম্ভাবনা আছে অথবা তাঁর পরে কোনো নবী -রাসূল আসা অসম্ভব কিছু নয়-এরকম বিশ্বাস যারা করবে তারা নিঃসন্দেহে অমুসলিম কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য।[৪৭৬]

ইসরা ও মিরাজ

রাতের পরিভ্রমন কে ইসরা বলা হয়। আর মিরাজ শব্দটি العروج থেকে উৎকলিত। এর অর্থ সিড়ি বা যন্ত্র বিশেষ যা দ্বারা উপরে উঠা যায়। ইসরা হচ্ছে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে

---

৪৭৪ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হা. ১৩০০; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হা. ১৭৯০ - ১৭৯১

৪৭৫ . সুনানু তিরমিযি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হা. ৫৩৩

৪৭৬ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ। আর মিরাজ হলো মসজিদে আকসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পরিভ্রমণ । আর সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আল্লাহ তা'আলা যতটুকু তাঁর রাসূলকে নেয়ার ইচ্ছা করেছেন ততটুকু ভ্রমণ করা। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকীদা হলো ইসরার রাতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স.) কে স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় উর্ধ্ব জগতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মিরাজের মাধ্যমে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন।[৪৭৭]

ইসরা তথা পবিত্র বাইতুল্লাহ থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত মহানবী (স.)-এর সফর পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

''পবিত্র সেই আল্লাহ যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত।''[৪৭৮]

মিরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ নিম্নরূপ:

১। মিরাজ সত্য। মিরাজের দিন মহানবী (স.) কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। সপ্তম আকাশ ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা অতঃপর মহান আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে আরো উপরে উঠানো হয়।

২। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে উর্ধ্বে আরোহন করিয়ে অশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করত: তাঁর প্রতি ওহী অবতরণ করেন এমনকি সরাসরি কথা বলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন।

৩। মহানবী (স.) সে রাতে জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে বসবাসকারীদের অবস্থা অবলোকন করেন সে সাথে জাহান্নামে উকি দিয়ে তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন।

৪। এ রাতে তিনি ফেরেশতা দেখেছেন এমনকি জিব্রাইল (আ.) কে মূল আকৃতিতে দেখেছেন।

৫। মিরাজ রজনীতে মহানবী (স.) যা দেখেছেন তা স্বচক্ষে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছেন আর তাঁর অন্তর তা অনুধাবন করেছে।

---

৪৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

৪৭৮. আল-কুরআন, ১৭ : ০১

৬। ফিরে আসার পথে বাইতুল মুকাদ্দাসে নবী-রাসূলদের জামাতে ইমামতী করার দ্বারা মহানবী (স.) নবী-রাসূলদের নেতৃত্ব দান করেছেন।

আহলু বাইত ও সাহাবায়ি কিরাম

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সম্মান ও ভালোবাসার অংশ হচ্ছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর পরিবার-পরিজনকে, তাঁর উম্মাতকে ভালোবাসা–তাঁকেই ভালোবাসার নামান্তর। ইসলাম রক্ত, বর্ণ, বংশ বা বিশেষ কোনো অধিকার প্রদান করেনি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মনে করে, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পরিবারের লোকজন ও সাহাবায়ি কিরাম ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ ও কুরবানী করেছেন তাই তাঁদের প্রতি ভালোবাসা রাখা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আত্মীয়তার ভালোবাসা রক্ষা করতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى -

"বলুন, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।"[৪৭৯] রাসূলুল্লাহ (স.) এ সম্পর্কে বলেন:

أما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب وانا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ... ثم قال واهل بيتى أذكركم الله فى اهل بيتى ... ثلاثا-

"হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো! আমি একজন মানুষ মাত্র। হয়তো শীঘ্রই আমার প্রতিপালকের দূত এসে পড়বে আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। এরপর তিনি বলেন আর আমার বাড়ির মানুষ বা পরিবার-পরিজন। আমি আমার পরিবার-পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি। একথা তিনি তিন বার বলেন।"[৪৮০]

---

৪৭৯. আল-কুরআন, ৪২ : ২৩

৪৮০. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হা. ১৮৭৩

আহলুস সুন্নাত ওয়াত জামায়াতের মূলভিত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের জামায়াতের অনুসরণ করা। আহলুস সুন্নাত ওয়াত জামায়াত বিশ্বাস করে, মানবজাতির মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে আম্বিয়া (আ.)-এর পর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবগণের অবস্থান। সাহাবীগণের মধ্য থেকে খুলাফায়ে রাশিদীনের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আর খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্রমানুসারে। এরপরে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অবস্থান। অন্যান্য সাহাবীগণও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন অমর্যাদা, অবজ্ঞা করতে পারে না। এ সম্পর্কে বহু নকলী দলীল রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ -

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীতে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[৪৮১]

সকল সাহাবীর ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ-

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফুরী, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের জন্য অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।"[৪৮২]

---

৪৮১. আল-কুরআন, ৫৭ : ১০

৪৮২. আল-কুরআন, ৪৯ : ০৭

মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের ত্যাগ ও কুরবানী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাঁদের প্রতি মহান প্রতিপালক সন্তুষ্ট। তাদের জন্য ও যে সকল সাহাবী তাঁদের অনুসরণ করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এ মহাসাফল্য।"[৪৮৩]

বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"মুমিনগণ যখন আপনার নিকট বৃক্ষতলে ব্য়াত গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।"[৪৮৪]

আল্লাহ তা'আলা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীদের প্রশংসায় বলেন:

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

"কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ আর তারাই সফলকাম।"[৪৮৫]

---

৪৮৩. আল-কুরআন, ০৯ : ১০০

৪৮৪. আল-কুরআন, ৪৮ : ১৮

৪৮৫. আল-কুরআন, ০৯ : ৮৮

রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

اكرموا أصحابى، (فانهم خيارهم) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب-

"তোমরা আমার সাহবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।"[৪৮৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরোও বলেন:

لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه-

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিবে না। কারণ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের এক মুদ্দ বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।"[৪৮৭]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রাসূলের আলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে, সকল মুমিনের দায়িত্ব হচ্ছে সকল সাহাবীকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা ও তাঁদের জন্য দোয়া করা এবং তাঁদের কারো প্রতি বিদ্বেষ না রাখা। কোনো সাহাবীর প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ রাখা ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৪৮৬ . সুনানু নাসাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হা. ৩৮৭

৪৮৭ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হা. ১৩৪৩; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হা. ১৯৬৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ফিরিশতা সম্পর্কে মতাদর্শ

ফিরিশতা শব্দটি ফারসী। এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে -ملك এর বহুবচন হচ্ছে- ملائك । ملك শব্দটি الك ধাতুমূল থেকে উৎকলিত হয়েছে। ملك শব্দের م অক্ষরটি অতিরিক্ত। মূল শব্দটি ছিল مألك অতঃপর হামযাকে লামের পর স্থানান্তর করা হয় তখন শব্দটি হয় ملئك বহুল ব্যবহারের কারণে হামযাটি বিলুপ্ত হয়ে ملك হয়ে যায়। বহু বচনে হামযা অক্ষরটি দৃশ্যমান হয়। শব্দটি ধ্বণিগত বিভিন্নরূপ ধারণ করলেও অর্থের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটেনি সব গুলির অর্থ একই অর্থাৎ পত্র, বাণী, দূত ইত্যদি।[৪৮৮]

পরিভাষায় বলা হয়:

جسم نوراني متشكل بأشكال مختلفة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون-

"এমন নূরানী সৃষ্টি যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে না। বরং তারা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে রত থাকে।[৪৮৯]

ফিরিশতা আল্লাহ তা'আলার এক সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁরা নূরের তৈরি। তাঁরা পুরুষও নন নারীও নন। তাঁরা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি, মানবীয় রিপু থেকে মুক্ত। তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত, সদাচারী এবং প্রভুর একান্ত অনুগত ও সর্বদা তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত।

মালাইকার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। কেননা, পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফিরিশতাগণ মহান আল্লাহর অন্যতম এক কুদরতী সৃষ্টি। এরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অদৃশ্য জগতের অংশ। এদের উপর এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে এরা আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি, তারা তাই করে যা আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন। [৪৯০]

---

৪৮৮ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, পৃ. ২৪২

৪৮৯ . মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৪৯০ . *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, ২য় সং., পৃ. ১৭৪

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহর সন্মানিত বিশেষ সৃষ্টি ও অদৃশ্য জগতের অংশ। তারা যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে পবিত্র। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার ন্যুনতম অনুভুতিও তাঁদের নেই। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ নির্দেশ পালনে ব্যস্ত থাকে। তাঁদের কাজ হচ্ছে, ইবাদত করা, প্রশংসা করা, মহত্ত্ব বর্ননা করা। সে সাথে তাঁর নির্দেশে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা।[৪৯১]

ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নূর বা আলো থেকে তৈরি করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী (স.)-এর নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন :

خلقت الملاءكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم

“ফেরেশতাগণকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিনদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তোমাদের অবহিত করা হয়েছে।”[৪৯২] ফিরিশতারা কখন সৃষ্টি হয়েছে তা জানা না বোলেও এটা জানা যায় যে, তারা মানুষের পূর্বে তারা সৃষ্টি লাভ করেছে। কেননা, পবিত্র কুরআনে মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে মানব সৃষ্টি বিষয়ে তাদের জানিয়েছেন আর ফেরেশতারা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা আদম (আ:) এর মধ্যে জ্ঞানের পরীক্ষা দিলে আদম (আ:) শতভাগ সাফল্য অর্জন করেন এবং ফিরিশতারা সকলেই তাকে সম্মান সূচক সিজদা করে সম্মান প্রদর্শন করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ – فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ – فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ -

যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, যখন আমি তাকে সুষম করবো এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো তখন তোমরা তাকে সিজদা

---

৪৯১ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩

৪৯২ . সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হা. ২২৯৪

করবে, অতঃপর ফিরিশতাগণ সকলে আদম (আ.) কে সিজদা করলো।[৪৯৩] ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত ও অবর্ণনীয়। এর সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।"[৪৯৪] ফিরিশতাদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে মহানবী (স.) মিরাজ বিষয়ক বর্ণনা থেকে আমরা একটি ধারণা লাভ করতে পারি। মহানবী (স.) বলেন:

رفع لي البيت المعروف فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه اخر ما عليهم-

"আমার সামনে বাইতুল মামুর উত্থিত হলো। আমি বললাম, হে জিবরীল, এটা কী? তিনি বললেন: ' এটি বাইতুল মামুর। প্রতিদিন এর মধ্যে সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করেন। যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা আর কখনই এখানে ফিরে আসে না।" [৪৯৫] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله-

"আকাশ শব্দ করছে এবং তার শব্দ করার অধিকার আছে, সেখানে এমন চার আঙুল পরিমাণ যায়গাও খালি নেই যেখানে একজন ফিরিশতা তাঁর কপাল রেখে আল্লাহর জন্য সিজদাবনত নেই।"[৪৯৬] অগণিত ফিরিশতাদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের নাম কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। এর মধ্যে জিবরাঈল, মিকাঈল ও মালিকের নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ-

---

৪৯৩. আল-কুরআন, ৩৮ : ৭১-৭৩; ২ : ৩০-৩৪

৪৯৪. আল-কুরআন, ৭৪: ৩১

৪৯৫. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হা. ১১৭৩, ১৪১১; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ১৪৬- ১৫০

৪৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা তিরমিযী, আস-সুনান (বৈরুত: দারু ইয়াহিয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), খ. ৪, হা. ৫৫৬

"যে ব্যক্তি আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।"[৪৯৭] জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতার নাম মালিক। জাহান্নামীরা আযাবের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নামের তত্ত্ববধায়ককে নাম ধরে ডাকবে, যাতে তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ

"তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে, তোমরা এভাবেই থাকবে।" [৪৯৮] এছাড়া ইসরাফীল নামটিও হাদীসে পাওয়া যায়। আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (স.) রাতে তাহাজ্জুদের সালাত শুরু করে সানা পাঠে বলতেন :

اللهم رب جبريل و ميكائيل واسرافيل فاطرالسماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفعون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الي صراط مستقيم-

"হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আকাশন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সকল জ্ঞানের অধিকারী, আপনি ফয়সালা করবেন আপনার বান্দাদের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত ও যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে সে বিষয়ে আপনি আপনার অনুমোদন দিয়ে আমাকে সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করুন।"[৪৯৯]

এছাড়া কোনো কোনো হাদীস গ্রন্থে জান্নাতের প্রহরীর নাম 'রিদওয়ান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কিছু সংখ্যক ফিরিশতার কর্মভিত্তিক নামও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: মালাকুল মাউত। মুনকার-নাকীর, কিরামান কাতিবীন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, মুতাওয়াতির বর্ণনায় মাত্র চারজনের নামই পাওয়া যায়। তারা হচ্ছেন, জিবরাঈল (আ.), মিকাইল (আ.), ইসরাফীল (আ.) ও মালিক (আ.)। [৫০০] ফিরিশতাগণের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না । তবে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে যা কিছু জানা যায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। পবিত্র কুরআনে এদের পাখা থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পাখার ক্ষেত্রে

---

৪৯৭ . আল-কুরআন, ২ : ৯৮

৪৯৮ . আল-কুরআন, ৪৩ : ৭৭

৪৯৯ . সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ৫৩৪

৫০০ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, পৃ. ২৪৬

তাঁদের মধ্যে কম-বেশি আছে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার, পাখা বিশিষ্ট ফিরিশতাদের বার্তাবাহক বানিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৫০১] জিব্রাঈল (আ.)-এর ছয়শত পাখা ছিল বলে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন:

ان النبي عليه السلام رأي الجبريل له ست مائة جناح-

"নবী নিশ্চয়ই নবী (স.) জিব্রাঈল (আ.) কে দেখেন, তাঁর ছিল ছয়শত টি পাখা।"[৫০২]

একটি দীর্ঘ হাদীসে আয়েশা রা. জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (স.) তাঁকে দুই বার প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। হাদীসের ভাষ্যটি হচ্ছে:

قال انما هو جبريل لم اراه علي منهبطا من السماء جسادا عظم خلقه ما بين السماء الي الارض

"তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) বলেন, এ হলো জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি এই দু'বার ছাড়া আর কখনও দেখিনি। তাঁকে দেখালাম তিনি আকাশ থেকে নেমে আসছেন। তাঁর আকৃতির বিশালত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।"[৫০৩]

জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতিতে মরিয়ম (আ.) নিকট যেতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

"তখন আমি তার কাছে আমার রূহকে প্রেরণ করলাম, সে তাঁর নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।"[৫০৪]

---

৫০১ . আল-কুরআন, ৩৫ : ১

৫০২ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হা. ১১৮১; খ. ৪, হা. ১৮৪০, ১৮৪১

৫০৩ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হা. ১১৮১, সহীহ মুসলিম-, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ১৫৯-১৬১

৫০৪ . আল-কুরআন, ১৯ : ১৭

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে এও বুঝা যায় যে, জিবরাঈল (আ.) আকৃতি পরিবর্তনও করতেন। কেননা, তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে তিনি তাঁকে মাত্র দুবার দেখেছেন। অন্য যতবার দেখা হয়েছে তা অন্য আকৃতিতে। জিবরাঈল (আ.) মানব আকৃতিতে মহানবী (স.) এর দরবারে এসেছেন, সাহাবীদের সাথে বসেছেন এবং সাহাবীদের শিক্ষাদানের জন্য মহানবী (স.) কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। তিনি চলে যাওয়ার পর মহানবী (স.) সাহাবীদের বলেছেন যে, ইনি জিবরাঈল (আ.)। এছাড়া তিনি মানবাকৃতিতে মহানবী (স.)-এর নিকট ওহী নিয়ে এসেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাহাবী দিহইয়া ক্বালবী (রা.)-এর আকৃতিতে তিনি মহানবী (স.)-এর নিকট আসতেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ফিরিশতাগণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন। ফিরিশতাগণ যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা ক্লান্তি, কামনা-বাসনা, পাপাচারিতা এমনকি পাপের ইচ্ছা থেকেও মুক্ত। তাঁরা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন। এই নির্দেশের বাইরে তাঁরা কোনো কিছুই করেন না। তারা নিষ্কলুষ পবিত্র ও সম্মানিত আত্মার অধিকারী। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ - لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ -

"তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান। তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না। তারাতো তার আদেশ অনুসারে কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, তিনি যাদের সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপরিচিত করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।"[৫০৫] ফিরিশতাগণ সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকেন, ক্লান্তিহীনভাবে তাঁরা মহান আল্লাহর গুণগান করেন, তাসবীহ তাহলীল পাঠ করেন সেই সাথে আল্লাহ তা'আলা যখন যে আদেশ প্রদান করেন তারা তা দ্বিধাহীন চিত্তে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূঙ্খানুপুঙ্খ পালন করেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কাউকে কাউকে বিশেষ দায়িত্বও দিয়ে থাকেন আর তারা সে দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

---

৫০৫ . আল-কুরআন, ২১ : ২৬-২৮

“আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে যে নির্দেশ দেন, তা তাঁরা লঙ্ঘন করে না এবং তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা তাঁরা পালন করে।”[৫০৬] তাঁদের ক্লান্তিহীন ইবাদতের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন:

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ - يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

“আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তা তাঁরই। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কার বশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাঁরা শৈথল্য করে না।”[৫০৭] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

“যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহঙ্কার বশত তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয় না, তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সাজদাবনত হয়।”[৫০৮] আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীদের বিশ্বাস হচ্ছে ফিরিশতাগণ মহান আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا - وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا- وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا- فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا - فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا -

“শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে মুলোৎপাটন করে। আর যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয়। এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। আর যারা গতিবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর যারা কর্মনির্বাহ করে।”[৫০৯] এখানে তারা মুলোৎপাটন বলতে কাফিরদের প্রাণ নির্মমভাবে উৎপাটন করা বলে বিশ্বাস করেন। সেই সাথে মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করা দ্বারা মুমিনের প্রাণ মৃদুভাবে অর্থাৎ কষ্টহীন ভাবে কবচ করা বিশ্বাস করেন। এছাড়া কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশাবলি নিয়ে মহাবিশ্বে সন্তরণ করেন। আবার কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশিত কর্মসমূহ নির্বাহ করেন।[৫১০] ফিরিশতাদের মধ্যে কর্ম

---

৫০৬. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬

৫০৭. আল-কুরআন, ২১ : ২০

৫০৮. আল-কুরআন, ৭ : ২০৬

৫০৯. আল-কুরআন, ৭৯ : ১-৫

৫১০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। এক একজন একেক কাজে ব্যস্ত থাকেন। মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণের জন্য একদল ফিরিশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ -

"অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু কাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ক্রুটি করে না।"[৫১১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ -

"আপনি বলুন! তোমাদের জন্য নিযুক্ত 'মালাকুল মাওত' তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।"[৫১২] ফিরিশতাদের একটি মৌলিক দায়িত্ব ছিল নবী ও রাসূলগণের নিকট আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশ পৌঁছানো। এ ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ.)-এর নাম প্রনিধাণযোগ্য। তবে ইসরাফীল (আ.) কর্তৃক ওহী নিয়ে আগমনের প্রমাণও হাদীসে রয়েছে। মহান আল্লাহ কিছু ফিরিশতাকে মানুষে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশে মানুষের রক্ষণাবেক্ষণে প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

"মানুষের জন্য তার সামনে ও তার পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে। তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণা বেক্ষণ করে।"[৫১৩] ফিরিশতাদের একটি দল মানুষের কল্যাণ কর্মে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এ সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর বক্তব্য প্রনিধাণযোগ্য। তিনি বলেন :

ان للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمة الملك فايعاد بالخير و تصديق بالحق

"শয়তান মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়, আবার ফেরেশতাও মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়। শয়তানের প্রেরণা অশুভ ও অকল্যানের ওয়াদা করা এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রেরণা। ফিরিশতার প্রেরণা হলো কল্যাণ ও মঙ্গল করা এবং সত্যকে মেনে নেয়া।"[৫১৪]

---

৫১১ . আল-কুরআন, ০৬ : ৬১

৫১২ . আল-কুরআন, ৩২ : ১১

৫১৩ আল-কুরআন, ১৩ : ১১

ফিরিশতাগণ মুমিনের মনে শুধু ভালো কাজের প্রেরণা যোগায় না তাঁরা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য দোয়া ও সুপারিশ করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ -رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ – وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তুমিতো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।”[৫১৫] উপর্যুক্ত আয়াত থেকে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা‘আলার আরশ ফিরিশতারা বহন করে থাকে। মহান আরশ বহন করা তাঁদের অন্যতম একটি প্রধান কাজ। এ কাজে আটজন সম্মানিত ফিরিশতা নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

“এবং সেই দিন আটজন তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।”[৫১৬]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ – كِرَامًا كَاتِبِينَ – يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

৫১৪ . সুনানু তিরমিযি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হা. ২১৯

৫১৫ . আল-কুরআন, ৪০ : ৭-৯

৫১৬ . আল-কুরআন, ৬৯ : ১৭

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ রয়েছে; সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর।"[৫১৭]

এ ছাড়াও মহান আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির ফিরিশতার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আর তারা যে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট বাঙালি আলেম খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের বক্তব্য প্রনিধাণযোগ্য। তিনি বলেন:

"চাঁদ-সূর্যের জন্য। পাহাড়-পর্বতের জন্য, আকাশের বিভিন্ন স্থানের জন্য , মেঘের জন্য , বৃষ্টির জন্য মাতৃগর্ভের ভ্রুণের জন্য, জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাপীদের শাস্তিদানের জন্য, জান্নাতবাসী মুমিনদের খেদমত ও শান্তিদানের জন্য বিভিন্ন মালাককে দায়িত্ব প্রদান করেছেন আল্লাহ। মুসলিমদের জিকিরের মজলিস, আলোচনার মজলিস, সালাতের জামায়াত ইত্যাদি সৎকর্মে উপস্থিত থাকেন কিছু মালাক, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্য প্রেরিত সালাত ও সালাম তাঁর রওযা মুবারকে পৌঁছে দেন কিছু মালাক, মৃত্যুর পরে বা কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন মুনকার নাকির নামক মালাক। 'মালিক' (আ.) কে দিয়েছেন জাহান্নামের তত্ত্বধানের দায়িত্ব। ইসরাফীল (আ.) কে দিয়েছেন কিয়ামতের সিংগায় ফুৎকার দানের দায়িত্ব। মিকাঈল (আ.) কে দিয়েছেন বৃষ্টিপাত ও ফল-ফসলের দায়িত্ব। এভাবে বিভিন্ন হাদীস থেকে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ফিরিশতাদের কথা আমরা জানতে পারি যারা বিশ্বজগত পরিচালনায় আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাস্তবায়ন করেন। তাই মুসলিমরা বিশ্বোস করেন যে, চাঁদ, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি আল্লাহর সকল সৃষ্টি যেমন তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। তেমনি এ সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর নিয়ম ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মালাকগণ। সকল সৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। সকল প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁরই ইচ্ছা ও নির্দেশের অধীন। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।"[৫১৮]

---

৫১৭ . আল-কুরআন, ৮২ : ১০-১২

৫১৮. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিতাব সম্পর্কে মতাদর্শ

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত সকল কিতাবের উপর ঈমান আনতে হবে।[৫১৯] এ সমস্ত কিতাব আল্লাহর বাণী, মানব রচিত নয়।[৫২০] আল্লাহ যেমন অনাদি ও চিরন্তন তেমনি তাঁর বাণী বা আলামত অনাদি ও চিরন্তন। [৫২১] আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল-কুরআন। আর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিধি-বিধান রহিত হয়ে গেছে। ফলে কুরআনেই শুধু অনুসরণ করতে হবে। [৫২২] কুরআন সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। তারপর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিধানই চলবে। অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গেছে। [৫২৩] কুরআন সর্বদা অবিকৃত থাকবে। কেননা, এর হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিয়েছেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা যায়।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ-

"আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আর অবশ্যই আমি তাঁর হিফাজতকারী।[৫২৪]

বর্ণ ও অর্থ উভয়টি মিলেই আল্লাহর বাণী-পবিত্র কুরআন। এটি আল্লাহর সৃষ্টি নয়- আল্লাহর কালাম। তাঁর থেকেই এর শুরু এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে। এটি মহানবী (স.)-এর শ্রেষ্ঠ মুজিযা। এটি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালার দায়িত্বে সংরক্ষিত থাকবে।[৫২৫] আল্লাহ তা'আলা যার সাথে যে ভাবে ইচ্ছা কথা বলেন, তাঁর কথা বর্ণ ও আওয়াজের সমন্বয়ে গঠিত কিন্তু তাঁর কথা বলার ধরন আমাদের জানার বাইরে। মানুষের কথা কখনো আল্লাহ তা'আলার কালামের

---

৫১৯. ড. নাসের ইবন আবুল করীম আল-আকল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

৫২০. মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

৫২১. ড. নাসের ইবন আবুল করীম আল-আকল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

৫২২. *প্রাগুক্ত*

৫২৩. মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

৫২৪. আল-কুরআন, ১৫ : ০৯

৫২৫. ড. নাসের ইবন আবুল করীম আল-আকল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

সমান হতে পারে না। মানুষ কখনো আল্লাহর কালামের মতো কোন কালাম বানাতে সক্ষম হবে না।[৫২৬] কোন ব্যক্তি যদি কুরআনের কোন কিছুকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে কিংবা মনে করে এটি ত্রুটিপূর্ণ অথবা এতে পরিবর্তন পরিবর্ধণ করা হয়েছে অথবা এতে বিকৃতি আছে তাহলে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির।[৫২৭] কেউ যদি মনে করে পবিত্র কুরআন এক অন্তর্নিহিত ভাবের নাম বা অন্য কিছু থেকে নেওয়া একটি বর্ণনামাত্র অথবা এটি রূপক বা অসাধারণভাবে অন্তরে উদিত হওয়া এক উৎকর্ষের নাম তাহলে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা ও বক্রতায় নিমজ্জিত। এ ধরনের উক্তি নিঃসন্দেহে কুফুরী।[৫২৮] সালফে সালেহীন তথা সাহাবায়ি কিরাম ও তাবেয়ীগণ যে পদ্ধতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন সেই পদ্ধতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়। শুধু নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা অবৈধ।[৫২৯]

মোট কথা পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি সৃষ্ট কোন বিষয় নয়। এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ। এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মানবতার বন্ধু, করুণার সিন্ধু আশরাফুল আম্বিয়া হযরত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর অবতারিত। গোটা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য এ মহাগ্রন্থ অবতারিত হয়েছে। এতে কোন ভুল-ত্রুটি, বিকৃতি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। এর কোন অংশ প্রকাশিত কোন অংশ গোপনীয় এমন কোন বিষয় নেই। এটি কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। এর হিফাজতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। এটি মহানবী (স.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। এটি কাফির মুশরিকদের চ্যালেঞ্জ করেছে। আর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ পর্যন্ত কেউ সক্ষম হয়নি।

---

৫২৬. ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত্‌ত্বহাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

৫২৭. ড. নাসের ইবন আবুল করীম আল-আকল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৫২৮. *প্রাগুক্ত*

৫২৯. *প্রাগুক্ত*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আখিরাত সম্পর্কে মতাদর্শ

আখিরাত হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। এ বিশ্ব নিচয়ের যেমন শুরু আছে তেমনি শেষও আছে। এরপর কী? এরপর আখিরাত। একজন মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সে চলে যায় আখিরাতে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করে। সকল আসমানী কিতাব পরকালের বিশ্বাসের ব্যাপারে একমত। [৫৩০]

আখিরাতে অবিশ্বাস করলে ঈমান থাকে না। পবিত্র কুরআনে অল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ-

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। [৫৩১]

আখিরাতে বিশ্বাস বলতে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যা কিছু ঘটবে তাতে বিশ্বাস করা। আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি হলো কবর। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ কবরের সওয়াল জওয়াবকে সত্য মনে করে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক কবরবাসীকে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হবে। মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফিরিশতা কবরবাসীকে তিনটি প্রশ্ন করবে। প্রশ্নগুলো হচ্ছে :

১. তোমার রব কে?

২. তোমার দ্বীন কী?

৩. তোমার রাসূল (স.) কে?

যে এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে তার কবরের সাথে জান্নাতের সংযোগ করে দেওয়া হবে। আর যে এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে না তার কবরের সাথে জাহান্নামকে সংযোগ করে দেওয়া হবে।[৫৩২]

---

৫৩০ . মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১

৫৩১ . আল-কুরআন, ০৯ : ২৯

৫৩২ . মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরস্ত করা হবে, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট কালো দু'জন ফিরিশতা আগমন করবে। যাদের একজনকে বলা হয় মুনকার অন্য জনকে বলা হয় নাকীর। কবরের সওয়াল জওয়াব মুমিন গায়রে মুমিন সকলের ক্ষেত্রেই হবে। তবে নবী-রাসূলগণ ও শহীদদের উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে কবরে তাঁদের প্রশ্ন করা হবে না।[৫৩৩]

কবরের সুখ-শান্তি

মৃতকে কবরে জীবিত করা হবে। অতঃপর মুনকার নাকীর ফিরিশতা তাকে তিনটি প্রশ্ন করবে। নেককার বান্দা এ সবের উত্তর দিতে সক্ষম হবে। আর পাপী বান্দা এর উত্তর দিতে পারবে না। যারা উত্তর দিতে পারবে তাদের কবরের সাথে জান্নাতের সংযোগ স্থাপন করা হবে। আর যারা সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে না তাদের কবরের সাথে জাহান্নামকে সংযোগ করে দেওয়া হবে। কবরের জীবনকে বারযাখ বলা হয়। আর এ জগতের সময়সীমা হলো কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ -

"তাদের পশ্চাতে রয়েছে বারযাখ তাদের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"[৫৩৪] পাপী বান্দাদের কবরে আযাব চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কবরের শাস্তি রূহের উপর আপতিত হবে। আর রূহের সাথে দেহও এ আযাব উপলব্ধি করে থাকে। সুতরাং দেহ অবশিষ্ট থাকা না থাকা বিষয়টি ধর্তব্য নয়।[৫৩৫]

পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও আমলের প্রতিদান

মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুক দিবেন। এতে করে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ ব্যতীত সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মহান আল্লাহর ইচ্ছায় জিন-ইনসান পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। পবিত্র কুরআনে অল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

৫৩৩. *প্রাগুক্ত*

৫৩৪. আল-কুরআন, ২৩ : ১০০

৫৩৫. মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ-

"শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে চান তারা ছাড়া সকলে বেহুশ হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার ফুৎকার দেওয়া হবে তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।"[৫৩৬]

পুনরুত্থান হচ্ছে পুনর্বার সৃষ্টি। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে প্রথমবারের সৃষ্টির চেয়ে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি সহজ। আর আল্লাহর জন্য তো সর্বদাই সবকিছু সহজ। তিনি কুন বললেই হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি বিষয়টি তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আকলী দলীল পেশ করেছেন এভাবে :

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ-قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ -

"অস্থিতে কে প্রাণসঞ্চায় করবে, যখন তা পচে যাবে? আপনি বলুন! তাতে প্রাণসঞ্চার করবেন তিনি, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।"[৫৩৭] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

"তিনি ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন। অতঃপর আবার তাকে সৃষ্টি করবেন। পুনর্বার সৃষ্টি করা তার জন্য আরো সহজ। [৫৩৮] মহান আল্লাহ আরো বলেন :

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনর্বার সৃষ্টি করবো।"[৫৩৯] মানুষ ও জিন যখন পুনর্জীবিত হবে তখন তারা বিচারের সম্মুখীন হবে। সেদিন লোকদেরকে তাঁর কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ-

---

৫৩৬. আল-কুরআন, ৩৯ : ৬৮

৫৩৭. আল-কুরআন, ৩৬ : ৭৮-৭৯

৫৩৮. আল-কুরআন, ৩০ ; ২৭

৫৩৯. আল-কুরআন, ২১ : ১০৪

“অনন্তর সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। [৫৪০] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا -

“নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর এগুলোর সব কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” [৫৪১]

কিয়ামত দিবসে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মানুষের এক পা নড়াবারও ক্ষমতা থাকবে না। বিষয়গুলো হচ্ছে তাঁর জীবন কোথায় ব্যয় করেছিল, যা জেনেছিল তাঁর কতটুকু আমল করেছিল, তাঁর সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছিল এবং তা কোথায় ব্যয় করেছিল আর দেহ কোথায় ক্ষয় করেছিল। কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ মানুষকে সাওয়াল করবেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ হলো এ সওয়াল নিঃসন্দেহে সত্য। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ মুমিনদের কাছে আনবেন অতঃপর তাঁর দিকে ঝুকবেন, তাঁর উপর পর্দা ঢেলে দিবেন, তাঁর থেকে তাঁর পাপের স্বীকৃতি নিবেন, তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এমন এমন পাপ চেন কি? সে বলবে হ্যা, প্রভু। অবশেষে যখন তাঁর পাপের স্বীকৃতি নেওয়া হবে তখন সে ভাববে আমার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এসব পাপ গোপন করে রেখেছিলাম, আজও আমি তা ক্ষমা করে দিব। অতঃপর নেক আমলনামা তাঁর হাতে দেওয়া হবে।

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমলনামা তাদের সামনে পেশ করবেন। জীবনের সকল কর্মের হিসাব নিবেন। এতে সে দুনিয়ায় যা কিছু করেছে সব দেখতে পাবে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়টির উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারা এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا—

“প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিপি আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি; কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি গ্রন্থ বের করে দেবো, সে তা খোলা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখবে।”[৫৪২]

---

৫৪০ . আল-কুরআন, ১০২ : ০৮

৫৪১ . আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

তিনি অন্যত্র বলেন:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ – فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ – وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ –

"সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশিত হবে যাতে করে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। সুতরাং কেউ অনু পরিমাণ ভালো কর্ম করলে তা দেখতে পাবে আর অনু পরিমাণ মন্দ কর্ম করবে তাও সে দেখতে পাবে।"[৫৪৩]

কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে। আর এ হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে যে ফলাফল আসবে তা বান্দাকে দেখানো হবে। হিসাব নেওয়ার ক্ষেত্রে সামান্যতম বেইনসাফ করা হবে না। পুঙ্খানোপুঙ্গ হিসাব নেওয়া হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হিসাব নিকাশ কীভাবে নেওয়া হবে। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হচ্ছে, এ জন্য মিযান স্থাপন করা হবে। এটি একটি দাড়িপাল্লা। এর স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এর দ্বারাই নেকি বদির ওজন করা হবে। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ-

"কিয়ামতের দিন আমি ইনসাফের দাড়িপাল্লা কায়েম করবো।"[৫৪৪] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ – وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ –

"সেদিনকার ওযন সত্য। তখন যাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে। তারা সফলকাম, আর যাদের নেকির পাল্লা হালকা হবে, তারা এমন লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এভাবে যে, তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করতো।" [৫৪৫]

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন :

---

৫৪২. আল-কুরআন, ১৭ : ১৩

৫৪৩. আল-কুরআন, ৯৯ : ৬-৮

৫৪৪. আল-কুরআন, ২১ : ৪৭

৫৪৫. আল-কুরআন, ০৭ : ৮-৯

ما شيئ اثقل من ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن-

"কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কিছু রাখা হবে না।"[৫৪৬]

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এ ব্যাপারে মতাদর্শ হলো, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলকে দেহে রূপান্তরিত করা হবে। অতঃপর সে দেহ ওযন করা হবে। অথবা আমলকে কোনো দেহে রেখে তাকে ওযন দেওয়া হবে।[৫৪৭]

কিতাব বা আমলনামা

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আমলনামা সম্পর্কে অভিমত হলো, এটা চিরসত্য। এতে মানুষের ভালো মন্দ লেখা থাকবে। আর এ আমলনামা মুমিনদের ডান হাতে কাফেরদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তাদের এ সম্পর্কিত দলীল নিম্নরূপ :

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا

"আমরা তার জন্য কিয়ামত দিবসে কিতাব বা আমলনামা বের করবো। যা তাঁর সাথে বিস্তৃত অবস্থায় প্রকাশিত হবে।"[৫৪৮]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ – فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

"যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, অবশ্যই তাঁর হিসাব সহজতর হবে।"[৫৪৯] আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এ বিষয়ে তৃতীয় নকলী দলীল হচ্ছে :

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا -

"আজ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমিই তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ট।"[৫৫০]

আমলনামা পেয়ে কেউ খুব খুশি হবে আবার কেউ কেউ আফসোস করতে থাকবে। খুশি হবে তারাই যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। আর ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে

---

৫৪৬ .সুনানু তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ২০০২

৫৪৭ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

৫৪৮ . আল-কুরআন, ১৭ : ১৩

৫৪৯ . আল-কুরআন, ৮৪ : ০৭-০৮

৫৫০ . আল-কুরআন, ১৭ : ১৩

তাদেরকেই যাদের পাপের চেয়ে পূণ্য বেশি আর বাম হাতে আমলনামা দেওয়া তাদেরকে যাদের পূণ্যের চেয়ে পাপই বেশি। তাদের দুঃখ-দুর্দশারর অন্ত থাকবে না। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর ডান হাতে আমলনামা পাওয়া ব্যক্তির ঠিকানা হবে জান্নাত।

কাওসার

কবর থেকে উঠার পর হাশরের ময়দানে মানুষ একত্রিত হবে। সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি পিপাসার্ত থাকবে। তাদেরকে পানি পান করানোর জন্য প্রত্যেক নবীকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা একটি করে হাউজ দান করবেন। আর নবী-রাসূলগণ তাঁদের মুমিন উম্মতদের পানি পান করাবেন। এ সব হাউজের এক পিয়ালা পানি যে ব্যক্তি পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। মহানবী (স.) কে যে হাউজ দান করা হবে তাঁর নাম হাউজে কাওসার। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -

"অবশ্যই আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি।"[৫৫১]

الكوثر শব্দের অর্থ الكثرة من كل شيئ তথা সব জিনিসের আধিক্য। বিশেষ অর্থে الخير الكثير বা প্রচুর কল্যাণ।[৫৫২]

হাদীসে এসেছে, এটি জান্নাতের একটি নহর। এতে অজস্র কল্যাণ রয়েছে। কিয়ামত দিবসে মহানবী (স.) এখান থেকে তাঁর উম্মতের লোকদের পানি পান করাবেন। এর পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম। আর একবার যে এর পানি পান করবে তাঁর আর কখনও তৃষ্ণা লাগবে না। তাঁর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হচ্ছে ওমান থেকে আইলার সমপরিমাণ। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি। প্রকৃত মুমিন যারা তারাই এর পানি পান করবে। আর যারা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে অর্থাৎ বিদ'আত প্রচলণ করবে তাদেরকে এ হাউজের পানি পান করতে দেওয়া হবে না।

---

৫৫১. আল-কুরআন, ১০৮ : ০১

৫৫২. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, *তাফসীরে আমপারা* (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৫১

পুলসিরাত

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মতাদর্শ হলো পুলসিরাত সত্য। জাহান্নামকে হাশরের ময়দানের নিকটবর্তী করা হবে এবং এর উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। এটি একটি দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ পুল যা চুলের চেয়ে সরু এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো। সকলকেই এ পুল পাড়ি দিতে হবে। যে ব্যক্তি এ পুল পাড়ি দিতে ব্যর্থ হবে। সে জাহান্নামে পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি এ পুল পাড়ি দিতে সক্ষম হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দুনিয়ার জীবনে যে যেভাবে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে চলেছে সে সেভাবে পুলসিরাত পার হবে। মুমিনদের মধ্য থেকে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ পাখির ন্যায়, কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায়, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে সাধারণ সওয়ারীর মতো, আবার কেউ হামাগুড়ি দিয়ে উক্ত পুল পার হবে। কেউ অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে, আবার কেউ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যার নেক আমল সামান্য থাকবে তার এ পুল পাড়ি দিতে কষ্ট হবে। পুলের মধ্যে সাঁড়াশি ও আংটা থাকবে। সে তার যাত্রীকে নিচে জাহান্নামে ফেলে দিতে চাইবে। সর্বপ্রথম মহানবী (স.) ও তাঁর উম্মাত এ পুল পার হবে।

জান্নাত

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশ্বাস করে জান্নাত আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নিয়ামত। এটি চিরকাল থাকবে কখনও ধ্বংস হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সালেহ বান্দাহকে হুকুম মান্য করার পুরস্কার হিসেবে আখিরাতে যে উন্নত বাসস্থান দান করবেন তাই জান্নাত। সেখানে বান্দা চিরকাল চিরসুখে অবস্থান করবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ – يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ – كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ – يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ – لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ – فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝরনার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরো রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখি হয়ে বসবে।্ রূপ ঘটবে; তাদেও সঙ্গিনী দিব আয়তলোচনা হুর , সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যুর সাবাদ গ্রহণ করবে না। তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। উহা মহাসাফল্য।”[৫৫৩] জান্নাতে আল্লাহ তা‘আলা এমন সব নিয়ামত মওজুদ করে রেখেছেন যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, কোন অন্তর ধারণা পর্যন্ত করতে পারেনি।

জান্নাত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ :

জান্নাত আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টবস্তু। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নকলী দলিল প্রণিধানযোগ্য:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ -

“তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।”[৫৫৪]

১। জান্নাত আল্লাহ তা’য়ালা তৈরি করে রেখেছেন, মহানবী (স.) জান্নাত অবলোকন করেছেন।

২। ঈমানদার ব্যতীত জান্নাতে কেউ প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।

৩। জান্নাতের অধিবাসীগণ চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে।

৪। জান্নাত মুমিনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত।

৫। জান্নাতের আটটি স্তর রয়েছে। মুমিনগণ আমলের ভিত্তিতে এককেটি স্তরে অবস্থান করবে।

জাহান্নাম

জাহান্নাম আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। একে সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্য যে, যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ অমান্য করবে, সেখানে তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। বান্দার ভালো কাজের পুরস্কার যেমন জান্নাত তেমনি মন্দ কাজের শাস্তির জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এটি সমগ্র সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

৫৫৩. আল-কুরআনুল কারীম, ৪৪ : ৫১-৫৭

৫৫৪. আল-কুরআনুল কারীম, ০৩ : ১৩৩

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ -

"জাহান্নামে তাঁরা পৌঁছবে আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল।" [৫৫৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

"আমি কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে কারাঘাওে পরিণত কওে রেখেছি।"[৫৫৬]

জাহান্নাম সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা :

১। জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি।

২। পাপীদের শাস্তির জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে।

৪। মুমিনদের মধ্যে যাদের পাপের পরিমাণ পূণ্যের চেয়ে বেশি হবে তারাও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থান করবে। তবে পাপ মোচন হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৫। তাওবা ব্যতীত কবীরা গুণাহগার মুমিনগণ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থান করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬। জাহান্নামের স্তর হচ্ছে সাতটি।

৭। জাহান্নাম হচ্ছে সমগ্র বস্ত নিচয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট স্থান ও আবাসস্থল।

আরাফ

আরাফ হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থিত স্থান। এটা কোনো স্থায়ী জায়গা নয়। যাদের পাপ ও পূণ্য সমান হবে তাদেরকে সাময়িকভাবে এখানে অবস্থান করানো হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ -

---

৫৫৫. আল-কুরআন, ১৪ : ২৯

৫৫৬. আল-কুরআন, ১৭ : ০৮

“তাদের উভয়ের (জান্নাতী ও জাহান্নামীদের) মাঝে থাকবে আঁড় এবং আরাফে কিছু লোক অবস্থান করবে, যাদের সকলকে তাদের চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে।” [৫৫৭]

যে সকল ব্যক্তি আরাফে অবস্থান করবে এক সময় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

“তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা দুঃখিতও হবে না।” [৫৫৮]

কবীরা গুনাহ সম্পর্কে মতাদর্শ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মনে করে আল্লাহ তা'আলা কবীরা গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন যদি বান্দা এ গুনাহকে হালাল মনে না করে থাকে। আবার তিনি সগীরা গুনাহের জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। এ সম্পর্কে তাদের দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ -

“আল্লাহর সাথে শরীক করাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; (অন্য গুনাহের ক্ষেত্রে) যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।”[৫৫৯]

উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ কথা প্রমাণ করতে চান যে, শিরক ছাড়া আল্লাহ তা'আলা অন্য সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন যদি বান্দা তাওবা করে। হত্যাকারী কবীরা গোনাহে লিপ্ত এবং তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব। অথচ হত্যাকারীকে আল্লাহ তা'আলা মুমিন বলে সম্ভোধন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

“ হে মুমিনগণ তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস ফরয করা হয়েছে।”[৫৬০]

---

৫৫৭. আল-কুরআন, ০৭ : ৪৬

৫৫৮. আল-কুরআন, ০৭ : ৪৯

৫৫৯. আল-কুরআন, ০৪ : ১১৬

৫৬০. আল-কুরআন, ০২ : ১৭৮

শাফায়াত

শাফায়াত অর্থ সুপারিশ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত শাফায়াত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত আকীদা পোষণ করে থাকে :

১। শাফায়াত সত্য। এটি نصوص দ্বারা প্রমাণিত।

২। আখিরাতে রাসূল (স.), অন্যান্য আম্বিয়া (আ.), হাফিজ, মুজাহিদ, এমনকি মুমিনদের পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করা হবে। সে সাথে শাফায়াত কবুলও করা হবে।

৩। মহানবী (স.) বিভিন্ন পর্যায়ে শাফায়াত করবেন।

৪। মহানবী (স.) হাশরের ময়দানের কষ্ট লাগব করা এবং বিচার শুরু করার জন্য শাফায়াত করবেন। এটাকে শাফায়াতে কুবরা বলা হয়।

৫। মহানবী (স.) হাশরের হিসাব ও সওয়াল সহজ করার জন্য শাফায়াত করবেন।

৬। কোনো কোনো কাফেরের আযাব সহজ করার জন্য।

৭। কোনো কোনো মুমিনকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য।

৮। কোনো কোনো মুমিনকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য।

৯। কোনো কোনো মুমিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে দেওয়ার জন্য।

১০। আরাফে অবস্থানকারীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য।

১১। জান্নাতে কোনো কোনো মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

১২। মুজাহিদ, হাফিজ, শহীদ ও মুমিনগণ মুমিনদের ক্ষমা করার সুপারিশ করবেন।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কেউ শাফায়াত করতে পারবে না। যিনি শাফায়াত করবেন এবং যার পক্ষে শাফায়াত করা হবে উভয়ের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলার অনুমোদন আবশ্যক।[৫৬১]

---

৫৬১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

আল্লাহর দিদার

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মনে করে জান্নাতে আল্লাহর দিদার লাভ হবে। প্রত্যেক জান্নাতী তাঁর আমল অনুযায়ী আল্লাহর দিদার লাভ করবে। কেউ কেউ এমন ভাগ্যবান থাকবেন যারা সর্বদা আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হবেন। আবার কেউ কেউ এমন থাকবেন যারা জীবনে মাত্র একবার আল্লাহর দিদার লাভ করবেন। জান্নাতে আল্লাহর দিদার সত্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ – إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ -

"সেদিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল থাকবে, তাঁরা তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিপাত করবে।"[৫৬২]
মহানবী (স.) এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة يعنى البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته-

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে প্রকাশ্যভাবে।"[৫৬৩]
আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر اذا كانت صحوا قلنا لا قال فانكم لا تضارون فى رؤية ربكم يومئذ الا كما تضارون فى رؤيته-

"আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখব? তিনি বলেন, আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্য বা চন্দ্র দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন, সেদিন তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হবে না, ঠিক যেমন চন্দ্র ও সূর্য দেখতে অসুবিধা হয় না।"[৫৬৪]
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বহু নকলী দলীলের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পায় যে, কিয়ামত দিবসে বান্দা তার প্রতিপালককে চর্মচক্ষে অবলোকন করবে।

---

৫৬২ . আল-কুরআন, ৭৫ : ২২-২৩

৫৬৩ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ২০৩; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ৪৩৯

৫৬৪ . সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ২৭৭; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, হা. ১৬৩-১৬৭

চতুর্থ অধ্যায়
শীআ : পরিচিতি ও মতাদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ
শীআ পরিচিতি

শীআ-এর শাব্দিক পরিচয়

শীআ শব্দটি আরবী। এর অর্থ : দল, অনুসারী, সাহায্যকারী। যেমন বলা হয়! هؤلاء شيعة فلان 'ঐ সমস্ত লোক অমুকের দল অর্থাৎ তার অনুসারী ও সাহায্যকারী। শব্দটি একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকল ক্ষেত্রে একরূপে ব্যবহৃত হয়।[৫৬৫]

শীআ শব্দটি পবিত্র কুরআনে রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

'' আর ইব্রাহীম তো তাঁর (নূহ) অনুগামীদের অন্তর্ভূক্ত।'' [৫৬৬] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ

''একজন তার নিজ দলের অন্যজন তাঁর শত্রুদলের।''[৫৬৭]

শীআ-এর পারিভাষিক পরিচয়

শীআদের পরিচয় দিতে গিয়ে হারুন মাদানী বলেন, ' প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শীআ নাম প্রযোজ্য হবে যে আলী (রা.) কে তার পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদার উপর প্রাধান্য দেয় এবং মনে করে যে, খেলাফতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হকদার বা যোগ্য হলেন রাসূল (স.) -এর আহলে বাইত।'[৫৬৮]

---

৫৬৫ . হারুন মাদানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২

৫৬৬ . আল-কুরআন, ৩৭ :৮৩

৫৬৭ . আল-কুরআন, ২৮ : ১৫

৫৬৮ . হারুন মাদানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩

শীআ আলিম আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈর মতে, যারা মহানবী (স.)-এর পরিবারকে তাঁর প্রকৃত ও একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে মনে করেন, তারাই শীআ। তারা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পবিত্র আহলে বাইতের আদর্শের অনুসারী।[৫৬৯]
শীআ সম্প্রদায় আলী (রা.)-এর গোড়া অনুসারী। তারা মনে করে খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)। খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম তিন খলীফার খিলাফতকে তারা অস্বীকার করে। তারা মনে করে খলীফা শুধু আহলে বাইত থেকেই হতে হবে। শীআ প্রথমত রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তারা প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সম্প্রদায়টি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে পরিচালিত হয়। মুহাম্মদ (স.) এর ইন্তিকালের পর আলী (রা.) হবেন তাঁর উত্তরসূরী খলীফা এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে শীআ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।[৫৭০]

মহানবী (স.) ইন্তেকালের পূর্বে কাউকে তার খলীফা নিয়োগ করে যাননি। তাঁর ইন্তিকালের পর আবুবকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। এ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আলী (রা.) এবং অল্প কিছু সাহাবী অনুপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ায় আলী (রা.) এর কিছু ভক্ত-অনুসারী মর্মাহত হয়। তারা আশা করেছিলেন আলী (রা.) খলীফা হবেন। পরপর তিনবার তাদের আশাহত হতে হয়। অতঃপর ওসমান (রা.) এর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর আলী (রা.) খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিরিয়ার ওয়ালী মুআবিয়া (রা.) আলী (রা.) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেননি। এক্ষেত্রে তিনি কিছু শর্ত আরোপ করেন। পরিশেষে কোন সমঝোতা না হওয়ায় উভয় পক্ষ যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়। যুদ্ধ এক পর্যায়ে সালিশের দিক ধাবিত হয়। আর সালিশও ভেস্তে যায়। অতঃপর আলী (রা.) শাহাদাৎ বরণ করেন। মুআবিয়া (রা.) মুসলিম জাহানের খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং হাসান (রা.) এর সাথে তার একটি সমঝোতাও হয়। অতঃপর শেষ বয়সে তিনি তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে ভাবী খলীফা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইন্তেকাল করেন। ইয়াযিদ খিলাফতের মসনদে আসীন হলে হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.)

---

৫৬৯ . আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, অনু. মো: সামছুল আযম ও আলী নওয়াজ খাঁন, ইসলাম ও শীয়া মাযহাব (কোম: আহলে বাইত (আ:) বিশ্ব সংস্থা, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২৩

৫৭০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

তাকে মেনে নেননি। হাসান (রা.) কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আর হুসাইন (রা.) কারবালার প্রান্তরে পরিবার পরিজনসহ শাহাদাৎ বরণ করেন। বারবার আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরদের নিয়ে আশাহত হওয়া এবং কারবালার নৃশংস হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে শীআ সম্প্রদায় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কালক্রমে দলটি ধর্মতাত্ত্বিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শীআ সম্প্রদায়ের উপদল সমূহ

শীআদের প্রথমত তিনটি উপদল রয়েছে। যথা :

(১) তাফযীলিয়্যা

(২)সাবইয়্যা

(৩) গুলাক

তাফযীলিয়্যা

এ দলের অনুসারীগণ হযরত আলী (রা.) কে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এমনকি তারা আবু বকর (রা) ও ওমর (রা.)-এর উপর আলী (রা.)-এর মর্যাদাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে।

সাবইয়্যা

সাবইয়্যা শীআদের তারবিয়্যাহও বলা হয়। এরা হযরত সালমান ফারসী (রা.), আবু জর গিফারী (রা.), মিকদাদ (রা), ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) সহ অল্পসংখ্যক সাহাবী ব্যতীত অন্যান্য সকল সাহাবীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। সেই সাথে তাঁদের মুনাফিক ও কাফের বলে আখ্যায়িত করে।

গুলাত

এ দলটি চরমপন্থী শীআ হিসেবে পরিচিত। এদের কেউ কেউ আলী (রা.) কে খোদা বলে আখ্যায়িত করে। এদের মধ্য থেকে কেউ আবার মনে করতো খোদা তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন ফলে তিনি ছিলেন খোদার অবতার বা খোদার প্রকাশ।[৫৭১]

৫৭১ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯

গুলাত বা চরমপন্থী শীআদের উপদল ছিল ২৪টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইমামিয়া সম্প্রদায়। ইমামিয়্যা দলের মধ্যে প্রধান উপদল ছিল ৩টি। যথা :

(১) ইসমাঈলিয়্যা

(২) যায়দিয়্যা

(৩) ইসনা আশারিয়্যা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসমাঈলিয়্যা সম্প্রদায়: পরিচিতি ও মতাদর্শ

ইসমাঈলিয়্যা সম্প্রদায় শীআ মতাবলম্বীদের মধ্যে দ্বিতীয় উপদল হিসেবে পরিগণিত।[৫৭২] ইসমাঈলিয়্যা শীআদের বিশ্বাস ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের পর সপ্তম ইমাম হচ্ছেন ইমাম জাফর সাদিকের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র ইমাম ইসমাইল। অতঃপর ইসমাঈলের মৃত্যুর পর ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। হিজরী তৃতীয় শতকে উবাইদুল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তি নিজেকে সপ্তম ইমাম ইমাম ইসমাঈলের বংশধর ও ইমাম মাহদী দাবী করেন। ২৯৭ হিজরীতে তিনি মাহদী হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তিউনিসের কাইরোয়ানে ফাতেমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তার উত্তরসূরীরা মিশর ও অন্যান্য এলাকা ফাতেমী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তিন শতাব্দীকাল এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৫৬৭ হিজরীতে গাজী সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী (রহ.) এ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটান। [৫৭৩]

ইসমাঈলী শীআদের বাতিনিয়্যাহও বলা হয়। এদের এরূপ নামকরণের দু'টি কারণ রয়েছে। **এক.** এদের ইমাম বেশির ভাগ সময়ই বাতিন বা গোপন থাকেন। তাই তাদের বাতিনিয়্যা বলা হয়।[৫৭৪] **দুই.** এ সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি হচ্ছে, ধর্মীয় নির্দেশনাবলীর বাতিনী বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে ইসলামে নির্দেশনাবলীর দু'টি অর্থ আছে। একটি জাহের বা প্রকাশ্য। অন্যটি বাতিনী বা গোপন। প্রকাশ্য নির্দেশাবলী সাধারণ মানুষের বোধগম্য। তারা এটা বুঝতে পারেন এবং আমল করেন, অন্যদিকে বাতিনী বা গোপন নির্দেশাবলী সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নন, সেটা শুধু আলী বংশের ইমামগণ ও তাদের খলীফাগণই বুঝতে সক্ষম। সাধারণ মানুষ প্রকাশ্য অর্থ নিয়েই পড়ে থাকেন আর ইমামগণ বাতিনী বিষয় অনুধাবন পূর্বক তার উপর আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হন। [৫৭৫]

---

৫৭২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৪

৫৭৩ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২

৫৭৪ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৪

৫৭৫ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২

উল্লেখ্য, এ আকীদার সুযোগ নিয়ে এ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ কথিত বাতিনী জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সুবিধা মতো পবিত্র কুরআনের নির্দেশবালীর ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ প্রভৃতি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এগুলো বাতিল করতেন। সেই সাথে মদ্যপান, ব্যাভিচার ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এগুলি বৈধ করে নিতেন। আর তাদের অন্ধ অনুসারীগণ তাই চোখ বুঝে মেনে নিতেন। [৫৭৬]

এদের সাতপন্থী বা সাবইয়্যাহ বলা হয়ে থাকে। কেননা, তারা সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী। অর্থাৎ ইমাম জাফর সাদিক সপ্তম ইমাম হিসেবে ইসমাঈলকে মনোনীত করেন। পরবর্তীতে তার প্রতি আস্থা রাখতে না পারায় তিনি তার দ্বিতীয় পুত্র মুসা আল কাজিমকে সপ্তম হিসেবে মনোনয়ন দান করেন। এক্ষেত্রে ইসমাঈলের অমিতাচার অসদাচারণকে দায়ী করা হয়। পরিবর্তিত মনোনয়ন সিংহভাগ শীআ মেনে নিলেও কিছু সংখ্যক শীআ ইসমাঈলের অনুসরণ করতে থাকে। তারা মনে করে, ইসমাঈল মাতাল বলে জনসাধারণের নিকট পরিচিত হলেও, তা তার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে ধ্বংস করতে সক্ষম নয়। তারা এও মনে করে যে, সাত সংখ্যাটি একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অর্থ বহন করে। সে সাথে তারা সব কিছুকে সাত সংখ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পায়।[৫৭৭]

হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ইসমাঈলীগণ ইয়েমেন, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে তারা ফাতিমিয়্যা, কারামিয়্যা ইত্যাদি নামে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় । ইসমাঈলীগণ ইসলামের নির্দেশাবলীর নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা করতো। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হত্যা, গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস চালাতে তারা দ্বিধা করতো না। আর তাদের মূলনীতি অনুসারে এসব অপকর্মকে তারা বৈধ মনে করতো। এসব কাজকর্মে এ সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ নেতৃবৃন্দের যে কোনো সিদ্ধান্তকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতো।[৫৭৮]

৫৭৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২-৬১৩

৫৭৭ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১

৫৭৮ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর *আলোকে ইসলামী আকিদা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৩

ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের উপদলসমূহ

ইসমাঈলী সম্প্রদায় বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হলেও তিনটি উপদল ছিল প্রসিদ্ধ। এগুলো হচ্ছে, দারাজিয়্যা, হাশিশিয়্যা বা গুপ্তঘাতক ও ইখওয়ানুস সাফা বা পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ এ তিনটি উপদলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হলো।

দারাজিয়্যা

ফাতেমীয় শাসনামলের শেষের দিক দারাজিয়্যা সম্প্রদায় মিসরে উৎপত্তি লাভ করে। [৫৭৯] পারস্য বংশদ্ভূত দারাজী এ দলের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তার নামানুসারে এ দলের নাম দারাজিয়্যা হয়েছে। তিনি মিসরে এসে অবতার বাদ প্রচার করতে থাকেন। তিনি তৎকালীন ফাতেমীয় খলীফা হাকিম দারাজীর সংস্পর্শে আসেন এবং অবতারবাদে দীক্ষা নেন। একপর্যায়ে খলীফা নিজেকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। এ জন্য তাকে দারাজী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে। [৫৮০] নিজেকে আল্লাহর অবতার ঘোষণা করায় দলের রক্ষণশীল অংশের তীব্র সমালোচনার স্বীকার হন তিনি। এক পর্যায়ে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সিরিয়ার চলে যেতে বাধ্য হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। [৫৮১] খলীফা হাকিমের মৃত্যু নিয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। এর একটি মত হচ্ছে, তিনি মুকাওম পর্বতের চূড়ায় একটি পর্যবেক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। প্রতিরাতে সেখানে তিনি নক্ষত্র গণনা করতে যেতেন। এক রাতে তিনি পর্যবেক্ষন কেন্দ্রে গমন করলেও আর ফিরে আসেননি । তার পরিধেয় বস্ত্র ও অস্ত্র পাওয়া গেলেও তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি। অনুমান করা হয় তাকে কেউ হত্যা করেছে। ঐতিহাসিক হিট্রি মনে করেন তার বোন ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেছে।[৫৮২]

তবে দারাজীগণ তার মৃত্যুতে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে তিনি সন্ন্যাসী হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করে যে, তিনি স্বশরীরে বেহেশতে গমন করেছেন যথাসময়ে তিনি পৃথিবীতে ইমাম মাহদী হিসেবে আগমন করবেন এবং ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা

---

৫৭৯ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

৫৮০ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

৫৮১ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

৫৮২ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

করবেন। আবার কেউ কেউ মনে করে তিনি গোপনে অবস্থান করছেন। যথাসময়ে ইমাম মাহদীরূপে আগমন করে পৃথিবীকে ন্যায়রাজ্যে পরিণত করবেন।[৫৮৩]

হাশিশিয়্যা বা গুপ্তঘাতক দল

মিসরের ফাতেমী খলীফা মুসতানসির বিল্লাহ তৎকালীন ইসমাঈলীয় শীয়া মতবাদের ইমাম ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার সমর্থকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তার জ্যেষ্ঠ্য পুত্রকে অপর দল তার কনিষ্ঠ পুত্রকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। পারস্যের অধিবাসী হাসান ইব্‌ন সাবাহ নিজেকে মুসতানসির বিল্লাহ জেষ্ঠ্য পুত্র নিযারের খলীফা দাবী করে পারস্যে ইসমাঈলীয় প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে। নিযারের সমর্থক হওয়ায় তিনি মিসরীয় ইসমাঈলীদের দ্বারা উপেক্ষার শিকার হন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন তথা ইসলামের নির্দেশনা অনুধাবন সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনের গোপন রহস্য ও সঠিক মর্ম বুঝার জন্য শুধু নিষ্পাপ ইমামের উপরই নির্ভর করতে হবে। আর সে ইমাম গোপনে অবস্থান করছেন আর তিনি অর্থাৎ হাসান ইব্‌ন সাবা তার খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[৫৮৪] তিনি উত্তর পারস্যের আল বুর্জ পর্বতের দশ হাজার বিশ ফুট উচ্চ নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলেন। যা আল-মাওত নামক এ দলের রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। এখান থেকেই দলটির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে। হাসান ইব্‌ন সাবাহ এমন কিছু অনুসারী তৈরি করেছিলেন যারা তাঁর চোখের ইশারায় জীবন দিয়ে দিতো। এসব ভক্তবৃন্দ তাদের নেতার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতো এবং যে কোন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য তারা সদা প্রস্তুত থাকতো। যখনই নেতার নির্দেশ আসতো দ্বিধাহীন চিত্তে কোনোরূপ বাছ বিচার ছাড়াই তা পালনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো। ইব্‌ন সাবাহ তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রচারণায় যাকেই বাঁধা মনে করতেন তাকেই গুপ্ত হত্যার নির্দেশ দিতেন। জানবাজ ফেদায়ী গোষ্ঠী তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতো।

---

৫৮৩ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫; ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

৫৮৪ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামী আকীদা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৩; ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪; ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

এ সকল দুর্ধর্ষ ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন বহু মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিহত হন। এদের মধ্যে সমকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক তুসী ও প্রসিদ্ধ আলিম নাজমুদ্দীন কুবরার নাম প্রণিধাযোগ্য। এ দলটি যেহেতু গুপ্ত হত্যার মতো ভয়ংকর ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত ছিল তাই এদেরকে গুপ্তঘাতক দলবলে দল বলে অভিহিত করা হয়। এছাড়া আধ্যাত্মিক সজ্ঞা লাভের জন্য এরা হাশিশ নামক একটি মাদকদ্রব্য সেবন করতো বলে এদেরকে হাশিশিয়্যাও বলা হয়ে থাকে। ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের পরিবর্তে ভিন্নতাবলম্বীদের উপর জুলুম ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালানোই তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সমকালীন আব্বাসী খলীফাদের দুর্বলতার সুযোগে তারা অপ্রতিরোদ্ধ হয়ে উঠে এবং তাদের নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যেতে থাকে হাসান ইব্‌ন সাবার পরও বহু দিন তারা তাদের শক্তি ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ১২৫৬ খ্রিস্টব্দে মোঙ্গল হালাকু খান তাদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দেয়। ফলে তারা আশে পাশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানের আগাখানী শীআ, ভারতীয় বুহরা শীআ এদেরই উত্তর পুরুষ। এর কিছু আবার খোজা নামেও পরিচিত।[৫৮৫]

ইখওয়ানুল সাফা বা পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ

পারসিক আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাইমুন ইসমাঈলী সম্প্রদায়কে পূর্ণতা দান করেছিলেন। তিনি ধর্মতাত্ত্বিক ও প্রকৃতিবাদী মতবাদ উপস্থাপন করে দর্শন ও দৃষ্টবাদী ধর্মের সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট হন। তিনি তার অনুসারীদের ১৪টি স্তরে বিভক্ত করেন। সর্বশেষ স্তরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সব ধরনের জ্ঞান অর্জন করেন, ফলে কর্ম বা আমলের প্রতি তার উদাসীনতা কোনো সমস্যা নেই। এই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাইমুনের শিক্ষার অনেক প্রভাব ইখওয়ানুস সাফার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। ৯৮২ খ্রি./ ৩৬০ হিজরীতে বসরা নগরীতে ইখওয়ানুস সাফার উদ্ভব ঘটে। এ সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে ড. রশীদুল আলম বলেন:

“পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসমাঈলিয়া মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলা। সংস্কারযুক্ত চরিত্র ও বিশুদ্ধতম নীতিবোধের অধিকারী না হলে কোনো লোককে ভ্রাতৃসংঘর

---

৫৮৫ . ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামী আকীদা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৩-৬১৪; ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ . ১১৫; ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

সদস্য করা হতো না। জ্ঞান ও মানবতার প্রতি অনুরাগই ছিল এ সুধী মহলে প্রবেশের ছাড়পত্র।"[৫৮৬]

পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের অনুসারীরা চার স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রথম স্তরঃ পনের থেকে বিশ বছর বয়সী তরুণরা ছিল প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তারা সম্পূর্ণ রূপে গুরুর আদেশ মেনে চলতো। গুরু যে নির্দেশ দিতেন তাই তারা পালন করতো।

দ্বিতীয় স্তর : ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স্ক লোকেরা এ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় স্তরের অন্তভূর্ক্ত। এ সকল সদস্যকে পার্থিব ও সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান দান করা হতো।

তৃতীয় স্তরঃ এ স্তরের সভ্যদের বয়স ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর। এ স্তরের সদস্যগণ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের তুলনায় অধিকতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সে সাথে তারা মহান আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

চতুর্থ স্তরঃ পঞ্চাশোর্ধ সদস্যগণ চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ স্তরে অধিষ্ঠিত সদস্যবৃন্দ বস্তুর প্রকৃতি ও রহস্য সম্পর্কে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এমনকি তারা বস্তুর বাস্তবতা সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। ইখওয়ানুস সাফার নিকট এরা ছিলেন ফিরিশতার মতো। তারা প্রকৃতি, ধর্ম ও আইনের উর্ধ্বে ছিলেন।[৫৮৭]

ইখওয়ানুস সাফার প্রধান ছিলেন জায়েদ ইব্‌ন রিফা। আর বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে এ সম্প্রদায়কে যারা অনিঃশেষ সেবা দান করেছিলেন তাদের মধ্য থেকে আবু সুলাইমান, মুহাম্মদ আল বসরী, আবুল হাসান ইব্‌ন হারুন ও আল-আওকীর নাম প্রণিধানযোগ্য। এ দলটি সদস্য নির্বাচনে খুব কড়াকড়ি করতো। সদস্যপদ লাভের পূর্বশর্ত ছিল নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়া। চরিত্রহীন কোনো লোক এ সংঘের সদস্য হতে পারতো না। সদস্যদের নিয়মিত অনুশীলন চলতো। সংঘের সদস্যগণ জায়েদ ইব্‌ন রিফার গৃহে সমবেত হয়ে দর্শন ও নীতি শাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান শানিত করে নিতো। ভ্রাতৃসংঘের সদস্যগণ তৎকালীন মুসলিম জাহানের অধগতি নিয়ে খুবই ব্যথিত ও মর্মাহিত ছিল। তারা সর্বদা এ চিন্তা নিয়ে

---

৫৮৬ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

৫৮৭ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৯৬; ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

বিভোর থাকতো যে, কীভাবে মুসলিম উম্মাহর হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা যায়। তাদের জ্ঞান চর্চার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল তারা উদার মনোভাব ও ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা পর্যালোচনা করতো। পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি ছিল তাদের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। [৫৮৮] ইখওয়ানুস সাফা উদার মনোভাব নিয়ে উম্মাহর সকলের সাথে মিত্রতা রক্ষা করে চলার নীতি অবলম্বন করে। তারা ইসলামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলো। [৫৮৯] এতে এ দলটি মিলনপন্থী চিন্তা গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি পায়। এ সম্প্রদায়টি তাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করে বুদ্ধি ও ওহীর মধ্যে সঙ্গতি বিধানের প্রানান্ত প্রচেষ্টা চালানায়। তারা মনে করতেন, এরিস্টটলের দর্শনের সাথে ইসলামের সংমিশ্রনের মাধ্যমে ধর্মের পূর্ণতা সাধন করা সম্ভব।[৫৯০]

উল্লেখ্য তারা পিথাগোরীয়, এরিস্টটলীয় ও প্লেটোবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল।[৫৯১] জ্ঞানচর্চাকে তারা প্রধান কর্ম বলে গ্রহণ করে। তাদের জ্ঞানচর্চা ছিল দর্শনের আলোকে পর্যালোচনাকৃত। গণিত থেকে শুরু করে যুক্তিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার মধ্য দিয়ে তারা মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রবেশ করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। [৫৯২] তৎকালীন যুগের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে তারা একটি একটি বৃহৎ বিশ্বকোষ রচনা করে।[৫৯৩]

বিশ্বকোষটি **৫১** খন্ডে ব্যাপৃত ছিল। এতে তারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের অবদান সন্নিবেশিত করে যায়। গণিত, দর্শন, জ্যোতিবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূ-বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, আবহাওয়া বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জীব বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, সঙ্গীত, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় এ বিশ্বকোষে আলোচনা করা হয়েছে।

---

৫৮৮ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

৫৮৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

৫৯০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

৫৯১ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

৫৯২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

৫৯৩ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

এ বিশ্বকোষটি রাসাইলু ইখওয়ানুস সাফা নামে পরিচিত। একে দশম শতাব্দীর আরবী বিশ্বকোষও বলা হয়ে থাকে। এটি বিস্ময়কর যে, সে যুগে একটি মুসলিম উপদল জ্ঞানের প্রায় সবকটি শাখায় অবদান রেখে গেছে। এতে করে বুঝা যায় জ্ঞান চর্চাকে তারা কতটুকু গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে ড. রশীদুল আলমের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

''পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ পৃথিবীর বিভিন্ন জ্ঞানভান্ডার থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে তাদের জ্ঞানের চৌবাচ্চা পূর্ণ করেছিলেন। প্রত্যেক ধর্ম ও প্রত্যেক ধরনের জ্ঞানের প্রতি ছিল তাদের সমান আকর্ষণ। যেখানে তাঁরা জ্ঞান পেয়েছেন সেখান থেকে তা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, সত্য এক ও অপরিবর্তনীয়। তাঁরা সে উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন এবং এক মহাজ্ঞান ভান্ডার রচনা করেছেন -- বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন বিজ্ঞান ও মানবীয় মতবাদ তাঁদের জ্ঞানসমূহ পূর্ণ করেছে। প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন মনীষী ও বিভিন্ন লেখক এবং চিন্তাবিদদের সাধনার ফল নিয়ে তাঁরা এক বিরাট জ্ঞান-সৌধ গড়ে তুলেছেন এবং অন্যান্য মানুষকে সে জ্ঞানের ভাগী হতে আহবান জানিয়েছেন। কোনো ধর্ম, কোনো জাতি, কোনো বংশের প্রতি তাঁদের কোনোরূপ হিংসা- বিদ্বেষ বা পক্ষপাত ছিল না।''[৫৯৪] পবিত্র ভাতৃসংঘ ধর্মকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছিল। জ্ঞান ও জ্ঞানীকে তারা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। এ সম্পর্কে ড. আমিনুল ইসলাম বলেন:

"তারা ধর্মকে দেখেছিল এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং দিতে চেয়েছিল ধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যা। তাদের মতে ধর্ম সাধারণ মানুষের জন্য। দুর্বল ও অসুস্থ আত্মার জন্য ধর্ম একটি প্রতিষেধক বটে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য উপলব্দি করা কেবল শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগামী মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। যে কোনো মতের আক্ষরিক অর্থের অন্তরালে এমন একটি রূপক অর্থ নিহিত থাকে যা সে তত্ত্বের সত্যতার প্রতীক, এবং যার মর্ম উপলব্দি করা শুধু সুফি সাধকদের পক্ষেই সম্ভব। মৃত্যুতে দেহের অবশ্যই অবসান ঘটবে। তবে যারা সত্য ও বাস্তব সত্তার চিন্তার উপযোগী দার্শনিক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে পেরেছেন মৃত্যু তাদের জন্য পূর্নজীবন লাভ স্বরূপ। এ বহুত্ব ও পরিবর্তনের জগৎ এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক বাস্তব সত্তার

---

৫৯৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

প্রকাশ এবং প্রতিটি পার্থিব জিনিস স্বর্গীয় বস্তুরই অনুলিপিস্বরূপ। এ অর্থে যত নগণ্য বলেই প্রতীয়মান হোক না কেন, প্রতিটি পার্থিব জিনিষের কিছু-না কিছু গুরুত্ব রয়েছে।"[৫৯৫]

ইখওয়ানুস সাফা বুদ্ধিবাদী মুসলিম সমাজে এক নতুন চিন্তা নিয়ে এসেছিল। তারা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দার্শনিক মতামত পেশ করেছে। তারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছে সে সাথে ইসলাম ও ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা তারা দিয়ে গেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা একটি আধ্যাত্মিক দর্শন গড়ে তোলেন, যাতে সমকালীন সকল জাতি ও ধর্মের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা একত্রিত হয়। মানুষের পক্ষে আল্লাহর সঙ্গে যতটুকু নৈকট্য লাভ করা সম্ভব ততটুকু চেষ্টা চালাতে দার্শনিকগণ কার্পন্য করেননি। তাদের শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে চূড়ান্ত সম্মিলনের লক্ষ্যে আত্মার পূর্ণতা বিধান। মানুষের মানসিক কার্যক্রমকে তারা বিজ্ঞান ও কলা এ দুভাগে বিভক্ত করেছেন। তারা মনে করেন যে, আত্মার ক্রিয়াপরতার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পাওয়া যায়, অস্তিত্তের বাহ্যিক রূপের অন্তরালে উচ্চতর সুকুমার বৃত্তির প্রত্যয় ও আকার বিদ্যমান। সেগুলোকে শুধু আত্মাই জানতে পারে। তাদের মতে, জন্মকালে মানব মন কোনো শূন্য ফলকের মতো থাকে না, বরং কিছু সহজাত ধারণা নিয়ে প্রকাশিত হয়। পূর্ব থেকেই জ্ঞান অবচেতনভাবে মনের মধ্যে অবিকশিত অবস্থায় অবস্থান করে। আর এ জ্ঞানের বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় আত্মা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী শিক্ষকের। জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে ভ্রাতৃসংঘর মত হচ্ছে এর উৎস একাধিক তারা তিনটি উৎসের প্রতি নির্দেশ করেছেন। এক. ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ, দুই. যৌক্তিক অনুমান, তিন. অপরোক্ষ সজ্ঞা। তারা মনে করেন সর্বাধিক নিশ্চিত ও সর্বোত্তম জ্ঞান হলো ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে জ্ঞান। নিজেকে জান এ নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল।[৫৯৬]

তারা ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন দার্শনিক মনোভঙ্গি নিয়ে। তাদের মতে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মুহাম্মদ (স.) নবী- রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা এও মনে করেন যে, নামায, রোজা,

---

৫৯৫ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

৫৯৬ . *প্রাগুক্ত*

হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কর্ম দ্বারা বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। তবে এসব ছাড়াও অন্য পথে এ লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।[৫৯৭]

তারা বিজ্ঞান ও জীবন, দর্শন ও ধর্মের সমন্বয় করতে গিয়ে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মের ধারণা প্রদান করেন। তারা সাধারণ মানুষের ধর্ম পালন এবং দার্শনিক ও প্রেরিত পুরুষের ধর্ম পালনের তফাৎ দেখতে পান। সাধারণ লোক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করলেও তাদের আত্মা উর্ধ্বলোকে গমন করতে পারে না। কেননা, তাদের আত্মার তেমন শক্তি নেই। পক্ষান্তরে, দার্শনিক ও প্রেরিত পুরুষগণ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় জগত পরিভ্রমণ করে সুক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ অবগত হন। তাদের মতে, প্রকৃত ধর্ম আচার অনুষ্ঠান নির্ভর নয়। সাধারণ মানুষের জন্য আচার- অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে ধর্ম পালন স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। তারা মনে করেন, গভীর চিন্তা ও উপলব্দির মাধ্যমে ধর্মের প্রকৃত রহস্য ও তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাদের মতে, জাহান্নাম বলতে কিছু নেই, বরং নরকের ভীতি মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ জগতেই মানুষ তা কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করবে। হাশরের দিন মানবাত্মা বিশ্ব আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।[৫৯৮]

নব্য পিথাগোরিসীয়দের পর পবিত্র ভ্রাতৃসংঘই সংখ্যাতত্ত্বের বিকাশ সাধনে ব্রতী হন। তাদের মতে, বুদ্ধির বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে সংখ্যাতত্ত্বের তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। ধর্ম, ইতিহাস, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করলে আত্মা সংখ্যাতত্ত্বের উপলব্দি করতে সক্ষম হবে। তাদের মতে, গণিতের কাজ সংখ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা নয়, বরং সংখ্যার তাৎপর্য অনুধাবন করা। তারা মনে করেন, সংখ্যাবিজ্ঞান সকল দর্শনের প্রারম্ভে, মধ্যে এবং পরিণতিতে সক্রিয়। গণিত হচ্ছে সংখ্যার বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আর জ্যামিতি গণিতের একটি শাখা। গণিত ও জ্যামিতি আত্মাকে আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ উপলদ্ধি করতে সাহায্য করে।[৫৯৯]

---

৫৯৭ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

৫৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭-১৯৮

৫৯৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮

পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়েও তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। তারা মনে করে, নক্ষত্রপুঞ্জ শুধু ভবিষ্যতের আভাসই দেয় না বরং বিশ্বচরাচরে যা কিছু ঘটে, তারা সরাসরি প্রভাবিত করে। মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুটোর ক্ষেত্রে নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে। তারা বিভিন্ন গ্রহের বর্ণনা দিয়ে এর প্রভাবও উল্লেখ করেন। তারা এও মনে করেন যে, প্রতিকূল পরিবেশের কারণে অনেকে নক্ষত্ররাজি তথা প্রাকৃতিক ক্ষমতা থেকে উপকৃত হতে পারে না। ফলে তাদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে না। আর এদের জন্যেই নবী-রাসূলগণ (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁদের শিক্ষা ও সাহচর্য নিয়ে এসব লোক নিজের চরিত্রকে সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে পারে।[৬০০]

পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের মতে, যুক্তিবিদ্যা ও গণিত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।[৬০১] গণিত হচ্ছে সংখ্যার বিজ্ঞান ও সকল জ্ঞানের সারনির্যাস।[৬০২] গণিত মানুষকে বস্তুজগৎ থেকে ভাবজগতে নিয়ে যায়। যুক্তিবিদ্যা মানুষকে বস্তুজগৎ থেকে ভাব জগতে নিয়ে যায়। যুক্তিবিদ্যার অবস্থান পদার্থ বিদ্যা ও অধিবিদ্যার মাঝখানে। পদার্থবিদ্যা বস্তু জগৎ নিয়ে আলোচনা করে আর অধিবিদ্যা আলোচনা করে অতীন্দ্রিয় জগৎ নিয়ে। আর যুক্তিবিদ্যা আত্মার মাঝে বস্তুর ধারণা এবং আত্মার নিজস্ব ধারণা উভয় বিষয় আলোচনা করে। এদের যুক্তিবিদ্যা পরিফিরি ও এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা থেকে স্বতন্ত্র নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিফিরি পাঁচটি বিরোধের বর্ণনা করেছেন। আর এরা একটি বাড়িয়ে ছয়টি করেছেন। ষষ্ঠটি হলো ব্যক্তি। জাতি, উপজাতি ও ব্যক্তি এ তিনটি বস্তুগত গুণ এবং লক্ষণ, উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ এ তিনটি নৈর্ব্যক্তিক গুণ।[৬০৩]

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ তাদের দার্শনিক মতামত পেশ করেছেন। তাদের মতে, পরম সত্তা আল্লাহ তা'আলা থেকে বস্তু জগত ও ঐশী জগত নিঃসৃত হয়েছে।[৬০৪] তারা মনে করে

---

৬০০ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

৬০১ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

৬০২ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

৬০৩ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

৬০৪ . *প্রাগুক্ত*

জগত বিকিরণের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাদের বিশ্বাস , আল্লাহ এমন মহান সত্তা যার মধ্যে যাবতীয় বিরোধ, বৈপরীত্য, নিষেধ ও শুভাশুভ একত্রে সমন্বিত হয়ে থাকে। তারা বিকিরণকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। তাদের এ স্তর বিন্যাস বিবর্তনবাদের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য রাখে। এজন্য বিকিরনবাদকে বিবর্তনবাদেও পূর্বাভাস বলে মন্তব্য করেছেন।[৬০৫] তাদের মতে মহান আল্লাহ তা'আলা থেকে বিকিরণের মাধ্যমে আটটি উপাদান সৃষ্টি হয়েছে। আর আটটি এবং স্বয়ং খোদা তা'আলা এ নয়টি নীতি থেকে সবকিছু সৃষ্টি। আটটি নীতি হচ্ছে: (১) সৃজনক্ষম আত্মা, (২) নিষ্ক্রিয় আত্মা (বিশ্ব আত্মা), (৩) প্রথম উপাধান, (৪) সক্রিয় প্রকৃতি, (৫) দ্বিতীয় উপাদান, ৬) মন্ডলসমূহ, (৭) পার্থিব উপাদান এবং (৮) খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণী।[৬০৬]

পবিত্র ভ্রাতৃসংঘের প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা মনস্তাত্ত্বিক বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবাত্মা প্রথম ও প্রধান গুরুত্বের অধিকারী। মানবাত্মা বিকীর্ণ হয়েছে বিশ্বাত্মা থেকে। আর মানবাত্মার অন্তঃসার গঠিত হয় সব ব্যক্তির আত্মার সমন্বয়ে।[৬০৭] আত্মাসমূহকে এক মনে করলে তাকে নিরপেক্ষ মানুষ বলা হয়। প্রতিটি ব্যক্তি আত্মাকে এমন এক জড়বন্ধনে আবদ্ধ করে যা থেকে সে সর্বদা মুক্তি পেতে চায়। মুক্তি পাওয়ার জন্য মানবাত্মা যে শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার মধ্যে চিন্তন শক্তিই প্রধান।[৬০৮] তাদের মতে, জন্মকালে আত্মার কোনো সহজাত জ্ঞান থাকে না। জন্মকালে শিশুর আত্মা অলিখিত সাদা কাগজের মতো থাকে। সর্বপ্রথম এর উপর দাগ পরে ইন্দ্রিয়লব্দ অভিজ্ঞতার । অতঃপর অবধারণ স্মৃতি ও যুক্তির মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতা জ্ঞানে পরিণত হয়। পঞ্চন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণ ও দর্শন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে শ্রবণেন্দ্রিয় দর্শনেন্দ্রিয়ের চেয়ে অগ্রগণ্য। শ্রবণ ও দর্শন একত্রে বুদ্ধিমূলক ইন্দ্রিয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এদের প্রভাব অনন্তকাল স্থায়ী হয়।[৬০৯]

---

৬০৫ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

৬০৬ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

৬০৭ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

৬০৮ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০

৬০৯ . *প্রাগুক্ত*

ইতর প্রাণীর ন্যায় মানুষেরও ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে তার প্রজ্ঞায়। প্রজ্ঞার বলে মানুষ বিচার করে, কথা বলে ও কাজ করে। প্রজ্ঞাই শুভ অশুভ, ঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করে। আর এ পার্থক্য নির্দেশের মাধ্যমে প্রজ্ঞা পরিচালিত করে ইচ্ছাকে। পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ আধ্যাত্মিক ও সংযমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। তাদের মতে, মানুষ যখন তার প্রজ্ঞা অনুসারে পরিচালিত হয় তখন তার কাজ যথার্থ ও নীতিসম্মত। তারা বিশ্বাস কররেতন, প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত জীবন যাপন করা উচিৎ। বুদ্ধি নির্দেশিত জীবন প্রকৃত জীবন। বুদ্ধিদীপ্ত জীবন সাধনই মানুষকে আল্লাহর সাথে মিলন ঘটিয়ে থাকে। তাদের মতে, দেহ নয়, আত্মাই সার ধর্ম। আল্লাহ এবং তার সৃষ্ট জীবের প্রতি ভালোবাসা মানব হৃদয়ের স্বাধীনতা দান করে, সমগ্র বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দেয়। পরকালে অনন্ত মুক্তির আনন্দকে নিশ্চিত করে। প্রত্যেক মানুষের উচিৎ জ্ঞানানুশীলনে নিবেদিত প্রাণ ও আল্লাহ প্রেমে মদমত্ত হওয়া। আর আত্মার অনন্ত মুক্তির আনন্দের জন্য প্রয়োজন সাধনা। আত্মা প্রধান হলেও দেহের প্রতি অযত্ন করা চলবে না। আত্মার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য দেহের পরিচর্যা জরুরী।[৬১০]

এদের নীতিবোধ সম্পর্কে ডি. বোয়ার বলেন: "ভ্রাতৃসংঘ এমন এক আদর্শ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা কিনা সম্মিলিত করেছিল বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য বৈশিষ্ট্যকে। একজন আদর্শ ব্যক্তির পক্ষে উৎপত্তির দিক থেকে হওয়া উচিত পূর্ব পারস্য দেশীয়, বিশ্বাসে আরব, শিক্ষায় গ্রিক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে হিব্রু, আচরণে খ্রিস্টের শিষ্য, ধার্মিকতায় মিসরীয় সন্ন্যাসীর ন্যায়, সব রকম রহস্যের ব্যাখ্যায় ভারতীয় এবং সর্বোপরি ধর্মীয় জীবনে একজন সুফী।"[৬১১]

ইসমাঈলীয়দের উল্লেখযোগ্য মতাদর্শ সমূহ

১। ইসমাঈলীগণ ইমামতে বিশ্বাস করে। তবে তারা সাত ইমামে বিশ্বাসী। তারা আলী (রা.) থেকে ইসমাঈল পর্যন্ত সাত জন ইমামে বিশ্বাস করে অন্য ইমামদের বৈধতা তারা স্বীকার করে না।

২। তারা বিশ্বাস করে, সপ্তম ইমাম ইসমাঈল ইমাম মাহদীরূপে পৃথিবীতে আগমন করে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন।

---

৬১০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০; ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

৬১১ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

৩। ইসমাঈলীগণ ধর্মের বাহ্য দিকের পরিবর্তে ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিকের প্রতি বেশি জোড় প্রদান করেন।

৪। তাদের মতে পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি অক্ষর ও শব্দের দ্বিবিধ তাৎপর্য রয়েছে, একটি প্রকাশ্য ও অন্যটি গোপনীয়। কেননা, অদৃশ্য জগতে প্রত্যেকটি প্রকাশ্য বস্তুর আদর্শ নমুনা রয়েছে।

৪। তাদের মতে বিপদ ও অত্যাচারের আশংকা দেখা দিলে, ব্যক্তি তার নিজের বিশ্বাসকে গোপন রাখতে পারেন। এ নীতি অনুসরণে তারা তাদের ধর্মমতের বিপরীত শাসককে মেনে নিয়েছেন। হজ্বব্রত পালনেও তারা এ নীতি অনুসরণ করেছেন।

৬। তারা বিশ্বাস করে ধর্ম হৃদয়ের ব্যাপার বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের নাম ধর্ম নয়। সুতরাং ধর্মকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না করে হৃদয়ের উৎকর্ষ অর্জন অপরিহার্য।

৭। তাদের মতে, মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী নন বরং ইসমাঈল ইব্‌ন জাফর সাদিক শেষ নবী।

৮। তাদের বিশ্বাস, মানুষ নিজ চেষ্টায় সত্যলাভে সক্ষম নয় বরং নবী অথবা ইমামের শিক্ষা ও পথ নির্দেশ অপরিহার্য।

৯। তারা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক নবী ও রাসূলের একজন সাহায্যকারী ছিলেন। যেমন মুসার (আ.) সাহায্যকারী হারূন (আ.), ঈসার (আ.) সাইমনপিটার, মুহাম্মদ (স.)-এর সহায়ক আলী (রা.) তেমনি তাদের নবী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের সহায়ক আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাইমুন।

১০। তাদের মতে সত্যে উপনীত হতে নয়টি স্তর অতিক্রম করতে হয়। নবম স্তরে পৌছলে মানুষ ধর্মের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভে সক্ষম হয় এবং এ পর্যায়ে বাহ্যিক ধর্মীয় কর্মে তার উদাসীনতা গ্রহণযোগ্য।

১১। তারা মনে করে, সাত সংখ্যাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ বিশ্বাসের আলোকে তারা সাতের সাহায্যে সবকিছুর ব্যাখ্যা করে। তারা সৌরজগতে সাতটি গ্রহের কথা বলে এবং মানবজীবনের উপর এদের প্রভাব বিশ্বাস করে। সপ্তাহের সাত দিনে তারা সাত সংখ্যাটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। তারা মাত্র সাতজন নবীকে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ হিসেবে স্বীকার করে। তারা হলেন আদম (আ.), নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.), ইসমাঈল (আ.) মূসা (আ.), ঈসা (আ.) ও মুহাম্মদ (স.)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যায়েদিয়্যা সম্প্রদায়ঃ পরিচিতি ও মতাদর্শ

উদার শিআদের প্রতিনিধি হচ্ছে যায়েদিয়্যা সম্প্রদায়।[৬১২] এদের সিংহভাগ ইয়েমেনে বসবাস করছে। ইমামত সম্পর্কে তাদের মতাদর্শ হচ্ছে, ইমামত আলী (রা.) থেকে হাসান (রা.), হাসান (রা.) থেকে হোসাইন (রা.), হোসাইন (রা.) থেকে আলী ইব্ন হোসাইন জয়নুল আবেদীন (রহ.), জয়নুল আবেদীন (রহ.) থেকে তার পুত্র যায়েদের উপর ন্যাস্ত হয়। অন্যরা অর্থাৎ ইসমাঈলী ও ইসনা আশারিয়াগণ জয়নুল আবেদীন থেকে মুহাম্মদ আল-বাকেরের উপর ইমামত ন্যাস্ত করে থাকে। শীআদের মধ্যে যায়েদিয়্যাগণ অপেক্ষাকৃত কোমল ও উদারপন্থি। তারা সুন্নীদের মতের কাছাকাছি।[৬১৩]

যায়েদিয়্যাহদের মতাদর্শ

১। যায়েদিয়্যাগণ ইমাম নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচননীতিকে সমর্থন করে। তবে তাদের মতামত হচ্ছে, ইমাম হবে আলী (রা.)-এর বংশ থেকে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ আলী (রা.)-এর বংশ থেকে যে কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২। বিশেষ কারণে জনগণ ইচ্ছা করলে আলী (রা.) এর বংশ ব্যতীত অন্য কাউকেও নির্বাচন করতে পারে। এ নীতিমালার আলোকে তারা আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) এর খলীফা নির্বাচন বৈধ বলে মনে করে। তাদের কেউ কেউ ওসমান (রা.) এর খিলাফতকেও বৈধ মনে করে।

৩। তাদের মতে, দু'টি দেশ যদি দূরবর্তী হয় , তাহলে দুই দেশে দু'জন ইমাম থাকতে পারেন।

৪। তাদের মতে, সততা ও জ্ঞান ছাড়া ইমামের সাহসিকতা থাকাও বাঞ্চনীয়।[৬১৪]

---

৬১২ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

৬১৩ . ড. রশীদুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

৬১৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসনা আশারিয়্যাহ: পরিচিতি ও মতাদর্শ

ইসনা আশারিয়্যাহ সম্প্রদায়টি দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী। ইসনা আশারিয়্যাহ অর্থই হচ্ছে বারো। যেহেতু এ সম্প্রদায়টি ১২ জন ইমামে বিশ্বাসী তাই একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ সম্প্রদায়টি ৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে অপরাপর দলের উপর প্রাধান্য লাভে সক্ষম হয়।[৬১৫] ইসনা আশারিয়্যাগণ বিশ্বাস করে আলী (রা.)-এর দ্বাদশ বংশধর মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সশরীরে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ইসলামকে সারা বিশ্বে বিজয়ী করতে ও ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠান করতে তিনি পুনরায় আগমন করবেন। তিনি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।[৬১৬]

শীআরা সুন্নী তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বের হয়ে যায়। এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। তবে পৃথক হওয়ার পর থেকে ধর্মীয় বিষয় নিয়েও তারা মতপার্থক্য করতে থাকে। এক পর্যায়ে ধর্মীয় বিষয়ের বহু ক্ষেত্রে নিজেদের পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ সুসংহত করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশে ইসনা আশারিয়া শীআদের সংখ্যাই বেশি। আর ইরানেও এ উপদলটিই শীআদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এদের মতাদর্শ নিম্নরূপ:

ইসলাম

ইসলাম সম্পর্কে শীআদের মতাদর্শ হলো, পবিত্র কুরআন যে 'দ্বীন' অনুসরণের প্রতি মানবজাতিকে আহবান জানায় তাই ইসলাম।[৬১৭] ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এটি সত্য ঐশী বিধান, সর্বশেষ শরীয়ত, পূর্বেকার সকল শরীয়তের রহিতকারী, পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত যাতে সন্নিবেশিত আছে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সমূহ কল্যাণ ও সফলতার উপায়। এটি সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত এবং সকল সময় ও যুগের জন্য প্রযোজ্য। মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে। এটি সর্বশেষ শরীয়ত এরপর আর কোনো শরীয়ত

---

৬১৫ . ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ; ১১০

৬১৬ . *প্রাগুক্ত*

৬১৭ . আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

আসবে না। যাবতীয় যুলুম ও ফাসাদে নিমজ্জিত মানব সভ্যতাকে এ শরীয়ত পরিশুদ্ধ করে। আর এমন একদিন আসবে যেদিন ইসলাম আরো শক্তিশালী হবে এবং ন্যায়-নীতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে।[৬১৮]

শীআরা বিশ্বাস করে যখন মানুষ পরিপূর্ণরূপে ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে ইসলামী শরীয়াহ মেনে চলবে তখন সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। মান-সম্মান, ঐশ্বর্য, জনকল্যাণ ও মানবীয় মুল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ তার কাঙ্খিত লক্ষ্যের শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হবে। পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হবে এবং পৃথিবীর বুক থেকে যাবতীয় যুলুম ও দারিদ্র্য বিদায় নিবে। [৬১৯] শীআরা এও বিশ্বাস করে যে, আজ পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলমানগণ নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, মুসলিম সমাজ আজ সুমহান আদর্শ ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।[৬২০]

মহান আল্লাহ

মহান আল্লাহ সম্পর্কে শীআদের মতাদর্শ বিষয়ে শীআ আলেম আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল মুজাফফর বলেন:

"আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, কোন কিছুই তাঁর মতো নয়, তিনি অনাদি ও অনন্ত, তাঁর কোনো শুরু বা শেষ নেই। তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, ন্যায়পরায়ণ, অস্তিত্বময়, সর্বদ্রষ্টা, সৃষ্টির কোন গুণ দিয়ে তাকে গুণান্বিত করা যায় না। তার কোন দেহ নেই, কোন অবয়ব নেই, তিনি বস্তুসত্তা নন এবং উপজাত নন, তাঁর কোন স্থান নেই, কাল নেই, কেউ তার দিকে নির্দেশ করতে পারে না যেহেতু কোন কিছুই তাঁর মতো নয়, কিছুই তার সমান নয়, তাঁর কোন বিপরীত নেই, তাঁর কোন স্ত্রী নেই, কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নেই, দৃষ্টিগুলো তাঁকে নিবদ্ধ করতে পারে না বরং তিনিই দৃষ্টিগুলো নিবদ্ধ করেন।

---

৬১৮ . আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, অনু. মুহাম্মদ মাইন উদ্দিন তালুকদার, শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস (ঢাকা: মারকাজ-এ জাহানী -এ উলুমে ইসলামী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ.৩২

৬১৯ . প্রাগুক্ত

৬২০ . প্রাগুক্ত

যারা আল্লাহর রূপ, মুখগহবর, হাত ও চোখ ইত্যাদি আছে বলে তুলনা করেন অথবা আকাশ থেকে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেন কিংবা বেহেশতবাসীকে তিনি চন্দ্ররূপে দর্শন দিবেন বলে থাকেন, তারা প্রকৃত পক্ষে তাঁর সম্পর্কে কুফুরি করেন।" [৬২১]

সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব জগৎ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি অসীম ও সীমাহীন কুদরতের মাধ্যমে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং এ সৃষ্ট জগতকে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষে এগিয়ে নিয়ে যান। আর সৃষ্ট জগতের সকল কিছু মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। বিশ্ব নিচয়ের সকল কিছু তার আয়ত্তাধীন তিনি কারো আয়ত্তে নন। সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।[৬২২]

আল্লাহর একত্ববাদ

শীআরা বিশ্বাস করে, সৃষ্টিজগতের সকল অস্তিত্বই সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কোন অস্তিত্তই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই এমন এক অস্তিত্তের অধিকারী, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তিনি নিরঙ্কুশ অস্তিত্তের অধিকারী। যেভাবেই কল্পনা করা হোক না কেন তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।[৬২৩] আল্লাহর অস্তিত্ব অনন্ত ও অসীম। ফলে তাঁর সমান্তরাল অন্য কোন অস্তিত্বের কল্পনা অসম্ভব। অসীম অস্তিত্ব সম্পন্ন আল্লাহ তা'আলা এক। তার কোন শরীক বা অংশ নেই। অসীম ও অনন্ত অস্তিত্বের জন্য সংখ্যার কল্পনা করা অসম্ভব। কেননা, কল্পিত প্রতিটি দ্বিতীয় সংখ্যাই প্রথম সংখ্যার চেয়ে ভিন্ন হবে। ফলে দু'টো সংখ্যাই সীমিত ও সমাপনযোগ্য হয়ে নিজস্ব সীমারেখায় বন্দী হয়ে যাবে।[৬২৪] তাই আল্লাহকে সংখ্যার সাথে সম্পর্কীত করা কখনই সঠিক হতে পারে না।

---

৬২১. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৬২২. আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

৬২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

৬২৪. *প্রাগুক্ত*

কেউ যদি বলে আল্লাহ এক এবং এ বিষয়ে যদি সংখ্যার দিয়ে লক্ষ্য করে কল্পনা করে তাহলে তা সঠিক নয়। সঠিক হচ্ছে, আল্লাহ এক বলতে এমন সত্ত্বাকে বুঝতে হবে যার কোন দ্বিতীয় নেই। কেননা, অসীম অস্তিত্বের জন্য দ্বিতীয়ের কল্পনা কখনও সম্ভব নয়। [৬২৫]

মহান আল্লাহর গুণাবলি

শীআরা বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহর প্রকৃত ও হ্যাঁ বোধক গুণাবলিকে পূর্নতাগুণ (কামাল) ও সৌন্দর্যগুণ (জামাল) বলে নামকরণ করা হয়। যেমন : ইলম, কুদরাত, গণি, ইরাদা, হায়াত প্রভৃতি। এগুলো সবই তাঁর সত্ত্বা। এগুলো আল্লাহর সত্তা থেকে পৃথক নয়। আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। তাঁর অস্তিত্ব ও গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[৬২৬] শীআরা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহ তাঁর সত্তার ন্যায় অনাদি ও আবশ্যকীয় অস্তিত্ব। তাঁর গুণ ও সত্ত্বার পৃথক হওয়ার ধারণা একত্ববাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর না-বোধক গুণগুলো হ্যা-বোধক গুণেই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পবিত্র সত্তাকে খন্ডন করা যায় না। তিনি এক অদ্বিতীয়।[৬২৭] আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি প্রকৃত অর্থে একত্রে পরিচায়ক মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি পরস্পর বিভাজ্য নয়। আল্লামা তাবাতাঈ বলেন: ‘‘ইসলামের নিদর্শন অনুযায়ী সঠিক বিশ্বাসের স্বরূপ হচ্ছে এ রকম: মহান আল্লাহ জ্ঞানী। কিন্তু তাঁর জ্ঞান অন্যদের জ্ঞানের মত নয়। তিনি সর্বশ্রোতা। তবে অন্যদের মত কান দিয়ে শুনার প্রয়োজন তাঁর হয় না। তিনি সর্বদ্রষ্টা, কিন্তু দেখার জন্য অন্যদের মত চোখের প্রয়োজন তাঁর নেই। এভাবে তাঁর অন্য সকল গুণাবলিই সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও তুলনাহীন।” [৬২৮]

---

৬২৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩

৬২৬ . আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৬২৭ . *প্রাগুক্ত*,   পৃ. ১৪

৬২৮ . আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা

আল্লাহর তা'য়ালার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বিশিষ্ট শীআ আলেম আল্লামা আল-মুজাফফর বলেন:

"আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহর একটি হ্যাঁ বোধক পূর্ণতা গুণ হলো, তিনি সকল অন্যায়ের মোকাবিলার ন্যায়পরায়ণ। তিনি ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত তাঁর সৃষ্টিকে লালন করেন না। তিনি ক্রোধ ভরে শাসন করেন না। তিনি তাঁর অনুগতকে পুরুস্কৃত করেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাদের সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব প্রদান করেন না। তাদের পাপের ফলে প্রাপ্ত শাস্তির অধিক কোন শাস্তি তিনি তাদেরকে প্রদান করেন না। আমরা বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ সুকর্ম সাধন থেকে বিরত থাকেন না। তিনি কখনো কুৎসিত কর্ম করেন না। কারণ, তিনি তাঁর জ্ঞানের কারণে সুকর্ম সাধন করতে সক্ষম ও কুৎসিত কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম। অসীম জ্ঞানের আলোকে সুকর্মের সুদিক ও কুৎসিত কর্মের কুদিক তাঁর নিকট স্পষ্ট। তিনি সুকর্ম করতেও সক্ষম আবার কুৎসিত কর্ম করতেও সক্ষম। যেহেতু কোন সুকর্মই তাঁর কাজের কোন ক্ষতি করতে পারে না তাই তাঁর তা ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে কোন কুৎসিত কর্মই তাঁর প্রয়োজন হয় না। তাই তিনি তা করতে বাধ্য নন। মহান আল্লাহ হলেন প্রজ্ঞাবান, সুতরাং তাঁর কর্মকান্ড কখনই তাঁর প্রজ্ঞা বহির্ভূত হয় না এবং তা সর্বোত্তম কল্যাণময় পন্থায় সম্পন্ন হয়।"[৬২৯]

মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত

শীআরা বিশ্বাস করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দায়িত্ব প্রদান করেন এবং এ সম্পর্কে চুড়ান্ত দলীল উপস্থাপন করেন। তিনি মানুষের সাধ্যের অতীত কোন দায়িত্ব প্রদান করেন না। যা মানুষের অজ্ঞাত ও বোধগম্য নয় তা তিনি তাদের উপর চাঁপিয়ে দেন না। তারাঁ মনে করে অক্ষমকে দায়িত্ব প্রদান করা যুলুম বা অন্যায়। যা আল্লাহ তা'য়ালা কখনই করেন না। তবে বিধি বিধান ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করার কারণে মানুষ আল্লাহর নিকট দায়ী থাকবে এবং তার অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের জন্যই তার নিজের

---

৬২৯ . আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ১৫-১৬

আবশ্যকীয় শরীয়তের হুমুম আহকাম জেনে নেওয়া আবশ্যক।[৬৩০] আবশ্যকীয় জ্ঞানার্জন না করার কারণে মানুষ আল্লাহর নিকট দায়ী থাকবে এবং এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সঠিক পথ তথা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য বিধি বিধান দিয়েছেন এবং এগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাও করেছেন। সে সাথে তিনি মানুষকে খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচার পথ নির্দেশ দিয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখছেন। এ গুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি অসীম দয়া ও করুণার উজ্জল দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহর দয়া ও করুণা তার সত্তাগত তা তাঁর থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাঁর কোন অবাধ্য বান্দা অপকর্মের মাধ্যমে নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে আনলেও তিনি তার থেকে দয়া ও করুণা তুলে নেন না।[৬৩১]

ইচ্ছার স্বাধীনতা

জাবারিয়ারা মনে করে মানুষের কোন ইচ্ছায় স্বাধীনতা নেই। মহান আল্লাহ সৃষ্টির সকল কার্যাবলীর কর্তা। তিনি মানুষকে পাপ কাজে বাধ্য করেন এবং তিনিই শাস্তি প্রদান করেন। আবার তিনিই সৎকর্মে তাদের বাধ্য করেন এবং ঐ কাজের জন্য পুরস্কৃত করেন। তারা মনে করে মহান আল্লাহ তা'আলা সকল কাজের সংঘটক।[৬৩২] অপর দিকে কাদারিয়্যারা মনে করে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। ফলে মানুষের যে কোন কর্মে আল্লাহর শক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। [৬৩৩]

এ সম্পর্কে শীআরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে থাকে। কর্মের ক্ষেত্রে তারা মনে করে এটা মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতাধীন আবার আল্লাহর প্রভাব ও ক্ষমতাধীন। কারণ আল্লাহ তা'য়ালাই হলেন অস্তিত্ব দানকারী। তিনি মানুষকে পাপ কাজে বাধ্য করেননি যে, পাপ করলে শাস্তি দিলে তাঁর পক্ষ থেকে জুলুম করা হবে। কেননা, কাজটি করার ক্ষেত্রে মানুষের ঐচ্ছিক স্বাধীনতা ও

---

৬৩০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৬৩১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮

৬৩২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

৬৩৩ . *প্রাগুক্ত*

শক্তি ছিল। অন্যদিকে, মানুষের কর্মকে অস্তিত্ত্ব দিতে তিনি মানুষকে একেবারে ছেড়ে দেননি। কেননা, তিনিই সমগ্র সৃষ্টি ও হুকুমের মালিক। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

দ্বীনের আহকাম

বান্দা যাতে নিজ কর্মের মাধ্যমে নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা শরীয়তের বিধান তথা ফরয, ওয়াজিব, হারাম ইত্যাদি প্রণয়ন করেছেন। যা কিছু একান্তই কল্যাণকর তাই তিনি আবশ্যক করেছেন আর যার সিংহভাগ বান্দার জন্য অকল্যাণকর তা নিষিদ্ধ করেছেন। এটা হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা ও ন্যায়পরায়ণতা। মহান আল্লাহ তা'আলা সকল ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞাময় বিধান প্রদান করেছেন।[৬৩৪] উল্লেখ্য, বান্দার কর্মকান্ডের আবশ্যকতায় ও নিষেধে মহান আল্লাহর কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ নেই। সমস্ত কর্মের কল্যাণ ও অকল্যাণ বান্দার দিকেই ফিরে আসে। আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কর্মকান্ডের কল্যাণ ও অকল্যাণটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্যবিহীন কোন আদেশ অথবা নিষেধ করেন না।[৬৩৫]

নবুওয়্যাত

শীআরা বিশ্বাস করে নবুওয়্যাত হলো একটি ঐশী দায়িত্ব এবং মহান আল্লাহ তা'আলার মিশন। তিনি এ কাজে যোগ্য ও পরিপূর্ণ বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে নির্বাচন করেছেন। অতঃপর এসব নির্বাচিত ব্যাক্তিবর্গকে মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন যাতে করে তারা ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারেন। সে সাথে মানুষকে চারিত্রিক কলুষতা থেকে মুক্ত করে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। দয়াময় সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দাদের হিদায়াত, পূর্ণগঠন এবং তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কে স্থাপনের জন্য রাসূল প্রেরণ করেন।[৬৩৬]

---

৬৩৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২২

৬৩৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৬৩৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

শীআরা আরো বিশ্বাস করে যে, নবুওয়্যাত আল্লাহর ইচ্ছাধীন তিনি যাকে নির্বাচন করেছেন তিনিই নবী। তিনি তার বান্দাদের নবী নির্বাচনে অধিকার দেননি। কেবল আল্লাহই নবী নির্বাচন করতে পারেন। ফলে আল্লাহ যাদেরকে নবী হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাঁদের ব্যাপারে কোন বিতর্ক করায় অধিকার কারো নেই। সে সাথে নবীগণ যে সুন্নাহ ও শরীয়াহ নিয়ে এসেছেন সে ব্যাপারেও কারো কোন সন্দেহ করার অধিকার নেই।

নবীদের মুজিযা

নবীগণের মুজিযা সম্পর্কে শীআরা মনে করে নবীগণ দাওয়াতি কাজ করতে গেলে বাঁধার সম্মুখীন হন, তখন মানুষ তাঁর নিকট দলিল চাইলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা প্রদান করা হয়। যা রেসালতের স্বপক্ষে শক্তিশালী, দলিল হিসেবে পরিগণিত। কোন নবী যখন নবুওয়্যাতের দাবি করেন তখন তার স্বপক্ষে মুজিযা পেশ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। তখন মহান আল্লাহর সাহায্যে মুজিযা উপস্থাপিত হলে নবী সম্পর্কে মানুষের ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। কেননা, মুজিযা এমন যে, সমকালীন জ্ঞানী গুণীরা পর্যন্ত তা প্রদর্শনে অক্ষম হয়ে যায়। আর সাধারণ মানুষতো একেবারে বিস্মিত হয়ে যায়। নবী যখন মুজিযা পেশ করেন তখন সমকালীন মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় যে, তিনি সাধারণ মানুষের মতো নন বরং তিনি মহান স্রষ্টা কর্তৃক নির্বাচিত নবী। অতঃপর তিনি যখন রিসালাতের প্রতি আহবান জানান তখন মানুষ সহজেই তাঁর কথা বিশ্বাস করে।[৬৩৭]

নবীদের নিষ্পাপ হওয়া

নবীদের ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে শীআরা মনে করে নবীগণ নিষ্পাপ।[৬৩৮] মহান আল্লাহ নবীদেরকে তাঁর ঐশী বিধান প্রচার প্রসারের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে সত্য পথে পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছেন ফলে স্বয়ং নবীর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কেননা, যিনি মানব জাতিকে মহাসত্যের দিকে আহবান করবেন অন্যায় অসত্য থেকে দূরে রাখার জন্য সচেষ্ট হবেন তিনি যদি অন্যায় কাজ করে ফেলেন তাহলে মানুষ কার অনুসরণ

৬৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮

৬৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

করবে? কোন নবি যদি অন্যায় অপরাধ করে ফেলেন তাহলে তার উম্মতের সদস্যরা তাঁর ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। ফলে নবীর মাধ্যমে ঐশী আদর্শ প্রচারের মহতী উদ্দেশ্য ভেস্তে যায়।[৬৩৯]

শীআরা নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

''তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।"[৬৪০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا – إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না। শুধু তার মনোনীত রাসূল ছাড়া। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন। রাসূলগণ তাঁদের বাণী পৌঁছে দিয়েছে কিনা, তা জানার জন্য।"[৬৪১]

শীআরা বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল প্রদান করে, এভাবে যে, নবী কর্তৃক যদি পাপ ও ভুলত্রুটি সংঘটিত হয় তাহলে তা পালন করা উম্মাহর জন্য আবশ্যক হবে না হয় আবশ্যক হবে না। যদি তাঁদের অনুসরণ করা আবশ্যক হয় তাহলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মাহর জন্য (পাপ কাজ করা) বৈধ হয়ে যাবে এমনিক তা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অথচ তা কখনই সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর তাঁদের অনুসরণ যদি আবশ্যক না হয় তাহলে নবুওয়্যাতই অস্বীকৃত ও অর্থহীন হয়ে যায়। আর নবীকে অনুসরণ করা উম্মতের জন্য একান্ত আবশ্যক। সেক্ষেত্রে যদি নবী কর্তৃক পাপ ও ভুল-ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে উম্মাহর পক্ষে তাঁর অনুসরণ অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে নবুওয়্যাতের উদ্দেশ্যেই ব্যাহত হবে। সুতরাং নবীদের নিষ্পাপ হওয়াই স্বাভাবিক।[৬৪২]

---

৬৩৯. আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

৬৪০. আল-কুরআন, ৬ : ৮৭

৬৪১. আল-কুরআন, ৭২-২৭

৬৪২. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

নবীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শীআদের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল মুজাফফর বলেন: ‘‘আমরা বিশ্বাস করি যে, যেমনি করে তাঁর পবিত্র হওয়া আবশ্যক তেমনি সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ থাকা। যেমন: সাহসিকতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ধৈর্য, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রত্যুতপন্নমতিত্ব ইত্যাদি। অর্থাৎ কেউই এ সকল বৈশিষ্ট্য তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কারণ যদি তা না নয় তবে সকল সৃষ্টির উপর তার সার্বজনীন প্রাধান্য থাকতে পারে না এবং সামগ্রিকভাবে জগতকে পরিচালনা করার মত সামর্থ্য তাঁর থাকবে না। অনুরূপভাবে তাঁকে হতে হবে জন্মগতভাবে পবিত্র বংশোদ্ভুত, সৎ, সত্যবাদী। এমনকি নবুওয়্যাতের ঘোষণার পূর্বেও তাঁকে সমস্ত প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে যাতে মানুষ তাঁকে চুড়ান্তভাবে বিশ্বাস করতে পারে, তার নিকট আশ্রয় পেতে পারে এবং সংগত কারণেই তিনি এ সকল মর্যাদার (পবিত্রতা) উপযুক্ত।’’[৬৪৩]

নবীরা সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্নতর ছিলেন। তাঁদের আল্লাহ তা‘আলা নির্বাচিত করেছেন। নবীগণ ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যের প্রতিভূ। কোন ধরনের অতিরঞ্জন ছাড়াই তাঁরা তাঁদের অনুভূতি ও উপলব্দির কথা প্রকাশ করতেন। যা তাঁরা বলতেন, তাই তারা করতেন।’’[৬৪৪]
শীআরা বিশ্বাস করে সকল নবী রাসূল সত্য। তাঁরা সকলেই পবিত্র তথা নিস্পাপ। তাঁদের নবুওয়্যাতকে অস্বীকার করা, বিদ্রুপ করা কুফুরি ও নাস্তিকতা বৈ কিছু নয়। কোন নবীকে অস্বীকার করা হযরত মুহাম্মদ (স.) কে অস্বীকার করার নামান্তর। কারণ তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁদের সত্যায়ন করেছেন।[৬৪৫] যে সকল নবীর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। তাঁদের কোন একজনকে অস্বীকার করা মুহাম্মদ (স.) কে অস্বীকার করার নামান্তর।[৬৪৬]

শীআরা পাঁচজন নবীকে উলুল আযম বা শরীয়ত প্রবর্তক নবী মনে করেন। তারা হলেন, হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং

---

৬৪৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৬৪৪ . আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮

৬৪৫ . আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

৬৪৬ . প্রাগুক্ত

হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁরা মনে করে, অন্যান্য নবীগণ এসব উলুল আযম নবীদের আনীত শরীয়তের অনুসারী ছিলেন।[৬৪৭] এ সম্পর্কে তাঁরা নিম্নোক্ত আয়াত দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى-

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনকে বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে।" [৬৪৮]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"তখন স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের নিকট হতে, তোমার নিকট হতে নুহ, ইব্রাহীম, ঈসা ইব্ন্ মারইয়াম ও মুসা নিকট হতে। আর তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম সুদৃঢ় অঙ্গীকার।"[৬৪৯]

শীআরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা আবশ্যক মনে করে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট শীআ আলেম আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল মুজাফফার বলেন: ''তাঁদের গ্রন্থ সমূহ এবং তাঁদের উপর যা নাযিল হয়েছে, তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে যে ইঞ্জিল ও তাওরাত মানুষের নিকট আছে। তা যেরূপ নাযিল হয়েছিল সেরূপ আর নেই। বর্তমানে এতদ্বয়ের মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের প্রমাণ মিলে – যা হযরত মুসা (আ.) ও ঈসার (আ.) -এর পর সংঘটিত হয়েছে। এক ধরনের লোভী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিদের দ্বারা এ বিকৃতি সাধিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যা আছে তার অধিকাংশই হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) -এর পর তাদের অনুসারীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।"[৬৫০]

---

৬৪৭. আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০-২০১

৬৪৮. আল-কুরআন, ৪২ : ১২

৬৪৯. আর-কুরআনুল কারীম, ৩৩ : ০৭

৬৫০. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

মহানবী (স.) সম্পর্কে শীআদের বিশ্বাস হলো মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইসলামের বাণী বাহক, সর্বশেষ নবী, নবী-রাসূলদের সর্দার এবং নিঃশর্তভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম। তিনি মানবজাতির শীর্ষে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাউকে তুলনা করা যায় না। বদান্যতার দিক থেকে তাঁকে কেউ ছুতে পারে না। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে কেউই তাঁর নিকটবর্তী নয়। সৃষ্টিকূলে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি সৃষ্টির সেরা। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।[৬৫১]

কুরআন মাজিদ

মহানবী (স.)-এর উপর অবতারিত কুরআন মাজিদ সম্পর্কে শীআদের বিশ্বাস হলো পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। যা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স.) এর উপর নাযিল হয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় সকল কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এটি চিরন্তন মুজিযা। মানুষের পক্ষে এ রকম রচনা অসম্ভব। এতে আছে জ্ঞান ও হিকমত। কখনই এতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি হবে না। কুরআন এখন যেমন আছে, যা এখন পাঠ করা হয় এমনই মুহাম্মদ (স.) এর উপর নাযিল হয়েছিল। এ বিশ্বাসের বাইরে যদি কেউ থাকে তাহলে সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট।[৬৫২]

শীআরা বিশ্বাস করে, কথা ও কাজে কুরআনের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। কুরআনের কোন শব্দ অথবা শব্দাংশকে অপবিত্র করা হারাম। অপবিত্র অবস্থায় কোন শব্দ বা শব্দাংশ স্পর্শ করা অবৈধ। এ সম্পর্কে তাদের দলিল হচ্ছে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"পবিত্ররা ব্যতীত কেউই একে স্পর্শ করতে পারে না।"[৬৫৩]

শীআরা বিশ্বাস করে, কুরআন মাজিদ অগ্নিদগ্ধ করা বৈধ নয়। যা অপমান জনক বলে সাব্যস্ত তা কুরআন মাজিদের সাথে কোনভাবেই করা বৈধ নয়। যেমন, নিক্ষেপ করা, পা দিয়ে ঠেলে

---

৬৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৬৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৬৫৩. আল-কুরআন, ৫৬: ৭৯

দেয়া অথবা কোন অসম্মানজনক স্থানে রাখা। যদি কেউ এ রকম গর্হিত কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে তাহলে সে দ্বীনে অবিশ্বাসী এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারী।[৬৫৪]

ইমামত

মহানবী (স.)-এর তিরোধানের পর মুসলিম উম্মাহ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল বিশ্বাস করে মহানবী (স.) নিজের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যান নাই। তিনি উম্মতের উপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গেছেন তারাই নির্ধারণ করবে কে তাঁদের নেতা হবে। এরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী।[৬৫৫]

অন্যদিকে অপর দল মনে করে, মহানবী (স.) ছিলেন নির্ভুল ও পবিত্র তিনি সকলপ্রকার পাপ ও ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ছিলেন উম্মাহর জন্য এমন একজন নেতা নির্বাচন মহানবী (স.) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হতে পারে। মহানবী (স.) এ কাজ করে গিয়েছিলেন। তিনি আলী (রা.) কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম নিযুক্ত করে যান। এ বিশ্বাসে বিশ্বাসীরাই শীআ।[৬৫৬] ইমাম অর্থ নেতা অর্থাৎ মুসলমানদের নেতা। ইমাম হবেন এমন একজন পবিত্র ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তি যিনি সকল বিষয়ে মহানবী (স.) এর উত্তরসূরী হবেন। তাঁর ও মহানবী (স.) এর মধ্যে পার্থক্য হলো, মহানবী (স.) এর উপর ইসলামের ওহী অবতীর্ণ হতো ইমামদের কাছে ওহী অবতীর্ণ হয় না। ইমামগণ মহানবী (স.)-এর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তারা আসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী।[৬৫৭]

আল্লামা তাবাতাবাঈ বলেন: ''ইমাম বা নেতা তাকেই বলা হয়, যে একদল লোককে নির্দিষ্ট কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক অথবা ধর্মীয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে।''[৬৫৮]

---

৬৫৪ . আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৬৫৫ . আয়াতুল্লাহ আল-উজমা নাসের মাকারিম সিরাজী, অনু. এস, জামান, *ইমামত* (খুলনা: আঞ্জুমান- এ-পাঞ্জাতনী, ২০০৩ খ্রি.) , পৃ. ০৯

৬৫৬ . প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

৬৫৭ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৬৫৮ . আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

তিনি আরো বলেন: ‘‘ইসলামী নেতৃত্ব তিনটি দিকে গুরুত্বের অধিকারী। সে দিকগুলো হচ্ছে, ইসলামি শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী জ্ঞান মালা ও আইন কানুন বর্ণনা এবং আধ্যাত্মিক জীবনে নেতৃত্ব ও পথ নির্দেশনার দিক। শীআদের তিনটি দিকের নেতৃত্ব দানের জন্যে নেতার প্রয়োজন অপরিহার্য। যিনি ইসলামী সমাজের এ তিনটি দিকের উপযুক্ত নেতৃত্ব দেবেন অবশ্যই তাকে মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (স.) এর দ্বারা মনোনীত হতে হবে। অবশ্য মহান আল্লাহর নির্দেশে বিশ্বনবী (স.) এ মনোনয়ন কার্য সম্পন্নও করে গেছেন।’’[৬৫৯]

ইমাম সম্পর্কে আল্লামা আল-মুজাফফর বলেন: ‘‘আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমাম হলো দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহের একটি যার উপর বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পুরুষ, আত্মীয় স্বজন ও শিক্ষক কাউকেই অনুসরণ করা বৈধ নয় যদিও তারা উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। বরং এর উপর অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চালানো জরুরী। যেমন- তা জরুরী হলো তাওহীদ ও নবুওয়্যাতের ক্ষেত্রে। ’’[৬৬০] ইমামতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন:

‘‘আমরা বিশ্বাস করি যে, নবুয়্যাতের মতই ইমামতও হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও করুণা। সুতরাং প্রত্যেক যুগেই পথপ্রদর্শক ইমাম থাকা আবশ্যক যিনি মানুষের হিদায়াতকারী এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সংবাদদাতা হিসেবে মহানবী (স.) এর প্রতিনিধিত্ব করবেন। মহানবি (স.) সর্বসাধারণের উপর যেরূপ সার্বজনীন বেলায়াত বা কর্তৃত্ব করতেন তিনি সেরূপ কর্তৃত্ব করবেন জনগণকে যাবতীয় কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য। ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায় অত্যাচার নির্মূল করার জন্য এবং তাদের পারস্পরিক শত্রুতা দূর করার জন্য।’’[৬৬১]

শীআদের বিশ্বাস হলো, ইমামত হলো প্রকারান্তরে নবুওয়্যাতী মিশনের ধারাবাহিকতা মাত্র। নবী-রাসূল প্রেরণ যে কারণে আবশ্যক তেমনি রাসূলের পর ইমাম নিযুক্ত করাও আবশ্যক। ইমাম কেবলমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবী (স.) এর মাধ্যমে অথবা পূর্ববর্তী ইমামের

---

৬৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

৬৬০. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৬৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

মাধ্যমে নিয়োগ লাভ করবেন। জনসাধারণের ইচ্ছা বা রায়ের কোন অধিকার এখানে নেই। যাকে ইচ্ছা ইমাম বানানো যাবে না। আবার ইমামত থেকে কাউকে বরখাস্তও করা যাবে না। আর ইমাম ব্যতীত উম্মাহর টিকে থাকা সম্ভব নয়। তারা মনে কওে যদি কেউ তার যামানার ইমামকে না চিনে মৃত্যু বরণ করে তবে তাঁর মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। শীআরা বিশ্বাস করে এমন সময় থাকা কোনভাবেই সম্ভব নয় আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত কোন ইমাম থাকবে না। মানুষ তাঁকে মানুক আর না মানুক। তিনি প্রকাশ্য থাকুন অথবা গোপনে থাকুন আর আত্মগোপন যদি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় তাতে কোন সমস্যা নেই।[৬৬২]

সর্বাবস্থায় ইমাম থাকা সম্পর্কে শীআদের দলীল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক"।[৬৬৩] তিনি অন্যত্র বলেন : ‘‘এমন কোন জাতি ছিল না যেখানে সতর্ককারী ছিল না।’’[৬৬৪]

ইমামের পবিত্রতা সম্পর্কে শীআরা বিশ্বাস করে ইমামগণ নবীদের মতো নিষ্পাপ। তাঁরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল প্রকার পাপকার্য থেকে মুক্ত। সে সাথে সকল প্রকার ভুল-ক্রটি থেকে তারা উর্দ্ধে। নবীদের পবিত্রতায় বিশ্বাস করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে শীআরা কোন পার্থক্য করে না। তারা মনে করে ইমামগণ নবীদের মতো শরীয়ত রক্ষাকারী ও প্রতিষ্ঠাতা।[৬৬৫] শীআরা ইমামকে বাহ্যিক জগত ও আভ্যন্তরীণ জগতের অনুঘটক মনে করে। আল্লামা তাবাতাবাঈ বলেন:

‘‘ইমাম যেমন মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মের ব্যাপারে নেতা ও পথ প্রদর্শক স্বরূপ। তেমনি তিনি মানুষের অন্তরের ও ইমাম ও পথ প্রদর্শক। তিনিই প্রকৃতপক্ষে মানবজাতি ও যে কাফেলা আধ্যাত্ব পথে মহান আল্লাহর প্রতি ধাবমান তাদের কর্ণধার স্বরূপ।’’[৬৬৬] ইমামের জ্ঞান ও গুণাবলি সম্পর্কে শীআদের বিশ্বাস হলো, ইমামের জন্য মহানবী (স.)-এর বীরত্ব, মহত্ত্ব, আত্ম

---

৬৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

৬৬৩.আল-কুরআন, ১৩ : ০৮

৬৬৪. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৪

৬৬৫. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৬৬৬. আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

সম্মান, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নৈতিকতা ইত্যাদি পরিপূর্ণ গুণের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে সেরা হওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে মহানবী (স.) এর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যে দলিল প্রযোজ্য, ইমামের শেষ্ঠত্বের জন্য সে একই দলীল প্রযোজ্য।[৬৬৭]

শীআরা বিশ্বাস করে যে, ইমাম তাঁর সমস্ত জ্ঞান নবীর মাধ্যমে অথবা পূর্ববর্তী ইমামের মাধ্যমে লাভ করে থাকেন। যদি কোন নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হন তখন তাঁর আত্মিক যোগ্যতার কারণে ইলহামের মাধ্যমে জানতে পারেন এবং যখন তিনি কোন কিছুর স্বরুপ উদঘাটনে প্রয়াসী হন তখন কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি ছাড়া ঐ বিষয়ে সম্মক জ্ঞান লাভে সক্ষম হন। অজানা বিষয়টা জানার জন্য তাঁকে কোন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হয় না।[৬৬৮]

ইমাম ইলহাম লাভের সর্বোচ্চ যোগ্যতায় পৌঁছে যান এবং পবিত্র ও পরিশুদ্ধ আত্মার মাধ্যমে তিনি যে কোন অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে যে কোন বিষয়ে সম্যক অবহিত হতে পারেন। তিনি যখন কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চান তখন তিনি কোন ভুমিকা ও শিক্ষা ব্যতীতই ইলহাম শক্তির মাধ্যমে তা পরিপূর্ণরূপে জানতে পারেন।[৬৬৯] ইমামদের আনুগত্য সম্পর্কে শীআরা বিশ্বাস করে যে, ইমামদের অনুগত্য করা অপরিহার্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইমামদের আনুগত্য করা উম্মাহর জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।[৬৭০]

শীআরা ইমামদের মানুষের সাক্ষী, জ্ঞানের সংরক্ষক, ওহীর ব্যাখ্যাকারী, তাওহীদের স্তম্ভ, আল্লাহর পথের দ্বার ও পথ নির্দেশক এমনকি তারা পৃথিবীর মানুষের নিরাপত্তা বিধায়ক বলে বিশ্বাস করে। [৬৭১] শীআরা ইমামদের আদেশকে আল্লাহর আদেশ মনে করে তেমনি ইমামদের নিষেধকে আল্লাহর নিষেধ মনে করে। তারা মনে করে, ইমামদের আনুগত্য মানে আল্লাহর আনুগত্য, তাদের অবাধ্য মানে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া, তাদের শত্রু হওয়া মানে আল্লাহর শত্রু

---

৬৬৭. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৬৬৮. *প্রাগুক্ত*

৬৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৬৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৬৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫

হওয়া। কোন ভাবেই তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়। তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করা।[৬৭২]

শীআরা মনে করে, ইমামদের নিকট আত্মসমর্পণ করা, তাদের আদেশ মেনে চলা ও তাদের কথা অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যক।[৬৭৩] শীআরা বিশ্বাস করে ঐশী জ্ঞান শুধু ইমামদের করায়ত্ত। তাদের থেকেই ঐশী নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে। অন্য কারো নিকট থেকে গ্রহণ করা যাবে না। তারা মনে করে, যে সকল ব্যক্তিবর্গ ইমামগণ কর্তৃক প্রশিক্ষিত হয়নি, তাঁদের জ্ঞানের আলোয় যারা আলোকিত হয়নি তারা হিদায়াত থেকে বিচ্যুত।[৬৭৪]

ইমামদের সম্পর্কে শীআদের বিশ্বাস সম্পর্কে বিশিষ্ট শীআ আলেম আল মুজাফফর বলেন: "আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা আমাদের মতই মানুষ আমাদের যা আছে তাঁদের তা আছে। আবার তাদের যা আছে আমাদেরও তা আছে। তথাপি তাঁরা হলেন মর্যাদাবান, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে ধন্য করেছেন, দিয়েছেন বেলায়াত। কারণ তাঁরা জ্ঞান, তাকওয়া, সাহসিকতা, আত্মসম্মান, সকল প্রকার মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসিত গুণে সকল মানুষের সেরা এবং পরিপূর্ণ। এ সকল দিক থেকে কেউই তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারে না। সুতরাং ইমামদের ক্ষেত্রে তাঁরাই যোগ্যতম ব্যক্তি। হিদায়াতকারী হিসেবে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ এবং শরীয়তের হুকুম আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রে, কুরআন ও দ্বীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মহানবী (স.) এর পর তাঁরাই বিশ্ববাসীর জন্যে আশ্রয়স্থল।"[৬৭৫] শীআরা বিশ্বাস করে ইমামত নবুওয়্যাতের মতো রাসূল কিংবা নিযুক্ত কোন ইমামের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হতে হবে। এক্ষেত্রে ইমামতও নবুওয়্যাতের মতোই।[৬৭৬]

খলীফা বা ইমাম একমাত্র আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করবেন অন্য কেউ নয়। কুরআনের বর্ণনামতে মহান আল্লাহ ব্যতীত নিঃসন্দেহে অন্য কেউ ইমাম বা খলীফা নির্বাচন করতে পারে

---

৬৭২. *প্রাগুক্ত*

৬৭৩. *প্রাগুক্ত*

৬৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৬৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৯

৬৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

না।[৬৭৭] তারা বলে, ইমামতের শর্ত হলো ইসলামের সকল নীতি ও আমল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। যে জ্ঞানের ভিত্তি জান্নাতের সাথে সংযুক্ত আর যা মহানবী (স.) এর জ্ঞানের অনুরূপ। এ জ্ঞানের ভিত্তিতে একজন ইমাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধি বিধানের তত্ত্বাবধান ও সংক্ষণ করবেন। [৬৭৮] ইমামতের আরেকটি অপরিহার্য শর্ত হলো পবিত্র ও নিষ্পাপ হওয়া। ইমাম যাবতীয় পাপ ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকবেন। এসব গুণাবলি থাকলেই ইমামতের মর্যাদা ও ইমামতের নেতৃত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব পর হবে।[৬৭৯]

শীআরা বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নবীর পক্ষেই এ শর্তসমূহ আলাদা করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলাই জানেন, কার আত্মা পবিত্র, জ্ঞানে কে সবচেয়ে অগ্রগামী, কার মাঝে যথার্থ সাহসিকতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিদ্যমান। [৬৮০]

শীআরা বিশ্বাস করে মহানবী (স.) খলীফা নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তারা বিভিন্ন হাদীস পেশ করে থাকে। মহানবী (স.) এর পর তাঁর উত্তরাধিকারী ও ইমাম হলেন আলী (রা.)। তাঁরা মনে করে ঐতিহাসিক গাদির দিবসে তাঁকে আমিরুল মুমিনীন হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি লোকজন থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক গাদির দিবসে মহানবী (স.) উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "মহান আল্লাহ এরূপ ইরশাদ করেছেন: হে লোক সকল! মহা মর্যাদাবান আল্লাহ আমার উপর যা বার্তা অবতীর্ণ করেছেন তা পৌঁছাতে আমি কোনো অবহেলা করিনি। আর এখন এ আয়াতের শানে নুযুল আমি তোমাদের বর্ণনা করছি। (শানেনুযুল হল) এটা যে হযরত জিবরাঈল (আ.) তিন দফা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম ও তাসলীম সহকারে (সালাম আল্লাহর নাম সমূহের একটি) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এ স্থলটিতে দাঁড়াতে। আর প্রত্যেক সাদা ও কালো (লোক) কে এ সংবাদ প্রদান করতে, এ ঘোষণা করতে যে, আবু তালেব তনয় আলী (রা.) হলেন আমার ভাই এবং সকল মানুষের জন্য আমার স্থলাভিষিক্ত। অবশ্য আমার পরে আর কোন নবী থাকবে

৬৭৭. আয়াতুল্লাহ আল-উজমা নাসের মাকারিম সিরাজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৬৭৮. *প্রাগুক্ত*, ২৮-২৯

৬৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

৬৮০. *প্রাগুক্ত*

না। আর তিনি (আলী রা.) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরে তোমাদের অভিভাবক হবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থ থেকে আমার উপর একটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

"তোমাদের অভিভাবক তো কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং সে মুমিনগণ যারা যথারীতি নামায আদায় করে আর রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে।"[৬৮১]

আর আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) নামায কায়েম করেছেন এবং রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করেছেন, আর সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মনোবাঞ্চনা পোষণ করেন।[৬৮২] শীআ বর্ণনুযায়ী মহানবী (স.) এ ভাষণে আরো বলেন:

হে লোক সকল! এমন কোন জ্ঞান নেই যা আল্লাহ আমাকে দান করেননি। আর আমি যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছি তা ধর্মভীরুদের নেতা (ইমাম) কে শিক্ষা দিয়েছি। এমন কোন জ্ঞান নেই যা আলী (রা.) কে শিখাইনি। তাই অবশ্যই তিনি সর্বপ্রকার আপত্তি ও তর্কের উর্ধ্বে ইমাম ও নেতা।[৬৮৩]

মহানবী (স.) আরো বলেন: "হে লোক সকল! আলী (রা.) কে সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলে মানবে, কেননা মহান আল্লাহই তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর মনে প্রাণে তার নির্দেশ গ্রহণ করবে। কারণ তিনি আল্লাহর মনোনীত। হে লোক সকল! আলী (রা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমাম ও নেতা। তার অস্বীকারকারীর কোনোরূপ তওবা গ্রহণীয় নয়। ক্ষমাও তার কোন অস্বীকারকারীর কপালে জুটবে না। আল্লাহর উপর ধার্য্য রয়েছে যে, তাঁর (আলীর) নির্দেশের বিরোধিতাকারীকে এরূপ বঞ্চনার শিকার করবেন এবং অনন্তকাল কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত করবেন। কাজেই তার বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকো। নতুবা এমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে

---

৬৮১. আল-কুরআন, ০৫ : ৫৫

৬৮২. ড. এম আর হাশেমী, গাদিরে খুমে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ভাষণ (ঢাকা: বিশ্ব আহলে বাইত (আ:) পরিষদ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৪

৬৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

যার জ্বালানী মানুষ ও পাথর সমূহ যা কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।"[৬৮৪] মহানবী (স.) আরো বলেন: ''হে লোক সকল! এ আলী (রা.) হলেন আমার ভাই, আমার স্থলাভিষিক্ত ও আমার জ্ঞানের ধারক বাহক। তিনিই আমার পরে উম্মতের খলীফা, কুরআনের তাফসীরে অভিজ্ঞ এবং মানুষদেরকে তার প্রতি আহবানকারী।[৬৮৫]

শীআরা বর্ণনা করে যে রাসূল (স.) সেদিন আরো বলেন: '' হে লোক সকল! আমি আলী (রা.) এবং তার সন্তানদো কিয়ামত পর্যন্ত ইমাম এবং আমার বেলায়েতের উত্তরসূরী হিসেবে আমানত রেখে গেলাম। আমি যে জিনিস প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলাম তা উপস্থিত-অনুপস্থিত। সাক্ষ্যদানকারী-সাক্ষ্যদান না করা পৃথিবীতে আগত-অনাগত সকলের জন্য প্রচার করে গেলাম।"[৬৮৬] শীআরা মনে করে আলী (রা.) ও মহানবী (স.) এর অবর্তমানে মুসলিম উম্মাহর খলীফা হওয়ার একমাত্র হকদার। কেননা, ইমাম নিয়োগ করার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা যা মহানবী (স.) এর মাধ্যমে আলী (রা.) কে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা এও বিশ্বাস করে যে, হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.) এর খিলাফত গ্রহণ সঠিক নয়। একে তারা আলী (রা.) এর অধিকার বিনষ্টকরণ ও মহানবি (স.) এর নির্দেশ অমান্যকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করে। হযরত আলী (রা.) এর অবর্তমানে পরবর্তী ইমাম নিয়োগ করার অধিকার একমাত্র আলী (রা.) এর ছিল। তাদের কথা হলো, বর্তমান ইমাম ভবিষ্যৎ ইমাম নিয়োগ করবেন। জনগণ ইমাম নিয়োগের অধিকার রাখে না। ইমাম নির্দিষ্ট করা আছে। তারা মোট বারোজনে সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে আল মুজাফফর বলেন:

''আমরা বিশ্বাস করি ইমামগণ যাঁদের সত্যিকার অর্থে ইমামত্তের বৈশিষ্ট্য আছে এবং যারা মহানবী (স.) এর পর আমাদের জন্য শরীয়তের আহকামের উৎসরূপে আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনয়ন লাভ করেছেন তাঁরা হলেন বারজন।"[৬৮৭] আল মুজাফফর আরো বলেন:''মহানবী

৬৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮

৬৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৬৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৬৮৭. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

(স.) তাঁদের (বার জনের) সকলের উল্লেখপূর্বক মনোনয়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁদের অগ্রজ ঘোষণা দিয়েছিলেন অনুজের। আর তা নিম্নরূপঃ

১। আবুল হাসান আলী ইব্ন আবি তালিব (আল মুর্তাযা) যাঁর জন্ম ১২ হিজরী পূর্বাব্দ এবং হিজরী ৪০ সালে শাহাদাৎ বরণ করেন।

২। আবু মোহাম্মদ আল হাসান ইব্ন আলী (আয যাকি) (২ হি. - ৬১ হি.)।

৩। আবু আব্দুল্লাহ আল হুসাইন ইব্ন আলী, (সাইয়্যেদুল শোহাদা) (৩ হি. - ৬১ হি.)।

৪। আবু মোহাম্মদ আলী ইবনিল হুসাইন (যয়নুল আবেদীন) (৩৮ হি. - ১১৪ হি.)।

৫। আবু জাফর মোহাম্মদ ইব্ন আলী (৫৭ হি.- ১১৪ হি.)।

৬। আবু আব্দুল্লাহ জাফর ইব্ন মোহাম্মদ (আস সাদিক) (৮৩ হি. - ১৮৩ হি.।

৭। আবু ইব্রাহিম মুসা ইব্ন জাফর (আল কাযিম) (১২৮ হি. - ১৪৮ হি.)।

৮। আবুল হাসান আলী ইব্ন মুসা (আর রেযা) (১৪৮ হি. - ২০৩ হি.)।

৯। আবু জাফর মোহাম্মদ ইব্ন আলী (আল জাওয়াদ) (১৯৫ হি. - ২২০ হি.)।

১০। আবুল হাসান আলী ইব্ন মোহাম্মদ (আল হাদী) (২১২ হি. - ২৬০ হি.)

১১। আবু মোহাম্মদ আল হাসান ইব্ন আলী (আল আসকারী) (২৩২ হি. - ২৬০ হি.)

১২। আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইবনিল হাসান (আল মাহদী) (২৬৫ হি.-)

দ্বাদশতম ইমাম হলেন সর্বশেষ ইমাম আমাদের সময়কালের ইমাম যিনি অন্তর্ধানে রয়েছেন। আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষমান, মহান আল্লাহ তাঁর আবির্ভাব তরান্বিত ও সহজ করুন যাতে তিনি পৃথিবীতে সেরূপে ন্যায়-নীতিতে পরিপূর্ণ করে দিতে পারেন, যে রুপে পৃথিবী যুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।”[৬৮৮]

ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে শীআরা বিশ্বাস করে যে, তিনি অবশ্যই আসবেন। তিনি (ইমাম মাহদী (আ.) ফাতেমা (রা.) এর রক্তিম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-নীতিতে পূর্ণ করে দিবেন।

শীআরা বিশ্বাস করে যে, ইমাম মাহদী (আ.) ২৫৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করে এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন এবং তিনি আত্বগোপন করে আছেন। তিনি ইমাম হাসান আসকারীর সন্তান।

---

৬৮৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫২

তাঁর নাম মোহাম্মদ। তাঁর এতদিন বেঁচে থাকাকে শীআরা মুজিযা হিসেবে গণ্য করে। তিনি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হন।[৬৮৯]

রাজাআত বা পুনরাগমন

রাজাআত বা পুনরাগমন সম্পর্কে শীআরা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা একদল মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবেন। পূর্বে তারা যে অবস্থায় পৃথিবীতে ছিল ঠিক সে অবস্থায় তাদের ফিরিয়ে আনবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এদের থেকে একদলকে সম্মানিত করবেন অপর দলকে লাঞ্ছিত করবেন। যারা সৎকর্মপরায়ণ ও নিপীড়িত তারাই সেদিন সম্মানিত হবে। আর যারা অসৎকর্ম সম্পাদনকারী ও অত্যাচারী আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। এ ঘটনা ঘটবে ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের পর।[৬৯০]

উপর্যুক্ত দু'দলের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আদর্শের ক্ষেত্রে চরম সীমায় পৌঁছবে। অতঃপর তারা পুনরায় মৃত্যুবরণ করবে এবং হাশরের মাঠে উত্থিত হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বিচার করবেন। শীআরা এ বিষয়ে সূরাহ মুমিনের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। আমরা আমাদের দোষ স্বীকার করছি, সুতরাং এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি? [৬৯১]

তাকিয়্যা

তাকিয়্যা সম্পর্কে শীআর বিশ্বাস করে যে, যে কেউ তার বিশ্বাস প্রকাশিত হলে, তার জীবন ও সম্পদ বিপন্ন হলে বাধ্য হয়ে তাকে তাকিয়্যা বা গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। শীআ ইমামগণ কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা প্রতি যুগেই নিপীড়িত হয়েছেন ফলে তারা তাকিয়্যার

---

৬৮৯ . আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৬৯০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৬৯১. আল-কুরআন, ৪০ : ১১

আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শীআরা বিশ্বাস করে যে, ইমামগণ স্বীয় বিশ্বাসের ও আমলের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে তারা দ্বীনও দুনিয়ার ক্ষতির হাত থেকে নিজেদের হিফাযাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। [৬৯২] তাকিয়া সম্পর্কে শীআরা মনে করে, তাকিয়্যা সর্বদা ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়। বরং কখনও কখনও অনাবশ্যকও বটে।

সত্য প্রকাশ করা যদি দ্বীনের জন্য কল্যাণকর হয়, অথবা দ্বীনের পথে জিহাদ বলে পরিগণিত হয় তবে জান মাল যেখানে তেমন গুরুত্ব বহন করে না। আবার যখন তাকিয়্যার কারণে কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হন। অসত্য বিস্তৃত হয়, দ্বীনের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় কিংবা অজ্ঞতার কারণে দ্বীনের মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে অথবা জুলুম ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায় তবে সেখানে তাকিয়্যা করা হারাম। তাকিয়্যা সম্পর্কে শীআরা কিছু দলিল পেশ করে থাকে, তারা বলে আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা.) কাফেরদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কাফির পরিচয় দিয়েছিলেন। আর ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ

"সে নয় যে বাধ্য হয় অথচ তাঁর হৃদয়ে রয়েছে দৃঢ় ঈমান।"[৬৯৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"তোমরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আর যে ব্যক্তি এ রূপ করবে আল্লাহর কাছে তার জন্য কিছুই নেই। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।" [৬৯৪]

তারা আরেকটি আয়াতের দলিল পেশ করে। তাহলো আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

৬৯২. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

৬৯৩. আল-কুরআন, ১৬ : ১০৬

৬৯৪. আল-কুরআন, ০৩ : ২৮

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ

"আর একজন বিশ্বাসী ব্যাক্তি যে তার ঈমানকে ফেরআউনের লোকদের নিকট গোপন রেখেছিল সে বলল।"[৬৯৫]

দোয়া

শীআরা দোয়াকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা মহানবী (স.) এর বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করে যার বিষয় বস্তু দোয়া। তারা মনে করে, দোয়া হলো বিশ্বাসীদের অস্ত্র, দ্বীনের খুঁটি এবং আকাশ ও পৃথিবীর জন্য নূর। আহলে বাইত শীআদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের মতাদর্শের মৌলিক বিষয়ও আহলে বাইত। আহলে বাইত থেকে বর্ণিত দোয়া এবং তাদের আমলকে তারা সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। যেমনঃ আহলে বাইত থেকে তারা দোয়া সম্পর্কে বেশ কিছু বাণী পেশ করে থাকে। তা হলোঃ

- সর্বোত্তম প্রার্থনা হলো দোয়া।
- মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল দোয়া।
- নিশ্চয় দোয়ার মাধ্যমে চরম দুর্দশা ও শাস্তি অপসারিত হয়।
- দোয়া সকল শারীরিক ও মানবিক পীড়া থেকে মানুষকে মুক্তি দান করে।[৬৯৬]

শীআরা সহিফায়ে সাজ্জাদিয়াকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করে এটি মূলত একটি দোয়ার সংকলন। ইমাম আলী ইব্ন হোসাইন ওরফে যাইনুল আবেদীন নিরব-নির্জনে জীবন কাটিয়ে দেন। খিলাফতের দাবী তিনি কখনও পেশ করেননি। শীআদের মতে তিনি তার ভক্ত অনুরক্তদের সাথে দোয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর এসব দোয়া সহিফায়ে সাজ্জাদিয়া নামক পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে।[৬৯৭] শীআদের বিশ্বাস পবিত্র কুরআন ও নাহজুল বালাগার পর আরবী ভাষার সর্বোত্তম বাচন ভঙ্গি এবং ইলাহিয়্যাত ও আখলাকের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দার্শনিকপন্থা এ সহিফায়ে সাজ্জাদিয়া।

---

৬৯৫. আল-কুরআন, ৪০ : ২৮

৬৯৬. আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

৬৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত বিষয়ে শীআদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মহানবী (স.) ও ইমামগণের কবর যিয়ারত, কবর সমূহের উপর সুবিশাল ইমারত নির্মাণ এবং এগুলো অটুট রাখা এগুলো ইমামদের নির্দেশনাই বাস্তবায়ন করা। কেননা, ইমামগণ তাঁদের অনুসারীদের কবর যিয়ারতে উৎসাহিত করেছেন। শীআরা মনে করে ইমামগণ এমন সব কাজে তাঁদের অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করেছেন যাতে সঠিক সওয়াব বিদ্যমান। এজন্য শীআরা মনে করে ওয়াজিব ইবাদত সমূহের পরই কবর যিয়ারত এবং এ জাতীয় কাজগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। তারা মনে করে ইমামদের কবর সমূহ দোয়া কবুলের সর্বাধিক উপযুক্ত স্থান।[৬৯৮]

তারা এ বিশ্বাস করে যে, যদি তারা নিয়মিত ইমামদের কবর যিয়ারত করে তবে ইমামগণ তাদের জন্য কিয়ামত দিবসে শাফায়াত করবে। কবর যিয়ারত বিষয়ে তারা বেশ কিছু নিয়ম কানুনের অনুসরণ করে। আল মুজাফফর এ রকম ৮টি নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। শীআরা বিশ্বাস করে যাবতীয় অত্যাচার ও অবিচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে । তারা মনে করে, ইমামগণ অত্যাচার, অবিচার, নিপীড়ন থেকে মুক্ত থাকতে অদেশ করেছেন। তারা আলী (রা.) বক্তব্য এ ভাবে পেশ করে যে, আলী (রা.) বলেন:

"যদি সাত আসমান ও এর নিম্নে যা কিছু আছে তা আমাকে এ জন্য দেয়া হয় যে, কোন পিঁপড়ের মুখ থেকে যবের একটি খোসা ছিনিয়ে নিতে হবে, আর এর দ্বারা আল্লাহর অবাধ্য হতে হবে তবে আল্লাহর শপথ। কখনই আমি তা করব না।" [৬৯৯] ইমাম জাফর সাদিকের উদ্ধৃতি তারা এভাবে দেয় যে, ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) বলেন: "কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হলে যদি সে অত্যাচারীকে মাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণ অভিশাপ দেয় তবে সে স্বয়ং অত্যাচারে লিপ্ত হয়।"[৭০০]

---

৬৯৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

৬৯৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৭০০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

অত্যাচারীকে সহযোগিতা না করা

শীআরা বিশ্বাস করে যুলুম ও অত্যাচার সবচেয়ে বড় পাপ ও বিচ্যুতি। এর পরিণাম অতি ভয়াবহ। অত্যাচারীকে সহযোগিতা না করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তারা মহান আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

"অত্যাচারীর সাথে বন্ধুত্ব ও তাদেরকে সহযোগিতা করো না। তাহলে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। মহান আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কেউই তোমাদের সাহায্য করবে না।" ৭০১

শীআরা মনে করে, বর্তমানে যে নাজেহাল অবস্থা তার জন্য দায়ী মুসলিম সমাজ কর্তৃক অত্যাচারীকে সহযোগিতা করা। এটাকে তারা সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে থাকে। যালিমদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই মুসলিম জাতি সত্ত্বা এমন দুর্বল হয়েছে যে, দুর্বল সংখ্যা লগিষ্ঠ ইহুদীদের হাতে মুসলিম জাতি আজ মার খেয়ে যাচ্ছে।[৭০২] শীআরা এক্ষেত্রে ইমাম সাজ্জাদের বাণীকে খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করে থাকে। অত্যাচারীকে কোনরূপ সহযোগিতা না করতে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এভাবে পথনির্দেশ করেন:

"ওহে তোমাকে কি তারা এজন্য নিয়ন্ত্রণ করে না যে, তোমাকে তাদের যুলুমের খাতার কেন্দ্রকাঠি বানাবে, তাদের মন্দ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তোমাকে পুল বানাবে, পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য সিঁড়ি বানাবে এবং তাদের যুলুমের আহবায়ক ও প্রচারক বানাবে ? তারা তোমাকে তাদের মাঝে নিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের হৃদয়ে দ্বিধা -দ্বন্দের সৃষ্টি করেছে। আর তোমার দ্বারা ভক্তদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করেছে। তাদের কুকর্মকে সুকর্ম হিসেবে প্রচার করেছে এবং নিজেদের দিকে বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তোমাকে ব্যবহার করে। এমনটি তাদের অতি নিকটবর্তী মন্ত্রী ও শক্তিশালী সহযোগীর থেকেও পায়নি। তুমি যা

---

৭০১ . আল-কুরআন, ১১ : ১১৩

৭০২ . আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

পেয়েছ তা যা তুমি দান করেছ তদপেক্ষা অতি সামান্য। এটি অতি সামান্য তার তুলনায় যে পরিমাণ অশ্লীলতা ও অন্যায় তোমার মাধ্যমে তারা বপন করেছে। তোমার নিজের কথা ভাব। কারণ তুমি ব্যতীত কেউই এ সম্পর্কে ভাববে না। নিজেকে এমনভাবে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করাও যেমনভাবে একজন দায়িত্বশীল ও দায়িত্বপরায়ণ ব্যক্তি হিসাব করে থাকে।"[৭০৩]

অত্যাচারী শাসকদের দায়িত্ব গ্রহণ

অত্যাচারীকে খোরমার অংশবিশেষ পরিমাণ সাহায্য করাকেও ইমামগণ নিষিদ্ধ করেছেন। সে ক্ষেত্রে অত্যাচারী শাসকদের প্রশাসনে পদ গ্রহণ করে তাদের সহযোগিতা কোনভাবেই বৈধ মনে করেন না শীআ আকীদার ব্যক্তিবর্গ। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ইমামগণ তা জায়েয মনে করেছেন। যেমন, অত্যাচারী শাসকের অধীনে এমন এক পদ গ্রহণ যাতে অবস্থান করে ন্যায়পরায়ণতা ও বিচার প্রতিষ্ঠান, মুমিনদের কল্যাণ সাধন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা সহজ হয় সে ক্ষেত্রে এটা বৈধ।

এ প্রসঙ্গে শীআরা ইমাম জাফর সাদিকের বাণীকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। তিনি বলেন:

"অত্যাচারীর দরবারে মহান আল্লাহর এমন কেউ আছে যাদের মধ্যে তিনি তাঁর হুজ্জাত মানুষের নিকট সুষ্ঠু করে দেন। আর তিনি রাজ্য বা শহরে তাদেরকে ক্ষমতা দান করেন যাতে তাদের মাধ্যমে নিজের ওলীদেরকে সাহায্য করতে পারেন এবং কুকর্মকে দমন করতে পারেন ও বিভিন্ন বিষয়কে তাদের মাধ্যমে সংস্কার করতে পারেন। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ সত্যিকার মুমিন। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর নূর।"[৭০৪]

ইসলামী ঐক্য

ইসলামী ঐক্য সম্পর্কে শীআদের আকীদা হলো, যে কোন অবস্থাতে ইসলামী ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখতে হবে। ইসলামের সম্মান, মর্যাদা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করতে নিজের যাবতীয় শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যেতে হবে। এক্ষেত্রে তারা আলী (রা.) কে জ্বলন্ত উদাহরণ

---

৭০৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৭০৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

হিসেবে পেশ করে। তাদের ধারণা ইসলামের প্রথম তিন খলীফা আলী (রা.) এর অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। কেননা, মহানবী (স.) আলী (রা.) কে সর্ব সমক্ষে খলীফা বা ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত আলী (রা:) প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলীফার শাসনামলে বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে সকল ব্যথা বেদনা ভুলে তাদের সহায়তা করেছেন। এটা ছিল ইসলামে বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি ঠিক রাখার এক প্রাণান্তর প্রচেষ্টার অংশ।[৭০৫]

শীআরা বিশ্বাস করে আলী (রা.) তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলীফার শাসনামলে এমন কোন আচরণ করেননি যা খিলাফতকে দুর্বল করতে পারে। বরং তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য ধরে রেখেছিলেন। তাঁর এ অসামান্য অবদানের জন্য উমর ইব্ন ুল খাত্তাব (রা.) বলতেন: ''এমন কোন সমস্যায় পড়িনি যেখানে আবুল হাসান আলী ছিলেন না এবং সমাধান দেননি।'' তিনি আরো বলতেন: ''যদি আলী (রা.) না থাকতো তাহলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।'' ইমাম হাসান (রা.) কে এ ক্ষেত্রে তারা অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। ইমাম হাসান (রা.) মুআবিয়া (রা.) এর সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিলেন। কারণ তিনি যখন দেখলেন, যুদ্ধ অনিবার্য। আর যদি যুদ্ধই হয় তাহলে ইসলামী হুকমত ও বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হবে, ইসলামের মান-মর্যাদা ভুলূণ্ঠিত হবে। তাই যুদ্ধের উপর ইসলামের সুমহান মর্যাদাকে প্রাধান্য দিলেন।[৭০৬]

তবে এক্ষেত্রে ইমাম হোসাইন (রা.) ব্যতিক্রম ছিলেন। কেননা, তৎকালীন উমাইয়া শাসনের অত্যাচার নিপীড়ন এমন এক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, যদি তিনি এর প্রতিবাদ না করেন তাহলে ইসলামের সুমহান আদর্শ চিরতরে ভুলুণ্ঠিত হবে। ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ আরো উজ্জীবিত হয়েছে।[৭০৭]

মুসলমানের উপর অধিকার

শীআরা মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকারকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে থাকে। মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব রক্ষাকে তারা ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্ব আহবান হিসেবে গণ্য করে।

---

৭০৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

৭০৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

৭০৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

এক্ষেত্রে তারা ইমাম জাফর সাদেকের বক্তব্যকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। তিনি বলেন: প্রত্যেক মুসলমান নিজের জন্য পছন্দ করবে সে তার ভাইয়ের জন্যও যেন তা পছন্দ করে।[৭০৮]

এক্ষেত্রে ইমাম জাফর সাদেকের সে ৭টি অমূল্য উপদেশ যা তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো:

''১। তোমরা মুসলমান ভাইয়ের জন্য এমন কিছুকে পছন্দ কর যা নিজের জন্য পছন্দ কর এবং তার জন্য এমন কিছুকে অপছন্দ কর যা নিজের জন্য অপছন্দ কর।

২। তোমরা মুসলমান ভাইকে ক্রোধান্বিত করা থেকে দূরে থাক এবং যাতে সে তুষ্ট হয় তা কর এবং তার নির্দেশের আনুগত্য কর। (অবশ্য যদি অনৈসলামিক না হয়)।

৩। তোমার জান, মাল, কথা ও হস্তপদ দ্বারা তার সাহায্য কর।

৪। দেখার জন্য তার চোখ হও, চলার জন্য পথ নির্দেশক হও এবং তার আয়না হও।

৫। সে যদি অভুক্ত থাকে তবে তুমি উদর পূর্তি করো না, যদি তৃষ্ণার্ত থাকে তুমি তৃষ্ণা নিবারণ করো না, যদি উলঙ্গ থাকে তবে তুমি পোশাকে সজ্জিত হয়ো না।

৬। যদি তোমার খাদেম থাকে এবং তার কোন খাদেম না থাকে, তবে তোমার জন্য ওয়াজিব হলো তার কাছে তোমার খাদেমকে তার পোষাক ধুতে, খাবার রান্না করতে এবং দস্তর মেলতে প্রেরণ করা।

৭। সে যদি কোন শপথ করে থাকে তবে তাকে শপথের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত কর। তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর। তার অসুস্থতার সময় তার সাথে সাক্ষাৎ কর। তার জানাযায় অংশগ্রহণ কর। যদি জান যে তার কোন অভাব আছে তবে তার বলার আগেই তা সমাধানে উদ্যোগী হও এবং দ্রুত তার অভাব পূরণে সচেষ্ট হও।'' [৭০৯]

অতঃপর তিনি বলেন: "যদি এ অধিকারগুলোর রক্ষা কর তবে তার ভালোবাসার রজ্জুকে তোমার ভালোবাসার রজ্জুর সাথে বন্ধন দিলে।"

---

৭০৮. *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ১০০

৭০৯. *প্রাগুপ্ত*, *পৃ.* ১০৪-১০৫

পুণরুত্থান

শীআরা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৃত্যুর পর পুণরুত্থান দিবসে নতুন করে জীবিত করে সৎকর্মশীলদের পুরস্কার আর অসৎকর্মশীলদের শাস্তি প্রদান করবেন। তারা বিশ্বাস করে পবিত্র কুরআনে পুনরুত্থান দিবস, সাওয়াব, পাপ, পুরুষ্কার, শাস্তি, বেহেশত ও এর নিয়ামত, দোযখ ও এর আগুন তথা শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা প্রদান করেছেন। এগুলোর উপর বিশ্বাস করা ফরয।[৭১০] পুনরত্থানে বিশ্বাসের পাশপাশি শীআরা দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে। এ ক্ষেত্রে তারা মনে করে মানুষ কিয়ামত দিবসে জীবিত হবে এবং তার দেহ যা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গলে গিয়েছিল পুনরায় তা সে একই আকৃতিতে ফিরে আসবে। এ সম্পর্কে তারা পবিত্র কুরআনের দলীল প্রদান করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ – بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

"ওহে! মানুষ কি মনে করে যে আমরা কিয়ামত দিবসে তার হাড়গুলো একত্র করবো না ? এ ধারণা ঠিক নয়, বরং আমরা তার আঙুলের অগ্রভাগগুলোকেও আগের মত তৈরি করতে সক্ষম।"[৭১১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

"যদি অস্বীকারকারীদের ধারণায় তুমি আশ্চর্যান্বিত হও, তবে তার চেয়ে আর্শ্চয জনক হলো তাদের বক্তব্য যারা বলে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর পুনরায় কি নতুন ভাবে সৃষ্টি হবে?"[৭১২]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

"ওহে! আমরা কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম ? না, বরং এ অস্বীকারকারীরা নতুন করে সৃষ্টি (পরবর্তী জীবনে) সম্পর্কে সন্দেহ করে।"[৭১৩]

---

৭১০ . আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

৭১১ . আল-কুরআন, ৭৫ : ০৩-০৪

৭১২ . আল-কুরআন, ১৩ : ০৫

৭১৩ . আল-কুরআন, ৫০ : ১৫

পঞ্চম অধ্যায়

কাদিয়ানী মতবাদ : পরিচিতি ও মতাদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাদিয়ানী মতবাদ: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী।[৭১৪] এটি কাদিয়ানী ফিরকা, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, কাদিয়ানী ধর্মমত নামেও পরিচিত। তবে এ মতবাদের যারা অনুসারী তারা নিজেদের 'আহমদিয়া মুসলিম জামাত' নামে পরিচয় দিয়ে থাকে।[৭১৫]

এ মতবাদের প্রবক্তা মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে এক ইংরেজ ভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৭১৬] তার পিতার নাম মির্জা গোলাম মুর্তজা। দাদার নাম আতা বরলাস।[৭১৭] মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবি করেন তার পূর্ব পুরুষগণ সমরখন্দ থেকে পাঞ্জাবে আগমন করেন। তিনি তার বংশ মুঘল বলে উল্লেখ করেন অতঃপর তিনি নিজেকে পারস্য বংশোদ্ভূত বলে অভিহিত করেন। এ মতভেদের উদগাতা তিনি নিজেই। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'এটা সুস্পষ্ট যে, আমার গোত্র মুঘল বংশোদ্ভুত কিন্তু এখন আমার কাছে আল্লাহর কালাম হতে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আমি পারসী বংশোদ্ভুত এবং আমি এতে বিশ্বাসী।' তিনি আরো দাবি করেন যে, আল্লাহ আমাকে আরও অবহিত করেছেন যে, আমার কোন কোন দাদী ফাতেমী ও রাসূল (স.)- এর পরিবারের ছিলেন।[৭১৮]

---

৭১৪. মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮

৭১৫. *প্রাগুক্ত*

৭১৬. শায়খ হাফেজ এহসান এলাহী জহির, অনু. মোহাম্মদ রকীবুদ্দীন হুসাইন, *কাদিয়ানী মতবাদ* (রিয়াদ: ইসলামি গবেষণা ও ফাতওয়া বিষয়ক প্রধান কার্যালয়, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩৮

৭১৭. মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

৭১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

এছাড়া তিনি এ বিষয়ে আরেকটি দাবি করেন যে, ‘‘মুহিউদ্দিন ইব্‌ন্‌ুল আরাবী তাঁর লিখিত পুস্তক ‘ফসুলুল হিকতে আমার সম্পর্ক সংবাদ দিয়ে বলেছেন: শেষ যামানায় একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে আল্লাহর দিকে লোকদের আহবান করবে, তার জন্ম স্থান হবে চীন দেশ এবং তার ভাষা হবে নিজ দেশীয়। আমিই সে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। কেননা, আমি মূলতঃ চীন বংশীয়।’’[৭১৯] সে অন্যত্র বলে: “আমি ফাতেমী। রাসূল (স.) তনয় হযরত ফাতেমার (রা.) বংশধর এবং আমার বংশ হযরত ইসহাকের (আ.) উত্তরসূরী।”[৭২০]

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর পরিবার, তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ ছিল।[৭২১] তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তজা তৎকালীণ ইংরেজ সরকারের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন অনুগত ও কৃতজ্ঞ জমিদার ছিলেন। ইংরেজ সরকারের কল্যাণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী জনতা বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নেন। এক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারকে ৫০টি ঘোড়া ও ৫০ জন সৈনিক পাঠিয়ে সহযোগিতা করেন। অন্য এক যুদ্ধে ১৪ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সহায়তা করে তার আনুগত্যের পরিচয় প্রদান করেন। মির্জা গোলাম মুর্তজার বড় ছেলে মির্জা গোলাম আহমদ ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সেও পিছিয়ে ছিল না। সে সিপাহী জনতা বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।[৭২২]

উপর্যুক্ত তথ্যাবলি মূলত: মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর স্বীকারোক্তি। তিনি নিজেই বলেছেন:“রাজ দরবারে আমার পিতার জন্য একটা আসন সংরক্ষিত ছিল। তিনি ইংরেজ সরকারের খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন। এমনকি তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে সরকারকে উত্তমরূপে সাহায্য করেছিলেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে ৫০ (পঞ্চাশ) জন সৈনিক ও ৫০ (পঞ্চাশ) টি ঘোড়া সরকারকে যোগান দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি তার শক্তির উর্ধ্বে মহান

৭১৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

৭২০. *প্রাগুক্ত*

৭২১. মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮

৭২২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯

সরকারের সেবা করেছেন। কিন্তু এরপর আমার বংশের পতন ও অবনতি আরম্ভ হল। এমনকি আমার পরিবার একটা দরিদ্র কৃষক পরিবারে পরিণত হয়ে যায়।[৭২৩]

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রাথমিক জীবনে ছরফ, নাহু, আরবি, ফারসী ও চিকিৎসা শাস্ত্রের কিতাবাদী অধ্যয়ন করেন। তার পিতা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন। এ সময় তিনি তাও অধ্যয়ন করেন। তিনি উস্তায ফজলে এলাহীর নিকট কুরআন মাজিদ ও ফারসী এবং উস্তায ফজলে আহমদের নিকট ছরফ, নাহু ও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিয়ালকোর্টে চাকুরি জীবনে নৈশ বিদ্যালয়ে ডা. আমীর শাহের নিকট দু'একটি ইংরেজি পুস্তক অধ্যয়ন করেন।[৭২৪] তিনি কয়েকবার মোক্তারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাশ করতে ব্যর্থ হন। মির্জা সাহেবের পড়া লেখা এতটুকুই ছিল।[৭২৫]

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ছোটবেলা থেকেই দুর্বল প্রকৃতির ছিল। সে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এমনকি কারো সাথে কুস্তি প্রতিযোগিতায় পর্যন্ত পাড়েনি। তার সাহস ছিল একেবারে শূন্যের কোঠায়। একবার একটি মুরগীর বাচ্চা জবাই করতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলেন ফলে হাত থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। সে ইস্তিগফার পড়তে থাকে। জীবনে আর কখনও কোন প্রাণী জবাই করেনি।[৭২৬]

তাছাড়া সে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিল। তার ডান হাত ভাঙা ছিল। নামাযের সময় বাম হাতের উপর ভর করে তা আদায় করতে হত। সে যক্ষা, বহুমূত্র, মাথা ঘোরানো, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, স্মরণ শক্তির দুর্বলতা, মাথা ব্যাথা, স্বল্প নিদ্রা, ক্ষুধা, হৃৎপিন্ডের দূর্বলতা, দাস্ত, মুরাক ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এমনকি তিনি নিজেই বলেছেন,' আমি চিররোগী।'[৭২৭] তিনি তার নিজের সম্পর্কে আরো বলেন:

---

৭২৩ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-১৬৮

৭২৪ . *প্রাগুক্ত*

৭২৫ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯

৭২৬ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

৭২৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

“আমি এ সমস্ত রোগের কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছি, এমনকি দাড়িয়ে নামায পড়তে পারি না। কখনও নামায পূর্ণ করার পূর্বেই ভেঙে ফেলি। বর্তমানে এমন হয়ে পড়েছি যে, নামায পড়তে পারি না।” [৭২৮]

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মাসিক ১৫ টাকা বেতনে শিয়ালকোটে চাকুরিতে যোগ দেন।[৭২৯] কিছুদিন চাকুরী করার পর তিনি তা ছেড়ে দেন। এ সময় সে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের বই পুস্তক পড়তে থাকে। সময়টা ছিল এমন যে, হিন্দু ,মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রকাশ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। আর সাধারণ মুসলিম বিতার্কিক আলেমদের খুবই সম্মান করতেন। মির্জা সাহেব বিতার্কিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করে। এ ক্ষেত্রে সে প্রথমে হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে। অতঃপর তাদের বিরুদ্ধে কিছু প্রবন্ধ লিখলেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঘোষণা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করতে থাকে। এতে করে মুসলিম সমাজ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি একটি চিত্তাকর্ষক ঘোষণা দিলেন যে, কাফিরগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করেছে এর জবাব প্রদানের জন্য একটি গ্রন্থ রচনা করছেন- তার ভলিউম সংখ্যা ৫০। গ্রন্থটি ছাপানোর জন্য অগ্রিম মূল্য প্রদান করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। তার এ ঘোষণায় আকৃষ্ট হয়ে বহু সাধারণ মুসলমান তাকে একাজে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তারা তার কাছে প্রচুর টাকা পাঠাতে লাগলেন। এরপর ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সে এর ১ম খন্ড বারাহিনে আহমাদিয়া নামে প্রকাশ করে। এটি ছিল, তার ঘোষণাবলী, প্রচারপত্র, তার কারামত ও কাশফ দ্বারা পরিপূর্ণ। অতঃপর ২য় খণ্ড যা প্রথমটির মতোই ছিল। ১৮৮২ সালে ৩য় খন্ড এবং ১৮৮৪ সালে ৪র্থ খন্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিস্ময়কর হলো যে, কিতাবটির কোন সংখ্যাতেই তার প্রতিশ্রুত কাফির পক্ষের ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ ও আপত্তির জবাব নেই। এতে শুধু তার নিজস্ব কারামত, কাশফ ও ইংরেজ সরকারের প্রশংসায় ভরা। এতে তার বিভিন্ন দাবি ছিল যাতে তার দূরভিসন্ধির পরিচয়

---

৭২৮ . *প্রাগুক্ত*

৭২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

মেলে। শেষ পর্যন্ত ৫ম খন্ডটি প্রকাশ পেল– আর কোন খন্ড নয়। চাঁদা দাতাদের জবাব দিলেন এ ভাবে যে, পাঁচ ও পঞ্চাশের মধ্যে শুধু একটা বিন্দুর পার্থক্য।[৭৩০]

ইংরেজ সরকারের পৃষ্টপোষকতা ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলিম এ দুই জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। এর নেতৃত্ব দেন শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ বিপ্লব সফল হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে। তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এভাবে আর বেশিদিন ভারতবর্ষের লোকদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আরেকটি বিষয় হলো তারা যেহেতু মুসলমানদের হাত থেকে এদেশের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে তাই মুসলমানরা তাদের একদিনের জন্য ও সহ্য করবে না। আর ইতিহাস সাক্ষী ভারত বর্ষের মুসলিম সন্তানেরা ইংরেজ সরকারেরা এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নেয়নি। বীর ফতেহ আলী টিপু, মীর নিসার আলী তিতুমীর, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, পীর দুদু মিয়া, মাওলানা আহমদ, উল্লাহ সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রহ.) প্রমূখ তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। সিপাহী বিপ্লবের পর ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড থেকে একটি প্রতিনিধি দল ভারতবর্ষে আগমন করে। এ প্রতিনিধিদলকে হান্টার কমিশন বলে। তারা ভারতবর্ষে এক বছর অবস্থান করে ভারত বর্ষের মুসলমানদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বৃটিশ সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে তারা বলে:

“ভারতীয় মুসলমানরা কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। মুসলমানদের ধর্মীয় নির্দেশ রয়েছে যে বিজাতীয়দের শাসন মানতে নেই। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনেই বিজাতীয়দের শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ রয়েছে। তাদের ধর্মীয় নেতারা ফাতওয়া জারি করেছে ভারতবর্ষ দারুল হরব বা শত্রুদেশে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে পড়েছে। জিহাদের প্রেরণায় মুসলমানরা উন্মাদের মত আত্মাহুতি দিতে পারে।”[৭৩১]

---

৭৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬-১৮১

৭৩১ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০

উপর্যুক্ত রিপোর্টে কয়েকটি সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের বিপ্লবী ভূমিকা নিস্তেজ হয়ে যাবে। সুপারিশগুলোর মধ্য থেকে ৩টি সুপারিশ নিম্নে পেশ করা হলো:

১। দারিদ্র্যপীড়িত সর্বহারা মুসলমানদের একটি শ্রেণিকে উপঢৌকন ও উপাধি বিতরণের মাধ্যমে বৃটিশের অনুগত করে তুলতে হবে। তারা ভারতবর্ষের দারুল আমান (শান্তির দেশ) বলে ফাতওয়া দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ অপ্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করবে। তারা প্রচার করবে যে দেশে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন বাঁধা নেই, সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ হতে পারে না।

২। এ দেশের মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পীর-মুরিদীর ভক্ত। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্য থেকে আমাদের আস্থাভাজন এমন একজন পন্ডিত ব্যক্তিকে নবীরূপে দাঁড় করাতে হবে, যে বংশ পরম্পরায় আমাদের আস্থাভাজন বলে প্রমাণিত হয়। দারিদ্র্য পীড়িত ধর্মজ্ঞানহীন মুসলমানদের মধ্যে তার নবুওয়্যাত চালিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের সরকার কর্তৃক তাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। অতঃপর তথাকথিত নবী এক সময় ঘোষণা দিবে, ‘‘ আমার নিকট এই মর্মে ওহী এসেছে যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার আল্লাহর রহমত স্বরূপ এবং ওহীর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা এখন থেকে জিহাদ হারাম করে দিয়েছেন। এভাবে মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদের প্রেরণা ও উন্মাদনা দূরীভূত করা সম্ভব হবে। অন্যথায় ভারতে আমাদের শাসন দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হবে না।

৩। (উপযুর্ক্ত নবী) প্রথমে সে নিজেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় বই পুস্তক রচনা করবে। এ কাজে তাকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের ওরিয়েন্টালিস্টরা তাকে উপাদান সংগ্রহ করে দিবে। আমাদের গোয়েন্দা ও প্রচার বিভাগ তার রচিত পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার কাজে সহযোগীতা করবে। এরপর তার প্রতি ভক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সে নিজেকে মোজাদ্দেদ বলে দাবি করবে। এ দাবি মুসলমানদের গলধ:করণ করানোর পর পর্যায়ক্রমে সে নিজেকে মাহদী বলে দাবি করবে। অতঃপর সে মুসলিম উম্মাহর মসীহে মাওউদ হওয়ার দাবি করবে। এক সময় ধীরে ধীরে সে নিজেকে নবী মুহাম্মদের ছায়া (জিল্লী, বুরুজী, উম্মতী নবী)

বলে দাবি করবে।[৭৩২] হান্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তৎকালীন বৃটিশ সরকার নবী দাঁড় করানের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তারা ভারত বর্ষে বৃটিশ সরকারের বংশ পরম্পরা সাহায্যকারীদের মধ্য থেকে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নির্বাচন করে।[৭৩৩]

হান্টার কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তার মিশন পরিচালনা করতে থাকে, সে নিজেকে মুজাদ্দিদ, ঈসা মসিহ, প্রতিশ্রুত মাহদী, ছায়া নবী অতঃপর শরীয়তের অধিকারী পূর্ণ নবী দাবী করে আর ইংরেজ সরকার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে থাকে। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খুবই গৌরবান্বিত ছিল। সে ইংরেজদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছে। সে জিহাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সে সাথে ভারতবর্ষকে দারুল আমান ঘোষণা দেয়। ইংরেজ সরকারের আনুগত্য করা ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ না করার জন্য জনমত গড়ে তোলার নিমিত্তে সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সে ইংরেজ সরকারের পক্ষে পুস্তক রচনা করে এবং বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে প্রচার করে।[৭৩৪]

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইংরেজদের খুবই পছন্দ করতো। এ সম্পর্কে তার নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"বিশ বছরের কম বয়সী একজন ইংরেজ যুবকের আকৃতিতে আমি একজন ফেরেস্তাকে স্বপ্নে দেখেছি। সে একটি চেয়ারের উপর বসে আছে এবং তার সামনে একটি টেবিল রয়েছে। আমি তাকে বললাম তুমি অতি সুন্দর। সে উত্তর দিল হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর ইংরেজ ভাষায় ইলহাম হলো I Love you (আমি তোমাকে ভালবাসি), I with you (আমি তোমার সাথে অছি), I shall help you (আমি তোমায় সাহায্য করব)। এরপর আমার শরীর প্রকম্পিত হল এবং ইংরেজি ভাষায় ইলহাম হল, আমি যা ইচ্ছা করি, তা করতে পারি অনন্তর আমি তার ভাষা ও উচ্চারণ বুঝতে পারলাম যেন একজন ইংরেজ আমাদের মাথার কাছে বসে কথা বলেছেন।"[৭৩৫]

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আরো বলে:

---

৭৩২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০-৩২১

৭৩৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১

৭৩৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২২

৭৩৫ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

“আমি কাশফের মাধ্যমে ভারত সম্রাজ্ঞী মহান রাণীকে দেখতে পেলাম, তিনি আমার ঘরে আগমন করেছেন। মহান রাণী তার পরিপূর্ণ স্নেহ মমতা ও ভালোবাসা দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তখন আমি আমার সঙ্গী সাথীদের একজনকে বললাম যে, মহান রাণী তার পরিপূর্ণ স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাই আমাদের কর্তব্য হল তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।”[৭৩৬]

সে অন্যত্র বলে:“আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া এজন্য আদায় করছি যে, তিনি আমাকে বৃটিশের এমন করুণার ছায়াতলে জায়গা দান করেছেন, যার ছায়াতলে থেকে আমি কাজ করতে পারছি এবং ওয়াজ নসীহতও করতে পারছি। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা ও বিপর্যয় কামনা করে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং ঐ ব্যক্তির উপরও যে নেতার আনুগত্য স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের এবং নেতাদের অনুগত থাক। এখানে উলুল আমর আমার বর্তমান সম্রাটকে বুঝায়। এ জন্য আমি আমার ভক্তবৃন্দ ও অনুসারীগণ কে উপদেশ দিয়ে থাকি তারা যেন ইংরেজকে উলুল আমর এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং অন্তর থেকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত না হয়।”[৭৩৭]

মির্জা বৃটিশদের প্রতি আহবান করে বলে:

“আমি ও আমার পূর্বপুরুষেরা আপনাদের জন্য যে বিরাট খেদমত করেছি তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আমি মহান সরকারের কাছে আরও আশা রাখি যে, সরকার ঐ পরিবারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবত পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সহিত প্রমাণ করেছে যে, এ পরিবার সরকারের প্রতি সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠাবান, মহান সরকারের শাসকবর্গ এ পরিবারের ভালবাসার স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং এ পরিবারের জন্য অঙ্গীকার পত্র ও সনদপত্র দান করেছে যে, এটি একটি সেবক ও নিঃস্বার্থ পরিবার। এজন্য আমি আপনাদের নিকট আশা রাখি যে, আপনারা অধীনস্ত প্রশাসকদেরকে লিখবেন যাতে তারা ঐ বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং এর রক্ষনাবেক্ষণ করে; যা আপনারাই রোপন করেছেন। আরও আশা করি, তারা যেন আমার অনুসারীদের প্রতি বিশেষ স্নেহের দৃষ্টি রাখে। কেননা, অতীতে কখনও আমরা

৭৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২

৭৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

আপনাদের জন্য প্রাণ ও রক্ত উৎসর্গ করতে পিছিয়ে থাকিনি, আর ভবিষ্যতেও পিছিয়ে থাকব না।" [৭৩৮] সে অন্যত্র বলে: "কাদিয়ানীদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত। তাই আমি বৃটিশ সরকারের সেবা করতে এবং আমার উপর অর্পিত কর্তব্য সম্পাদন করতে বাধ্য ছিলাম।"[৭৩৯]

কাদিয়ানীদের পত্রিকা আল ফজলে বলা হয়: "বৃটিশ সরকার আমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ। যার ছত্রছায়ায় আমরা কেবল সম্মুখের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। যদি এ ঢাল সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে আমরা শত্রুর আক্রমণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। সুতরাং আমরা এজন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, বৃটিশের উন্নতি অর্থ আমাদের উন্নতি এবং ওদের ধ্বংস অর্থ আমাদের ধ্বংস।"[৭৪০] জিহাদ বা ধর্মের নামে যুদ্ধ করাকে মির্জা হারাম ঘোষণা করে। সে এ সম্পর্কে বলে: "আমি পরিষ্কার ঘোষণা করেছি, বর্তমান সময়ে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হারাম (নিষিদ্ধ) কারণ ইয়াক সেরোস্ সালীব (ক্রুশ ধ্বংস করা) যেমন মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাজ, তদ্রুপ ইয়াজাউল হার্ব (যুদ্ধ রহিত করা) তাঁহার আর একটি কাজ; এই শেষোক্ত কাজের জন্য জিহাদ হারাম বলিয়া ফতওয়া দেওয়া আমার কাজ ছিল। অতএব আমি বলছি, বর্তমান যুগে ধর্মের নামে অস্ত্র ধারণ করা হারাম এবং ভীষণ পাপ।"[৭৪১]

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মৃত্যু

মির্জার সাথে সমকালীন উলামাদের বাহাস বিতর্ক চলে আসছিল। তার বিরোধীপক্ষে যিনি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। তাঁর এবং মির্জা মধ্যে অনেক বিতর্ক এবং লিখিত ও মৌখিক বাহাছ-মুবাহাছা হয়েছে। এসব বিতর্কে আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীই যুক্তি তর্কে বিজয়ী হিসেবে গণ্য হয়েছেন। ফলে মির্জা তাঁর

---

৭৩৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৭৩৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

৭৪০. *আল ফজল*, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯৫ খ্রি.

৭৪১ . মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, *আহবান* (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ, ২০১২ খ্রি.), ১৭শ পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি খুবই রুষ্ট ছিল। একপর্যায়ে মির্জা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ১৫ এপ্রিল, ১৯০৭ সালে একটি প্রচার পত্র বিলি করে। এর চৌম্বক অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

"যদি আমি মিথ্যাবাদী ও অপবাদকারী হই, যেমন আপনি আপনার ম্যাগাজিনে প্রচার করছেন, তাহলে যেন আপনার জীবদ্দশায়ই আমি ধ্বংস হয়ে যাই। কেননা, আমি জানি যে, কোন মিথ্যাবাদী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বেশি দিন বাঁচে না। বরং সে তার শত্রুর জীবদ্দশায়ই লাঞ্চিত ও অপদস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর, তার মৃত্যুতে আল্লাহর বান্দাগণের উপকার নিহিত রয়েছে। কারণ, সে আর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যদি আমি মিথ্যাবাদী ও অপবাদকারী না হয়ে থাকি এবং আল্লাহর সাথে কথা বলার মর্যাদা লাভ করে থাকি এবং আমি প্রতিশ্রুত মাসীহ হই। তাহলে আমি দোয়া করছি তুমি যেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী অবিশ্বাসীদের পরিণাম হতে মুক্তি লাভ না কর। আমি ঘোষণা করছি, যে শাস্তি শুধু আল্লাহর নিকট থেকে হয় যেমন প্লেগ ও কলেরা, তা দ্বারা যদি তুমি আমার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ না কর তবে আমি আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত নই। এটা আমি ভবিষৎদ্বাণী করছি না, বরং বরকতময় মহান আল্লাহর নিকট থেকে প্রকাশ্য মিমাংসা চেয়েছি। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করছি; হে আমার প্রভু, যিনি সবকিছু দেখেন, মহাশক্তিধর, সর্বজ্ঞানী, যিনি সবকিছুর খবর রাখেন। হে অন্তরের রহস্য জ্ঞাত, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে মিথ্যুক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে থাকি এবং রাতদিন তোমার উপর অপবাদ দিয়ে থাকি। তবে, হে আল্লাহ উস্তাদ ছানাউল্লাহর জীবনেই আমাকে ধ্বংস করে দাও এবং তাকে ও তার জামাতকে আমার মৃত্যুর দ্বারা আনন্দিত কর। আমীন। হে আল্লাহ! আর আমি যদি সত্য হই এবং ছানাউল্লাহ বাতেলপন্থী ও আমার উপর তার আরোপিত অপবাদসমূহে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তবে, তাকে আমার জীবদ্দশায় ঘাতক ব্যধি যেমন প্লেগ, কলেরা ইত্যাদি দ্বারা ধ্বংস করে দিন। আমীন। হে প্রভু! আপনি আমার ও ছানাউল্লাহর মধ্যে ঠিক ফয়সালা করে দিন। আর , যে মিথ্যাবাদী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তাকে সত্যবাদীর জীবিতাবস্থায়ই ধ্বংস করে দিন। অথবা, তাকে মৃত্যু সমতুল্য বিপদে পতিত করুন। হে আমার প্রভু, আপনি এটাই করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।"[৭৪২]

৭৪২ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘোষণার দশদিন পর মির্জা সাহেব পত্রিকায় আরেকটি ঘোষণা দিলেন এ মর্মে যে , ছানাউল্লাহ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তার নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর এ রাত্রিতে এ ঘোষণা ও দোয়া সম্পর্কে তার নিকট এলহাম হয়েছে ' উজিবু দাওয়াত দায়ী' এ এলহামের অর্থ হল এ যে, তার প্রার্থনা গৃহিত হয়েছে।[৭৪৩]

অতঃপর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে কলেরা রোগে চরমভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে মল-মূত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। তারিখটি ছিল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে। উল্লেখ্য, আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী আরো চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। [৭৪৪]

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মৃত্যুর পর কাদিয়ানী সম্প্রদায়

মির্জা সাহেবের মৃত্যুর পর ১৮৪০ সালে কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন হাকীম নূর উদ্দীন।[৭৪৫] কাদিয়ানী বর্ণনা মতে সে প্রথম জীবনে নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী ছিল অতঃপর মির্জা সোহবতে থেকে কাদিয়ানীতে পরিণত হণ। [৭৪৬]

মির্জার মৃত্যুর পর কাদিয়ানীরা তাকে প্রথম নির্বাচিত করে আর সে ঘোষণা করে: "আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি তিনিই আমাকে তার খলীফা নির্ধারিত করেছেন। এমন কে আছে যে খেলাফতের এ চাদর আমার থেকে কেড়ে নিতে পারে ? আল্লাহ তার পছন্দ ও ইচ্ছায় আমাকে তোমাদের ইমাম ও খলীফা নিযুক্ত করতে চেয়েছেন। সুতরাং তোমরা যা ইচ্ছা তা বলতে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে যে সমস্ত অপবাদ দিবে ও নিন্দা করবে তা আমার নিকট পৌঁছবে না বরং পৌঁছবে আল্লাহর নিকট। কেননা, তিনিই আমাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন।"[৭৪৭] তিনি নিজেকে সা ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.)-এর সমতুল্য বলেও ঘোষণা দেন। [৭৪৮]

---

৭৪৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

৭৪৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩

৭৪৫ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩১৮

৭৪৬ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২

৭৪৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩

৭৪৮ . *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৯১৪ লের মার্চ মাসে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর কাদিয়ানীদের মধ্যে নেতা নির্বাচন নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সাধারণ কাদিয়ানীরা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পুত্র মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদকে স্থলাভিষিক্ত করার পক্ষপাতি ছিল। অপর দিকে গোলাম আহমদের বাম হাত মুহাম্মদ আলীও কাদিয়ানী নেতা হওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণ কাদিয়ানীরাই বিজয়ী হয়। নতুন প্রধান হন মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ। সে খলীফা নির্বাচিত হয়ে ঘোষণা দিল যে, সে শুধু কাদিয়ানীদের খলীফা নয়। সে সমগ্র বিশ্বের খলীফা। সে ঘোষণা দিল: "আমি শুধু কাদিয়ানীদের খলীফা নই এবং শুধু ভারতেরও নই, বরং আমি প্রতিশ্রুত মাসীহের খলীফা। তাই, আমি আফগানিস্তান, আরব বিশ্ব, ইরান, চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা,আফ্রিকা, সুমাত্রা, জাভা এমনকি বৃটিশের, খলীফা। বিশ্বের সকল মহাদেশ ব্যাপী আমার আধিপত্য রয়েছে।"[৭৪৯]

লাহোরী কাদিয়ানী

আমীর মুহাম্মদ আলী ছিলেন নূর উদ্দিনের পরেই মির্জার সবচেয়ে কাছের শিষ্য। নূর উদ্দিনের পর সেই কাদিয়ানীদের প্রধান হওয়ার আশাবাদী ছিল। কিন্তু সাধারণ কাদিয়ানীদের দ্বারা মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফা নির্বাচিত হওয়ায় সে দ্বিতীয় প্লাটফর্ম তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের টনক নড়ে। তারা মনে করে ষড়যন্ত্র বুঝি ভেস্তে যায়। তারা আমীর মুহাম্মাদ আলীকে লাহোরে গিয়ে আস্তানা গাড়তে নির্দেশ দেয়। সে সাথে তারা তাকে এ নির্দেশনা দেয় যে, লাহোরী কাদিয়ানীরা যেন গোলাম আহমেদ কাদিয়ানীকে নবী না বলে মুজাদ্দিদ হিসেবে ঘোষণা করে। মুসলমানদের মধ্যে এমন বহু লোক রয়েছে যারা মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোন নবী কোনভাবেই বরদাশত করবে না। তবে মুজাদ্দিদ বললে অনেকেই এ দলে যোগ দিবে। ফলে মুহাম্মদ আলী তার প্রভুদের নির্দেশনা মেনে ঘোষণা করেন: "আমরা মির্জা সাহেবের জন্য নবী শব্দটির ব্যবহার বর্জন করছি। আর যদি কোথাও এ শব্দটি ব্যবহার আমাদের লেখা কিংবা উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে নবী শব্দটিকে আমরা

---

৭৪৯ . *আল ফজল*, ১ নভেম্বর, ১৯৩১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আভিধানিক কিংবা রূপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি।" [৭৫০] সে আরো বলে: "আমরা গায়রে আহমদীদেরকে কাফের বলার পরিবর্তে 'ফাসেক' বলে মনে করি।"[৭৫১] তারা এরূপ অনেক কথা বলতে থাকে। যেমন: "আমরা বিশ্বাস করি না যে, গোলাম আহমদ আল্লাহর নবী ও রাসূল (স.) বরং আমাদের বিশ্বাস তিনি একজন মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক।" [৭৫২] কিন্তু তাদের এ দাবী বাস্তবতা বিরোধী বলেই গণ্য হয়। কেননা আমীর মুহাম্মদ আলী এর আগে যে সকল ঘোষণা দিয়েছে তা পরবর্তী ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই প্রমাণিত হয়। যেমন সে বলেছে:"যদি মুসা আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন এবং ঈসা (আ.) আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন তবে গোলাম আহমদ আল্লাহর নবী ও রাসূল। কেননা, যে সকল নিদর্শনাবলী দ্বারা আমরা আল্লাহর নবীদের পরিচয় পাই। তার সবগুলো গোলাম আহমদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হউক এবং তার উপর সালাত ও সালাম।"[৭৫৩]

মোট কথা, কাদিয়ানী ও লাহোরী কাদিয়ানী মৌলিক দিক দিয়ে একই ছিল। তাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। লাহোরীদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ সরল মুসলমানগণ যখন তাদের নিকট আসবে এবং তাদের মতবাদ গ্রহণ করবে তখন গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কাছাকাছি চলে আসবে এবং এক পর্যায়ে প্রকৃত কাদিয়ানী হয়ে উঠবে।

---

৭৫০. মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪

৭৫১. *প্রাগুক্ত*

৭৫২. এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২

৭৫৩. *প্রাগুক্ত*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ

প্রায় সকল মুসলিম দেশে কাদিয়ানীরা অমুসলিম ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে তারা মুসলিম হিসেবেই পরিচিত। বহু আন্দোলন হলেও এদেশে তারা নিরাপদে আছে এবং আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে অমুসলিম ঘোষণার কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে কাদিয়ানীদের দৃষ্টি বাংলাদেশের উপর নিবদ্ধ রয়েছে এবং এদেশকে তারা তাদের ধর্মমত প্রচারের উৎকৃষ্ট জমিন হিসেবে বেঁছে নিয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পীড়িত ও অশিক্ষিত জন গোষ্ঠীকে তারা তাদের টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করেছে। পুরানো ঢাকার ৪নং বকশি বাজারে তাদের প্রধান কেন্দ্র। ঢাকা শহরে আরো ৬টি কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া সারা দেশে ১২৩ টির মতো কেন্দ্র রয়েছে। দেশের বিভিন্ন শহরে এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তাদের কার্যক্রম নির্বঘ্নে চলছে।[৭৫৪] বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের দাওয়াতী কার্যক্রম বেগবান করার জন্য ৫টি পৃথক পৃথক সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যায়ে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে পেশ করা হল:

১। মজলিসে আনসারুল্লাহ

চল্লিশ বছরের বেশি বয়সীরাই এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। এ সংগঠন সাধারণ মুসলমান, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাদের দাওয়াত প্রচার করে থাকে। এ সংগঠনটি রাষ্ট্রের গুরুত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপত্রসেবীদের আকৃষ্ট করতে বেশি সচেষ্ট।

২। মজলিসে খোদ্দামে আহমদিয়া

পনের বছরের উর্ধ্বে এবং চল্লিশ বছরের নিম্নের বয়সীরাই এ সংগঠনের সদস্য। এ সংগঠন বেকার যুবকদের কাদিয়ানী অফিসারদের মাধ্যমে চাকরি প্রদানের টোপ প্রদান করে। এছাড়া সংগঠনটি বেকারদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রলোভন প্রদান করে থাকে। সংগঠনটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিকট দাওয়াতী প্রচারনা চালায়। সে সাথে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্যের উন্নত রাষ্ট্রে তাদেরকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

৭৫৪ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫

৩। মজলিসে আতফালুল আহমদিয়া

যাদের বয়স ১৫ বছরের কম তারা এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। এ সংগঠনটি সমবয়সী উচ্চবিত্ত সহপাঠীদের নিকট প্রচার পত্র ও শিশু-কিশোর বই বিলি করে থাকে । যেমন, 'এসো ভাল মুসলমান হই' জাতীয় প্রচার পত্র। উচ্চবিত্ত মুসলিম সন্তানেরা যেহেতু ধর্মীয় শিক্ষা তেমন গ্রহণ করে না, ফলে এদের খপ্পরে পড়ে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে তারা তাদের শিকারে পরিণত হয়।

৪। লাজনা এমাইল্লাহ

পনের বছরের বেশী বয়সী মহিলারা এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। এ সংগঠনের সদস্য মহিলারা গ্রামে, গঞ্জে, শহরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রচার পত্র বিলি এবং সুযোগ বুঝে মহিলাদের 'নানাবিদ' লোভ লালসার প্রলোভন দিয়ে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়।

৫। নাসেরাত

পনের বছরের কম বয়সী মেয়েরা এ সংগঠনের সদস্য। এ সংগঠনের সদস্য মেয়েরা তাদের সমবয়সী সহপাঠী বান্ধবীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে।[৭৫৫]

---

৭৫৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাদিয়ানীদের মতাদর্শ

কাদিয়ানী সম্প্রদায় সারা পৃথিবী জুড়েই তাদের মতাদর্শ প্রচার করে যাচ্ছে, বাংলাদেশ তাদের দাওয়াতী কাজের জন্য উর্বর ভূমি বলেই প্রতিয়মান হয় । এ পর্যায়ে তাদের মতাদর্শ পেশ করা হবে।

কালিমা

কাদিয়ানীরা দাবি করে যে, আহমদীয়াত নতুন কোন ধর্মমত নয়। তাদের কালিমা নেই এ কথা সত্য নয়। তাদের কালিমা রয়েছে। তারা ইসলামের অনুসারী। আর একমাত্র ইসলামেরই কালিমা রয়েছে। অন্য কোন ধর্মের কালিমা নেই। এ প্রসঙ্গে কাদিয়ানীদের তৃতীয় খলীফা মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদের ভাষণ প্রণিধানযোগ্য:

"অনভিজ্ঞদের মধ্যে অনেকে মনে করে, আহমদিয়াত একটি নতুন ধর্ম, আহমদীগণ কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে না। কোন কোন লোকের ভ্রান্ত প্রচারণার ফলে অজ্ঞ লোকেরা এ বিশ্বাস পোষণ করে। মনে করে যে, প্রত্যেক ধর্মেরই ''কালেমা'' থাকা চাই। সুতরাং তারা মনে করে যেহেতু আহমদীয়াত একটি ধর্ম, তারও একটি স্বতন্ত্র কালেমা আছে। সত্য কথা এই যে, আহমদিয়াত কোন নতুন ধর্ম নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেরই 'কালেমা' থাকে না। ইসলাম ব্যতীত আর কোনো ধর্মেরই ''কালেমা'' নেই। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ যেমন ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য । ইসলামের নবী যেমন ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইসলামের বিশ্বজনীনতা যেমন একটি বৈশিষ্ট্য তদ্রুপ ইসলামের কলেমাও ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য।"[৭৫৬]

ইসলাম

কাদিয়ানীরা ইসলাম অতীত ধর্ম সমূহের অনুকরণ মনে করে না। তারা মনে করে ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম বৈ কিছু নয়। এটি ধর্ম ব্যবস্থার চরম পরিণতি। এ সম্পর্কে মির্জা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদের বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো:

---

৭৫৬ . মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, *আহমদীয়াতের পয়গাম*, অনু. মৌলভী আব্দুল হাফিজ মরহুম, (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি.), ১১শ স, পৃ. ০৫

"ইসলাম অতীত ধর্মসমূহের অনুকরণ নয়। এটা ধর্ম ব্যবস্থার চরম পরিণতি। আধ্যাত্নিক জগতের সূর্য। এর প্রত্যেকটি অঙ্গ পূর্ববর্তী ধর্ম সমূহে ছিল মনে করা ভুল। নামের দিক দিয়ে হীরা ও কয়লা উভয়ই কার্বন। কিন্তু হীরা কয়লা নয়। সাধারণ পাথর ও মর্মর পাথর উভয়ই পাথর; কিন্তু পাথর মাত্রই মর্মর পাথর নয়। তদ্রুপ যদিও সকল ধর্মই ধর্ম তথাপি ইসলাম ইসলামই; ইসলাম এবং অন্য ধর্ম সমান নয়।" [৭৫৭] ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে সে বলে:

"সার্বজনীনতা ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, নর-নারী, প্রভু-ভৃত্য, শক্তিমান-শক্তিহীন, শাসক-শাসিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, ক্রেতা-বিক্রেতা, দেশি-বিদেশী, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, সাবালক-নাবালক সকলের জন্য ইসলাম সুখ, শান্তি ও উন্নতির বাণী এনেছে। মানব জাতির কোন অংশকেই ইসলাম বঞ্চিত করেনি। নতুন ও পুরাতন সকল জাতিকে ইসলাম পথ প্রদর্শন করে।"[৭৫৮]

মহান আল্লাহ

মহান আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে তিনি (আল্লাহ তা'আলা) কাদীর (সর্বশক্তিমান) কাইউম (চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী) এবং খালেক উল কুল (সর্বস্রষ্টা)। এ সম্পর্কে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "সর্ব প্রথম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের এক কাদীর (সর্ব শক্তিমান), কাইউম (চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী) এবং খালেক-উল-কুল (সর্বস্রষ্টা) খোদা আছেন। যাঁর গুণাবলী অনাদি, অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি কারও পুত্র নহেন এবং কেউ তাঁর পুত্র নহে। দুঃখ, বেদনা, ক্রুশের যন্ত্রণা এবং মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি এরূপ এক সত্তা যে, দূরে থেকেও তিনি কাছে এবং কাছে থেকেও তিনি দূরে। তিনি এক হলেও তাঁর জগতের বিকাশ বিভিন্ন। মানুষ যখন নিজের মধ্যে এক অভিনব পরিবর্তন আনয়ন করে তখন তার জন্য তিনি এক নতুন খোদা হয়ে যান এবং নতুন রূপে তার সঙ্গে ব্যবহার করেন। মানুষ নিজের আত্নার সংশোধনের পরিমাণ অনুসারে খোদা তা'আলার মধ্যে এক পরিবর্তন দেখতে পায়। কিন্তু এমন নহে যে, খোদার

---

৭৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৭

৭৫৮. *প্রাগুক্ত*

মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় বরং তিনি অনাদিকাল হতে অপরিবর্তনীয় এবং পরম ও চরম গুণের অধিকারী।"[৭৫৯]

সে আরো বলে:"সে খোদা অতীব বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকেন। জগৎ তাঁদেরকে ধ্বংস করতে চায় এবং শত্রুগণ দন্তপোষণ করে, কিন্তু খোদা যিনি তাঁদের বন্ধু, তাঁদেরকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে জয়যুক্ত করেন। কি সৌভাগ্যশালী সে ব্যক্তি, যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না। আমরা তার উপর বিশ্বাস এনেছি। আমরা তাঁর পরিচয় পেয়েছি।"[৭৬০]

মির্জা সাহেব খোদার দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন বলে দাবিও করেছেন। সে এ প্রসঙ্গে বলে:
"কত হতভাগারে সে ব্যক্তি, যে আজও জানে না যে তার এরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁকে দর্শন করেছি এবং তাঁকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারী পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এ সম্পদ লাভ করার যোগ্য। এ মণি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হয় তবু এটা করা উচিত।"[৭৬১]

কাদিয়ানীরা একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে থাকে। সে সাথে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলির উপর বিশ্বাস রাখে। এ সম্পর্কে মির্জা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সে বলে:
"আহমদীগণ বিশ্বাস করে যে, এ বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি ওয়াহেদ ও লা শরীক (এক-অদ্বিতীয় এবং অংশবিহীন) অনন্ত শক্তির অধিকারী, বরং বিশ্বপালক প্রভু, রহমান (অযাচিত অসীম দাতা), 'রহীম' (পরম দয়াময়), 'মালিক ইয়াও মিদ্দীন' (বিচার দিবসের

৭৫৯ . মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, *আমাদের শিক্ষা*, অনু. মৌলভী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী , (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), ৪র্থ সং., পৃ. ৫

৭৬০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

৭৬১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

মালিক)। কুরআন শরীফে বর্ণিত যাবতীয় গুণই তাঁর। কুরআন শরীফ তাঁকে যে সকল দোষ হতে মুক্ত বলে সে সকল হতে তিনি মুক্ত।”[৭৬২]

উপর্যুক্ত দলীল প্রমাণগুলো বাংলাদেশের কাদিয়ানীদের প্রকাশনার ভিত্তিতে পেশ করা হলো। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের কাদিয়ানীরা লাহোরী কাদিয়ানী। যারা কৌশলগত দিক থেকে কিছুটা উদারতা অবলম্বন করে থাকে। এ পর্যায়ে আল্লাহ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আকীদা নিম্নে পেশ করা হলো। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলে: “আল্লাহ বলেছেন, আমি রাসূলের পক্ষ হতে উত্তর দেই, আমি ভুলও করি এবং সঠিকও করি। আমি রাসূলকে বেষ্টন করে রেখেছি।” [৭৬৩] সে আরও বলে: “আমি কাশফের দ্বারা দেখছি যে, আমি অনেকগুলো কাগজ আল্লাহ তা'আলার কাছে পেশ করছি উহাতে স্বাক্ষর করার জন্য এবং আমি যে সকল দাবি করেছি তা অনুমোদনের জন্য। অনন্তর, আমি দেখতে পেলাম তিনি তাতে লাল কালি দ্বারা স্বাক্ষর করেছেন। কাশফের সময় আমার কাছে আব্দুল্লাহ নামে আমার একজন ভক্ত উপস্থিত ছিল। অতঃপর আল্লাহ কলম ঝাড়লেন। এতে লাল কালির ফোটা আমার কাপড়ে ও আমার ভক্ত আব্দুল্লাহর কাপড়ে পড়ল। কাশফ যখন শেষ হল তখন বাস্তবে দেখতে পেলাম আমার ও আব্দুল্লাহর কাপড় সে লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। অথচ আমাদের নিকট কোন লাল রঙ ছিল না। এখন পর্যন্ত এ কাপড়গুলো আমার মুরীদ আব্দুল্লাহর নিকট মওজুদ আছে।”[৭৬৪]

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল্লাহ তা'আলার আকৃতির বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে অক্টোপাসের সাথে তুলনা করেছেন। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য হলো: “আল্লাহর অস্তিত্বের প্রকৃতিকে আমরা এরূপ ধরে নিতে পারি যে, তাঁর অনেকগুলো হাত পা আছে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অগণিত ও অসংখ্য। আর, তা এতবড় যে, তার দৈর্ঘ্য প্রস্থের কোন সীমা নেই। তিনি অক্টোপাস সদৃশ। তার অনেক শীরা রয়েছে, যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রসারিত।”[৭৬৫]

---

৭৬২ . মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, অনু. মৌলভী আব্দুল হাফিজ মরহুম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৮

৭৬৩. এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৭৬৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৭৬৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-১৩৪

কাদিয়ানীরা এও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী সহবাস করেন (নাউযুবিল্লাহ) এবং তাঁর সন্তানাদি হয়ে থাকে। তারা এও মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা গোলাম আহমদের সাথে সহবাস করেছেন। এ প্রসঙ্গে কাজী ইয়ার মুহাম্মদ কাদিয়ানীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "মসীহে মাওউদ (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) এক সময় তার নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি নিজেকে স্বপ্নে দেখেন, তিনি যেন একজন মহিলা, আর আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে নিজের পুরুষত্ব শক্তি প্রকাশ করলেন।"[৭৬৬] এ প্রসঙ্গে মির্যার দাবি হলো: "আমার মধ্যে ঈসার রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে, যেমন মরিয়ামের মধ্যে ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। রূপকভাবে আমি গর্ভধারণ করলাম। কয়েক মাস যা দশ মাসের উর্ধ্বে নহে মরিয়ম হতে পরিবর্তিত হয়ে ঈসা হয়ে গেলাম। এ পদ্ধতিতে আমি মরিয়ম পুত্র হয়ে গেলাম।"[৭৬৭] সে আরো বলে: "আল্লাহ তা'আলা আমাকে মরিয়ম নামে নামকরণ করেছেন, যে মরিয়ম ঈসাকে গর্ভধারণ করেছিলেন। সুরাহ তাহরীমের মধ্যে আল্লাহর এ বাণীতে আমিই উদ্দেশ্য, ইমরানের কন্যা মরিয়ম যিনি তার সতীত্ব রক্ষা করেছেন। অতঃপর আমি তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম। অবশ্যই আমি সে একমাত্র ব্যক্তি যে দাবি করছে আমিই মরিয়ম এবং আমার মধ্যেই ঈসার রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে।"[৭৬৮]

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এসব দাবির প্রেক্ষিতে কাদিয়ানীরা তাকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। এমনকি তারা তাকে মহান আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করে থাকে। কেননা, মির্যা বলে: "আল্লাহ আমাকে বলেছেন, তোমার সৃষ্টি আমার পানি থেকে এবং ওদের সৃষ্টি কাপুরুষত্ব থেকে।"[৭৬৯] সে অন্যত্র বলেছে : ''আল্লাহ আমাকে এ বলে সম্বোধন করেছেন, শুন হে আমার ছেলে।"[৭৭০] সে আরোও বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বলেছে : "তুমি

---

৭৬৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

৭৬৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

৭৬৮ . *প্রাগুক্ত*

৭৬৯ . *প্রাগুক্ত*

৭৭০ . *প্রাগুক্ত*

আমা হতে এবং আমি তোমা থেকে, তোমার প্রকাশ মানেই আমার প্রকাশ।"[৭৭১] সে আরো বলে : "আল্লাহ তা'আলা আমার মধ্যে অবতরণ করেছেন এবং তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আমি হলাম মাধ্যম।"[৭৭২] সে দাবি করে যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন সে বলেঃ "আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এমন একটি পুত্রের, যে হবে সত্য ও উচ্চ মর্যাদার প্রতীক, যেন আল্লাহ আকাশ হতে অবতরণ করেছেন।"[৭৭৩]

মহানবী (স.)

কাদিয়ানীরা মহানবীকে (স.) সর্বশেষ রাসূল (স.) হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে তাঁর নবুওয়্যাত ততদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন পৃথিবীতে একজন মানুষও জীবিত থাকবে। এ প্রসঙ্গে মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সে বলেঃ

"আহমদীদের বিশ্বাস এই যে, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব কুরায়শী মক্কী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল (স.) ছিলেন। তাঁর প্রতি শেষ শরীয়ত কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছিল, আরবের লোক, আরবের বাইরের লোক সাদা-কালো প্রত্যেক জাতির জন্যই আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নবুওয়্যাত ততদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন ভূ-পৃষ্ঠে একজন মানুষও বাস করে। তার অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। তাঁর দাবি জ্ঞান গোচরে আসার পরও যে ব্যক্তি তাঁকে অনুসরন করবে না, আল্লাহর বিচারে সে শাস্তি পাবার উপযুক্ত। তাঁর দাবির প্রমাণ যে ব্যেক্তির কাছে পৌছেছে তাঁর অনুসরন ব্যতিত সে ব্যক্তির পরিত্রান ও সাফল্যের জন্য আর কোন পথ নেই। তাঁকে অনুসরণ করাই পবিত্রতা অর্জনের একমাত্র পথ।"[৭৭৪]

মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর একটি ভাষ্য নিম্নে পেশ করা হলো। সে বলেঃ

---

৭৭১. *প্রাগুক্ত*

৭৭২. *প্রাগুক্ত*

৭৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৭৭৪. মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৮

"প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে? সে যে বিশ্বাস করে আল্লাহ সত্য এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তার সম মর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রাসূল নেই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কোন মানবকেই খোদা তায়াআলা চিরকাল জীবিত রাখতে ইচ্ছা করেননি। কিন্তু তাঁর এ মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখার জন্য তাঁর শরীয়ত বিধান এবং রূহানিয়্যাতকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণকামী করেছেন, যার আগমন ইসলামের প্রাসাদটিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল। কারণ, ইহজগতের সময় সীমা অবসান হওয়ার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ধর্মে একজন আধ্যাত্মিক মাসীহ্‌র আবির্ভাব হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল, যেমন ইতোপূর্বে হযরত মূসা (আ.) এর ধর্মে আবির্ভূত হয়েছিলেন ।" [৭৭৫]

রাসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে সে আরো বলেঃ "ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে খোদা তা'আলা তোমাদের নিকট এটাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁর নবী খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। তিনি সকল নবী হতে শ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে তাঁর প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসে, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হতে শাখা আপন কান্ড হতে কখনো পৃথক নহে।"[৭৭৬]

মির্যা এমন কিছু দাবি করেছে এর আগে কোন নবুওয়্যাতের দাবিদার তা করেননি। সে মহানবী (স.)-এর চেয়েও বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকবে এমন দাবিই সে করেছে। যেমন সে বলেছেঃ "নবী করিম (স.) এর তিন হাজার মুজিযা ছিল, কিন্তু আমার মুজিযা সমূহ এক মিলিয়নেরও অধিক।"[৭৭৭] অন্যত্র সে বলেছেঃ ''নবী করিম (স.) এর জন্য কেবল চন্দ্র গ্রহণ হয়েছিল, সে স্থলে আমার জন্য চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের মধ্যে গ্রহণ লেগেছিল।''[৭৭৮] মির্যা মনে করে ইসলাম প্রাথমিক যুগে নব চন্দ্রের মত ছিল। আর এখন অর্থাৎ তার মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণ চন্দ্র হিসেবে আবিভূর্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলোঃ

---

৭৭৫. মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৯

৭৭৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৭৭৭ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

৭৭৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

‘‘নিশ্চয়ই ইসলাম প্রথম দিকে নবচন্দ্রের মত ছিল, অর্থাৎ একেবারে ছোট, অতঃপর নির্ধারিত হল যে, এ যুগে তাহা পূর্ণ চন্দ্রে রূপান্তরিত হবে। এদিকটাই মহান আল্লাহ তা‘আলা ইঙ্গিত করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বদর বা পূর্ণচন্দ্র দ্বারা সাহায্য করেছেন।’’[৭৭৯] মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জনৈক শিষ্য আল ফজল পত্রিকায় তার শান ও মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে লিখেছে:

‘‘আমাদের বিশ্বাস যে, গোলাম আহমদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এত নিদর্শনাবলী এবং প্রমাণাদি অবতীর্ণ করেছে যদি তা এক হাজার নবীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে তাদের নবুওয়্যাত প্রমাণিত হওয়ার জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে এবং সকল নবীর মধ্যে যে সমস্ত পবিত্র গুণাবলী ছিল, তার সবটাই গোলাম আহমদের মধ্যে সন্নিবেশন করা হয়েছে।” [৭৮০] মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এক পর্যায়ে মহানবী (স.)-এর সমমর্যাদা দাবি করতে থাকে। সে বলে: ‘‘যে ব্যক্তি আমার এবং মুস্তফার মধ্যে পার্থক্য করে, সে আমাকে চিনেনি ও আমাকে দেখেনি।’’[৭৮১] একপর্যায়ে আরো অগ্রসর হয়ে বলে: ‘‘আমি মসীহ; আমি কালিমুল্লাহ, আমি মুহাম্মদ ও আহমাদ, যাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন।” [৭৮২] সে আরো বলে:‘‘যে আমার জামাতে প্রবেশ করবে সে যেন সাইয়েদুল মুরছালীনের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল” [৭৮৩] একপর্যায়ে মির্জা মহানবী (স.)-এর দাবি করে বসে। যেমন সে বলে: ‘‘আল্লাহর বাণী, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তাঁর সাথীরা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং তারা পরস্পর অতি দয়ালু। এর দ্বারা আমিই উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা‘আলা এ ওহীতে আমার নাম রেখেছেন মুহাম্মদ ও রাসূল। এভাবে অপর কয়েক স্থানে আল্লাহ আমাকে এ নামে উল্লেখ করেছেন।[৭৮৪] সে আরো দাবি করে বলে: ‘‘আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসে আমার সম্পর্কে খবরাখবর বিদ্যমান আছে। আমাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে আল্লাহর এ

---

৭৭৯ . *প্রাগুক্ত*

৭৮০ . *আল ফজল*, ১৬ অক্টোবর, ১৯১৭ খ্রি.

৭৮১ . *আল ফজল*, ১৭ জুন, ১৯১৫ খ্রি.

৭৮২ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৭৮৩ . *প্রাগুক্ত*

৭৮৪ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

বাণীতে, আল্লাহ ও সত্যদ্বীন সহকারে স্বীয় রাসূলকে প্রেরণ করেছেন যাতে এ দ্বীনকে সমূদয় দ্বীনের উপর প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতেও আমাকে লক্ষ্য করা হয়েছে, 'আমি আপনাকে সমস্ত বিশ্ব জগতের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[৭৮৫]

মির্জা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহানবী (স.)-এর নামকে তার পিতার নাম বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। সে বলেঃ

''রাসূলগণ যার সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি হলেন গোলাম আহমদ, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স.) নহেন। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে তিনিই উদ্দেশ্য। ঈসা সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, আমার পরে যে রাসূল (স.) আসবেন তার নাম আহমদ। কেননা, আল্লাহর নবীর নাম ছিল মুহাম্মদ, আহমদ নহে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য হল মুহাম্মদ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি। অতএব, বুঝা গেল যে, এ বাণীর উদ্দেশ্য গোলাম আহমদ, মুহাম্মদ নহেন।"[৭৮৬]

মির্জা বশীরুদ্দিন গোলাম আহমদকেই মহানবী (স.)-এর নব আবির্ভাব মনে করে। সে বলে:''গোলাম আহমদের শাহাদাতের জন্য আমরা আমাদের ধর্মে কোন নতুন কালেমার প্রয়োজন বোধ করি না। কেননা, নবী এবং গোলাম আহমদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, যেমন গোলাম আহমদ নিজেই বলেছে, আমার অন্তর্ভুক্ত তাঁরই অস্তিত্ব এবং যে ব্যক্তি আমার ও মুস্তফার মধ্যে পার্থক্য করে সে আমাকে চিনতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় খাতামুন নাবিয়্যীনকে প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় মসীহে মাওউদ (গোলাম আহমদ) স্বয়ং সে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, যাকে ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বারের মত প্রেরণ করা হয়েছে। এ জন্যই আমরা অপর কোন কালেমায়ে শাহাদাতের প্রয়োজনবোধ করি না। অবশ্য যদি প্রেরিত ব্যক্তি মুহাম্মদ ব্যতীত অন্য কেহ হত তাহলে আমাদের নতুন কালেমার প্রয়োজন হত।"[৭৮৭]

---

৭৮৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

৭৮৬ . *আল ফজল*, ১৯ আগস্ট, ১৯১৬ খ্রি.

৭৮৭ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কবর স্থান রাসূলুল্লাহ (স.) এর কবর স্থানের মতোই। তারা এও বিশ্বাস করে যে, মহানবী (স.) তার কবরে সালাম প্রদান করেন। তাদের আরেকটি বিশ্বাস হচ্ছে, কাদিয়ানীর কবর যিয়ারত করা মানে হজ্ব আকবর পালন করা।[৭৮৮]

খতমে নবুওয়্যাত

কাদিয়ানীরা খতমে নবুওয়্যাত তথা নবুওয়্যাতের পরিসমাপ্তিতে বিশ্বাস রাখে না। পবিত্র কুরআনের সূরাহ আহযাবের ৪১ নম্বর আয়াতের তারা এমন ব্যাখ্যা করে যা ইতোপূর্বে কোন তাফসিরকারক করেননি। তারা খাতামুন নাবীঈন এর অভিনব ও বিস্ময়কর অর্থ গ্রহণ করে থাকে। তারা এও দাবি করে যে, তারা মহানবী (স.) কে 'খাতামুন নাবীঈন' বলে বিশ্বাস করে, এর অর্থ সম্পর্কে তারা ৩টি ব্যাখ্যা পেশ করে। তা হলোঃ

''(ক) নবুওয়্যাত ও শরীয়তের কামালিয়াতের (পূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষতা) দিক হতে তিনি অবশ্যই শেষ নবী।

(খ) তাঁর পরে কেবল তাঁর উম্মতের মধ্য হতে তাঁকে পায়রবী (পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ) করে তাঁর আরাধ্য কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য তাঁরই রূহানী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কেউ উম্মতি নবী-রাসূল হবার মোকামও লাভ করতে পারে।

(গ) হযরত রাসূলে করীম (স.) এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত অন্য কোন ধর্মের পুরাতন বা নতুন তথা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী এবং শরীয়ত আগমনের বিশ্বাস কুফরীর শামিল।'' [৭৮৯]

কাদিয়ানীরা খাতামুন নাবীয়্যীন এর অভিনব অর্থ গ্রহণ করে থাকে। তারা বলে খাতাম অর্থ শেষ নয়, এর অর্থ হচ্ছে মোহর। খাতামুল আম্বিয়া অর্থ নবুওয়াতের মোহর। অর্থাৎ মহানবী (স.) অন্যান্য নবীদের সত্যায়নকারী এ হিসেবে তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন।[৭৯০] কাদিয়ানীরা খাতাম শব্দের আরেকটি অর্থ গ্রহণ করে থাকে তাহলো শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ।[৭৯১] এ অর্থের দিকে

---

৭৮৮ . *প্রাগুক্ত*

৭৮৯ . মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, অনু. মৌলভী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৭৯০ . শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, *উম্মতি নবী* (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), ৫ম সং. পৃ. ১৬

৭৯১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

লক্ষ্য করে তারা মহানবী (স.) কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা আজগুবি কিছু দলীল দেওয়ার চেষ্টা করে।

কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে, মুহাম্মদ (স.) তাশরিয়ী বা শরীয়তওয়ালা নবীগণের শেষ এবং গায়রে তাশরিয়ী বা শরীয়ত বিহীন স্বতন্ত্র নবীগণেরও শেষ।[৭৯২] তারা বিশ্বাস করে মহানবী (স.)-এর মাধ্যমে এ দু'প্রকার নবীর আগমন ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে নবুওয়াতের অন্যান্য ধারা অব্যাহত আছে। এর মধ্যে একটি হলো উম্মতিনবী। মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী হচ্ছেন উম্মতি নবী। আর মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যেহেতু মুহাম্মদ (স.)-এর শরীয়তের পূর্ণ ও প্রচারকারী। সে হিসেবে তিনি গায়রে তাশরিয়ী এবং উম্মতি নবী।[৭৯৩] কাদিয়ানীরা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে আরেক প্রকার নবী হিসেবে গ্রহণ করে থাকে তাহলো বুরুজী নবী। এ সম্পর্কে কাদিয়ানী মোবাল্লেগ শাহ মুস্তাফিজুর রহমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সে বলে:

''আঁ হযরত (স.)-এর পরে যে ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবি করবেন। তাঁর জন্য শর্ত এটাই যে, তাঁকে আঁ হযরত (স.) এর পূর্ণ আনুগত্যকারী উম্মাত হতে হবে। অন্যথায় হবে না। নবুওয়্যাতে মুহাম্মদীয়ার ভিতরে অবস্থান করেই তাঁকে নবী হতে হবে। এছাড়া নবী হওয়ার বাকী সকল দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য কথায় 'ফানা ফির রাসূল' এর পথ ছাড়া নবুওয়্যাত লাভের আর কোনও পথ নেই। এ মোকামে সম্পূর্ণরূপে ফানা বা বিলীন হয়ে যাওয়া ব্যক্তির সত্তা সে মুহাম্মদীয়াতের পূর্ণ ছাপ অঙ্কিত হবে এবং সে ব্যক্তি 'মুহাম্মদী' সভায় পূর্ণ প্রতিবিম্ব হবেন, এবং তখন তিনি প্রতিবিম্বাকারে নবী হবেন। এ অবস্থাকেই বলে যিল্লী বা বুরুজী।''[৭৯৪]

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী খতমে নবুওয়্যাত সম্পর্কে অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশ করতঃ বুরুজী ও যিল্লী নবী দাবি করেছে। একপর্যায়ে সে পূর্ণ শরীয়তধারী নবীও দাবি করেছে। বাংলাদেশের কাদিয়ানীরা লাহোরী কাদিয়ানী হিসেবে পরিগণিত। তারা তাঁর নবুওয়্যাতটাকে

---

৭৯২. *প্রাগুক্ত*, ১৬

৭৯৩. *প্রাগুক্ত*

৭৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

যথা সম্ভব রাখ ঢাক করে তাদের ধর্মমত প্রচার প্রচারণা করতে কুশলী ভূমিকা পালন করে থাকে। এরপরও তাদের প্রচার পত্রে নবুওয়্যাত বিষয়টি চলে আসে। বাংলাদেশী কাদিয়ানীদের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উম্মতি নবী উল্লেখযোগ্য। তা থেকে মির্জার জবানীতে নবুওয়্যাত বিষয়ক কিছু বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হলোঃ আমি বার বার জোরের সাথে বলেছি যে, আমার প্রতি যে সমস্ত ওহী ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে সে সবই নিশ্চিত রূপেই খোদার কালাম ঠিক সেভাবে, যেভাবে পবিত্র কুরআন ও তাওরাত খোদার কালাম। এবং প্রতিবিম্বের আকারে আমি একজন খোদার নবী ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমান আমাকে মানতে বাধ্য এবং মসীহে মাওউদ হিসেবে মানতেও বাধ্য। খোদা আমার সমর্থনে দশ সহস্রাধিক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। কুরআন আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছে। রাসূলে পাক (স.) আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছেন।""আমার পক্ষে যমীনও সাক্ষ্য দান করেছে এবং আসমানও। একইভাবে আসমানও বলেছে এবং যমীনও বলেছে যে, আমি খলীফাতুল্লাহ।"

"এবং যে যে স্থানে আমি নবুওয়্যাত ও রেসালাত সম্পর্কে অস্বীকার জ্ঞাপন করেছি। তা শুধু এ অর্থে করেছি যে, না আমি স্বতন্ত্র কোন শরীয়তবাহী নবী এবং না আমি স্বীয় অধিকারে কোন নবী। বরং তা এ যে, আমি আমার রাসূলে মুক্তেদা (স.) থেকে বাতেনী ফয়েয বা গুপ্ত কল্যাণরাজি হাসিল করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে তাঁরই মাধ্যমে আমি খোদার কাছে থেকে গায়েবের জ্ঞান লাভ করেছি। তাই আমি রাসূল ও নবী। কিন্তু আমার কোন নতুন শরীয়ত নেই।"

"হ্যাঁ একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এবং তা কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রাসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদা তা'আলার তরফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাঁর এ সকল আশিষ ও কল্যাণ আমার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়নি বরং আসমানে এক পবিত্র অস্তিত্ব আছেন যাঁর রূহানী ফয়েয বা আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের। তার উসিলা ও মধ্যস্থতা অক্ষুন্ন রেখে এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত হয়ে আমি রাসূলও হয়েছি, অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছি এবং খোদার কাছ থেকে অদৃশ্যের বা গায়েবের সংবাদ

লাভকারীও হয়েছি। এবং এর দরুন খাতামুননাবীঈনের মোহর অক্ষুন্ন রয়েছে। কেননা, আমি প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বরূপে প্রেমের আয়নার মধ্য দিয়ে ঐ নাম লাভ করেছি।"

''বুরুজী (প্রতিবিম্ব) আকারে অমাকে নবী ও রসূল করা হয়েছে। এবং এভাবে খোদা বার বার আমার নাম নবীউল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ রেখেছেন, কিন্তু বুরুজী আকারে। এর মধ্যে আমার নফস বা সত্তা নেই, আছেন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এ কারণে আমার নাম মুহাম্মদ এবং আহমদ হয়েছে।"

''আমি যদি মুহাম্মদ (স.) এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসারী না হতাম অথচ আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন যদি দুনিয়ার সমস্ত পর্বতের সমানও হতো, তথা আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ কিংবা তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না। কেননা, এখন কোনও শরীয়তবাহী নবী আসতে পারে না। কিন্তু শরীয়ত ছাড়া কোন নবী আসতে পারবেন, অবশ্য তিনি যদি রাসূল (স.) এর অনুসারী হন। এভাবে আমি একই সাথে একজন উম্মতও একজন নবীও। আমার নবুওয়্যাত হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুওয়্যাতের প্রতিবিম্ব। তাঁর নবুওয়্যাত বাদ দিলে আমার নবুওয়্যাতের অস্তিত্ব নেই। এতো সে মুহাম্মদী নবুওয়্যাত যা আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।"[৭৯৫]

ঈসা (আ.) সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। সে সাথে তারা মনে করে ঈসা (আ.) নিজে নতুন কোন ধর্ম বিধান নিয়ে আসেননি বরং তিনি তাওরাত পূর্ণ করতে এসেছিলেন। [৭৯৬] তারা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেননি, তিনি কাশ্মীরে চলে এসেছিলেন এবং এখানেই স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[৭৯৭] ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু হয়েছে এ বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

---

৭৯৫. শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, *উম্মতি নবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

৭৯৬. মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, *আহবান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; ৩০

৭৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

''হে ঈসা ! নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং তোমাকে উন্নীত করব আমার দিকে।''[৭৯৮]

এ ছাড়া তারা আরেকটি আয়াত এ ক্ষেত্রে পেশ করে থাকে, তাহলো:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

''মুহাম্মদ (স.) রাসূল বটে। তাঁর পূর্বেকার রাসূলগণ গত হয়েছেন। অতএব তিনি (রাসূল স.) মৃত্যুবরণ করলে বা শহীদ হয়ে গেলে তোমরা কি পিছনের দিকে এবং অধঃপতনের দিকে ফিরে যাবে।''[৭৯৯]

কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা (আ.) আবার পৃথিবীতে আগমন করবেন না। আকাশ থেকে তিনি অবতরণ করবেন না এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন না। এ প্রসঙ্গে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তব্য নিম্নরূপ:

''স্মরণ রেখো, কেউ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তারা সবাই মরবে, কিন্তু তাদের কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) কে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও মরবে। কিন্তু তাদের কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে (আ.) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবেন না, অতঃপর তাদের সন্তানদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না।[৮০০] মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেকে প্রতিশ্রুত ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম দাবি করে। সে দাবি করে সেই মরিয়ম সে ঈসা। এ সম্পর্কে সে বলে:

''আমাকে মরিয়ম বানানো হয়েছে এবং দু'বৎসরকাল আমি মরিয়ম রয়েছি অতঃপর আমার মধ্যে ঈসার রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়েছে, যেমন মরিয়মের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, আমি গর্ভ ধারণ করি। অনূর্ধ দশমাস পর আমি মরিয়ম হতে ঈসা হয়ে যাই। এভাবে আমি মরিয়মের পুত্র হই।" [৮০১] এ সম্পর্কে সে আরো ভয়ংকর তথ্য প্রদান করে বলে: ''আমি স্বপ্নে

---

৭৯৮ . আল-কুরআন, ৩ : ৫৬

৭৯৯. আল-কুরআন, ০৩ : ১৪৪

৮০০.শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, *ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন* (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.), ১১শ পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ০৪

৮০১ . এহসান এলাহী জহীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

আমাকে দেখেছি যেন আমি একজন মহিলা এবং আল্লাহ তা'আলা আমার মধ্যে তাঁর পুরুষত্ব প্রকাশ করছেন।"[৮০২] (নাউযুবিল্লাহ)

কাদিয়ানীরা প্রতিশ্রুত ঈসা বিন মরিয়ম বলতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকেই বিশ্বাস করে। তারা মনে করে ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়নি এবং তিনি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.) মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যগুলোর তারা অদ্ভুত ও আজগুবি ব্যাখ্যা করে থাকে।

৮০২. *প্রাগুক্ত*

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাহাই ধর্মমত: পরিচিতি ও মতাদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাহাই পরিচিতি

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর পারস্যের সিরাজ নগরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আলী মুহাম্মদ নামে এক শিশু জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) -এর বংশধর ছিলেন। আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যাওয়ার পর মামা মির্জা সৈয়দ আলীর তত্ত্বাবধানে তিনি প্রতিপালিত হন।[৮০৩] আলী মুহাম্মদের উপাধী ছিল বাব। তাঁর অনুসারীদের বাবী সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা হয়। আর তাঁর ধর্মীয় আন্দোলনকে বাবইজম নামে পরিচিত।[৮০৪]

আলী মুহাম্মদ ছিলেন সৈয়দ কাজিম-ই-রশাত কর্তৃক ভবিষদ্বানীকৃত মহান মনীষী। সৈয়দ কাজিম তাঁর শিষ্যদের প্রায়ই বলতেন: ''সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এখন পৃথিবীতেই আছেন এবং সেই হেতু তাদেরকে কঠোর প্রার্থনা করতে হবে এবং তাকে খুঁজে বের করার জন্য সাগ্রহে ও আন্তরিক ভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি তাদের একথাও বললেন যে, যখন তিনি মারা যাবেন, তখন ক্বাইম তাঁর ধর্ম প্রকাশ করবেন। ক্বাইম অথবা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের নিদর্শন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তিনি পয়গম্বর মুহাম্মদের একজন বংশধর। তিনি যুবক এবং মধ্যম উচ্চতা বিশিষ্ট, তাঁর জ্ঞান হবে সহজাত ও দৈব বা ঐশ্বরিক, অর্জিত নয়। তিনি হবেন নিখুঁত শরীরের অধিকারী এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার থেকে মুক্ত।''[৮০৫]

উপযুর্ক্ত প্রতিশ্রুত মহান পুরুষ ছিলেন মির্জা সৈয়দ আলী মুহাম্মদ ওরফে বাব। বাহাই ধর্মের বীজ তিনিই বপন করেছিলেন। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে মির্জা সৈয়দ আলী মুহাম্মদ ঘোষণা করেন যে, সকল ঐশী ধর্মগ্রন্থ প্রতিশ্রুত মহামানব অতি সত্বর পৃথিবীতে আগমন করবেন।

---

৮০৩ . মাজগান শামসী বাহার, *মহানবাব*, অনু. শেখ শহীদ উদ্দিন, (ঢাকা: বাংলাদেশের বাহাই জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ০৮

৮০৪ . শানজিদ আবি, *ধর্মকোষ* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১১

৮০৫ . মাজগান শামসী বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৫

তিনি সকল আত্মাকে সঞ্জীবিত ও আলোকিত করে তাদের চরিত্রকে পূনগর্ঠিত করবেন এবং সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।[৮০৬] বাব তাঁর ধর্ম প্রচার করার পর থেকে শাসকশ্রেণির কোপানলে পড়েন এবং কারাগার হয়ে উঠে তার আবাসস্থল। মাহকু দুর্গে তার কারাবাসকালে তিনি বহু সংখ্যক ফলক লিপি ও পত্র লিখেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বয়ান। এটি আরবি ও ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত হয়। বয়ান গ্রন্থে বাব তাঁর উত্তরসূরী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন: ‘‘যদি তোমরা তাঁর প্রত্যাদেশ লাভ কর এবং তাঁকে মান্য কর, তাহলে তোমরা বয়ান গ্রন্থের ফল প্রকাশ করবে, আর যদি তা না কর, তাহলে ঈশ্বরের কাছে তোমাদের নাম উল্লেখের অযোগ্য।” [৮০৭] তিনি আরোও বলেন: ‘‘নবম বছরে তোমরা সর্বমঙ্গল লাভ করবে। নবম বছরে তোমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি লাভ করবে। তিনি এই মূহুর্তে আবির্ভূত হলে, তাঁকে ভক্তি করার আমিই হব প্রথম ব্যক্তি এবং তাঁর সম্মুখে অবনত হওয়ায় আমিই হব প্রথম ব্যক্তি।”[৮০৮]

বাবীবাদ আন্দোলন পারস্যের সিরাজে শুরু হয়েছিল, পরবর্তীতে তা অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৫ সালে এ আন্দোলনের উপর সরকারি দমন পীড়ন নেমে আসে। মির্জা আলী মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা পদে পদে নিপীড়নের শিকার হন। একপর্যায়ে এ আন্দোলনের অনেক কর্মী মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়ে ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেন। এমনকি মির্জা আলী মুহাম্মদ ওরফে বাব ১৮৫০ সালে তাবরিজে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত হয়ে নিহত হন।[৮০৯]

বাবের প্রধান সঙ্গীগণ নিহত হলেন। তবে যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মির্জা হুসেন আলী। তিনি বাহাউল্লাহ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি বাবের অনুসারীদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে বাহাই ধর্মতত্ত্ববিদ মাজগান শামসী বাহারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: ‘‘অবশিষ্ট কাজ চালিয়ে নেওয়ার, বাব এর অনুসারীদের উদ্দীপনা পরিপুষ্ট করার জন্য তিনি ছিলেন পূর্ব থেকে ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত। এবং তিনিই সে মহাপুরুষ

---

৮০৬ . শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৮০৭ . মাজগান শামসী বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

৮০৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

৮০৯ . শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

ছাড়া আর কেউ নন, যার আগমনের জন্য লোকদের প্রস্তুত করার জন্য বাব এসেছিলেন। ইনিই ছিলেন সে মহাপুরুষ, যার সম্বন্ধে বাব বলেছিলেন কালপূর্ণ হলে ঈশ্বর তাঁকে প্রকাশ করবেন। বাব এর ধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনবে যখন তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন। বাহাউল্লাহ ছিলেন সর্বযুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এবং তিনিই ছিলেন সে অবদমিত এবং উৎপীড়িত সম্প্রদায়ের আশা তিনিই ছিলেন বিলুপ্তির যন্ত্রণা থেকে সে ধর্মের একমাত্র ত্রানকর্তা।"[৮১০]

তিনি আরো বলেন:''বাব এর পূর্ব কথিত মতে, তার নিজের ধর্ম প্রচারের নয় বছর পর একটি নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত হল। বাহাউল্লাহর মাধ্যমে আর একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ধর্ম অস্তিত্বপ্রাপ্ত হল, বাবী সম্প্রদায় পরিপুষ্ট হল এবং একটি নতুন ধর্মের মধ্যে অগ্রবর্তী হল যে নতুন ধর্ম পৃথিবীর কোন শক্তিই প্রতিরোধ বা ধ্বংস করতে পারবে না।"[৮১১]

উপযুর্ক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রতিভাত হল যে, মির্জা হুসেন আলী ওরফে বাহাউল্লাহর মাধ্যমেই বাবী সম্প্রদায় বাহাই ধর্মে পরিণত হয়। মির্জা হুসেন আলী বা বাহাউল্লাহ **১৮১৭** খ্রিস্টাব্দে **১২** নভেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৮১২] তাঁর পিতা বুজুর্গ নূর শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পারস্যের শাহের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিলেন।[৮১৩]

বাহাউল্লাহ যদি তার পিতার পথ অনুসরণ করতেন অর্থাৎ রাজ দরবারে চাকুরি করতে চাইতেন তাহলে আরাম আয়েশে জীবন যাপনের জন্য এই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিও তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি দরিদ্রদের ভালোবাসতেন এবং তাদের সহায়তা করতে খুবই পছন্দ করতেন। বাহাউল্লাহর পিতা যখন

---

৮১০ . মাজগান শামসী বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

৮১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৮১২ . এইচ, এম, বালয়ুজী, অনু. শচীপাত চ্যাটার্জী, *বাহাউল্লাহ* (ঢাকা: বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ০১; *বাহাই ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন* ১৮১৭-২০১৭ (ঢাকা: বাংলাদেশের বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ০২; ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *বাহাউল্লাহর জ্যোতি* (ঢাকা: বাংলাদেশের বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, তা. বি.), পৃ. ২৩

৮১৩ . এইচ, এম, বালয়ুজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৩

মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি যৌবনে পদার্পন করেছেন, তার মরহুম পিতা রাজদরবারে তার জন্য মর্যাদা সম্পন্ন পদের ব্যবস্থা করে যান, দরবারে প্রশাসন তাকে যোগ্য পদে অভিষিক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৮১৪]

যৌবন কালেই তিনি বাবীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সরকারের রোষানলে পড়েন। ১৮৫২ সালে তেহরানের সিয়াচল ঢাকা অন্ধকার কূপে তাকে অন্তরীণ করা হয়। ১৮৫৩ সালে বাগদাদে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৬৩ সালে তিনি সার্বজনীন ঘোষণা প্রদান করেন। এতে তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, যার জন্য বাব জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলে দাবি করেন।[৮১৫] তিনি এও ঘোষণা করেন যে, তিনি বাব ও সকল ঐশী ধর্মের প্রতিশ্রুত মহামানব। তিনি দাবি করেন যে, তিনি স্রষ্টার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত অবতার।[৮১৬] ১৮৬৩ সালে তিনি কনস্টান্টিনোপলে নির্বাসিত হন। অতঃপর ১৮৬৮ সালে তিনি ফিলিস্তিনের আক্কায় নির্বাসিত হন। সেখানেই ১৮৭৩ সালে কিতাবুল আকদাস অবতীর্ণ হয়। ১৮৯২ সালে কিতাব-ই-আহাদ। বাহাউল্লাহর নিয়মতন্ত্র ও তাঁর উইল এবং টেস্টামেন্ট অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ২৯ মে ১৮৯২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ইসরাঈলের রাজধানী হাইফায় সমাহিত করা হয়।[৮১৭]

বাহাউল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে তার ছেলে আবদুল বাহাকে নিজের উত্তরসূরি মনোনীত করে যান। তিনিও তুর্কী সরকার কর্তৃক ১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত আক্কায় কারারুদ্ধ ছিলেন। অতঃপর মুক্তি লাভ করেন এবং ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে তিনি গীর্জা, ইয়াহুদি ভজনালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মানবাধিকার সংস্থা এবং ব্যক্তিগত ভবনে বক্তৃতা করেন। এ ছাড়া বহু চিন্তাবিদ ও অনুসন্দিৎসু ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এ সফরে বাহাই ধর্মমতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[৮১৮]

---

৮১৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৮১৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৮১৬ . শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৮১৭ . *বাহাই ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ১৮১৭-২০১৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৪; শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৮১৮ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৭

১৯২১ সালে আবুদল বাহা মৃত্যুবরণ করেন।[৮১৯] বাহা উল্লাহ আব্দুল বাহাকে যেমন বাহাই সম্প্রদায়ের অভিভাবক নির্ধারণ করেছিলেন ঠিক এভাবেই আবদুল বাহা তার দৌহিত্র শৌগী এফেন্দীকে মনোনীত করে যান। আবদুল বাহা এ বিষয়ে একটি ইচ্ছা পত্র তৈরি করে যান। সেখানে তিনি বলেন:

''হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এ উৎপীড়িত জনের তিরোভাবের পরে এটাই অপরিহার্য শৌগী এফেন্দীর দিকে মুখ ফিরান যিনি পবিত্রতার বৃক্ষের দুইটি শাখার সম্মিলনে উদ্ভূত ফল। যে ব্যক্তি তাকে আনুগত্য প্রদর্শন করে না সে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে না, যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে।''[৮২০]

শৌগী এফেন্দীকে আবদুল বাহা বিশেষ পরিকল্পনা ও অতি যত্নের সাথে তৈরি করেন। তিনি তাকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য, শৌগী এফেন্দী আবদুল বাহার সচিবের কাজও করতেন। তিনি ইংল্যান্ডে লেখা পড়া করেন। সেখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় তার নানা আবদুল বাহা মৃত্যুবরণ করেন। [৮২১] অতঃপর তিনি বাহাই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেণ। তার নেতৃত্বে বাহাই ধর্ম পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ইংরেজি ভাষায় বাহাই ধর্মগ্রন্থ সমূহ অনুবাদ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেন। সে সাথে তিনি বাহাইদের পবিত্রভূমি হাইফায় অবস্থিত বিশ্ব কেন্দ্র, বাবের মাজার ও আন্তর্জাতিক সেরেস্তা ভবন নির্মাণ ও সৌন্দর্যমন্ডিত করেন।[৮২২] ১৯৫৭ সালে শৌগী এফেন্দী লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন। [৮২৩]

এফেন্দীর মৃত্যুর পর বাহাই ধর্মের শীর্ষ ভাষ্যকার ও অভিভাবক হিসেবে আর কেউ মনোনীত হননি। এফেন্দী মৃত্যুর পূর্বে কাউকে নিয়োগ করে যাননি।[৮২৪] এর কারণ শৌগী এফেন্দির

---

৮১৯ . শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৮২০ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৯

৮২১ . *প্রাগুক্ত*

৮২২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৮২৩ . শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৮২৪ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২; শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। আর বাহউল্লাহর পরিবারে ধর্মীয় অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিও ছিলেন না। তবে এতে বাহাই ধর্মের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়নি। কেননা, বাহাউল্লাহ তাঁর ধর্মগ্রন্থে বিশ্ববিচারালয় নামক একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে যান।[৮২৫]

১৯৬৩ সালে বাহাইদের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদ সার্বজনীন বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯ জন সদস্য সম্বলিত এ পরিষদ বিশ্বের সকল জাতীয় বহাই সমাজসমূহ দ্বারা নির্বাচিত হয়। এ পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। উল্লেখ্য, সকল বাহাই নির্বাচন গোপন ব্যালট এবং প্রার্থীর মনোনয়ন বা প্রচার ছাড়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।[৮২৬] বিশ্বে ৬০ লক্ষেরও বেশি লোক রয়েছে, যারা বাহাই ধর্মমত অনুসরণ করছে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে বাহাই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।[৮২৭] **১৯১** টি দেশে বাহাই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৮২৮] **১৮৮** দেশে 'জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ' নামে তাদের জাতীয় পরিচালনা পরিষদ এ ধর্মের কাজ দেখাশোনা করে যাচ্ছে।[৮২৯]

বিশ্বের **১১৭৪০**টি শহর ও গ্রামে তাদের স্থানীয় পরিচালনা পরিষদ রয়েছে।[৮৩০] **২১০০** আদিবাসী উপজাতি, জাতি এবং জাতিবর্গ বাহাই ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে।[৮৩১] বাহাই লেখনি ও অন্যান্য সাহিত্য ৮০০ টিরও বেশি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।[৮৩২] সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাহাইরা অবদান রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে তারা ৯০০টিরও বেশি এ জাতীয় প্রকল্প পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ৬০০ টিরও বেশি বিদ্যালয় আর ৭০টি উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে।[৮৩৩]

বাহাই উপসানলয় তিনভাগে বিভক্ত। যথা:

---

৮২৫ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৮২৬ . *বাহাই ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ১৮১৭-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৮২৭ . *প্রচারপত্র, বিশ্ব শান্তি ও একতার জন্য বাহাই শিক্ষা* (বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, তা. বি.)

৮২৮ . প্রাগুক্ত. পৃ. ১১২

৮২৯ . *বাহাই ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ১৮১৭-২০১৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৮৩০ . শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৮৩১ . *বাহাই ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ১৮১৭-২০১৭*, *প্রাগুক্ত*

৮৩২ . *প্রাগুক্ত*

৮৩৩ . *প্রাগুক্ত*

ক) মহাদেশীয় উপসনালয়

খ) জাতীয় উপাসনালয়

গ) স্থানীয় উপসনালয়

মহাদেশীয় উপাসনালয়

এজাতীয় উপাসনালয় রয়েছে আটটি। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মনি, ভারত, পানামা, সামোয়া, উগান্ডা ও চিলিতে এ ধরনের উপাসনালয় রয়েছে। [৮৩৪]

জাতীয় উপাসনালয়

জাতীয় উপাসনালয় এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোঁ এবং পাপুয়া নিউ গিনিতে জাতীয় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।[৮৩৫]

স্থানীয় উপাসনালয়

বিহার শরীফ (ভারত), বাটাম্বাং (কম্বোডিয়া), মাতুন্ডাসয় (কেনিয়া), নর্তেদেল কৌকা (কলম্বিয়া) এবং তান্নাতে (ভানুয়াতু) স্থানীয় উপাসনালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। উপর্যুক্ত স্থানীয় উপাসনালয়ের মধ্যে বাটাম্বাং উপাসনালয়টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মানবজাতির জন্য ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে তা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।[৮৩৬]

বাহাই উপাসনালয়গুলো মধ্যে নতুন দিল্লীতে অবস্থিত লোটাস টেম্বল বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। বাহাইরা এটা ঈশ্বরের নাম উল্লেখের শ্রেষ্ঠতম স্থান এর একটি নিদর্শন মনে করে। এটি বাহাই সম্প্রদায়ের একটি মৌলিক ধারণা, ভক্তি, সেবা ও ঐক্যের প্রতীক। এটি ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত এখানে ৭ কোটিরও বেশি দর্শনার্থী পরিদর্শন করেছেন। [৮৩৭]

১৯৪৮ সাল থেকেই বাহাই ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি (বি.আ.ম) বেসরকারি সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘের জনতথ্য কার্যালয়ের’ সঙ্গে সংযুক্ত আছে। এ ছাড়া ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের

---

৮৩৪ . *প্রাগুক্ত*

৮৩৫ . *প্রাগুক্ত*

৮৩৬ . *প্রাগুক্ত*

৮৩৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Ecosoc), ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (Unicef) এবং ৮০-এর দশকে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO) এর পরামর্শদাতার মর্যাদা লাভ করে। এ ছাড়া জাতিসংঘের জন সাধারণের তথ্যবিভাগ (DIT) ও জাতিসংঘের পরিবেশগত কর্মসূচী (UNEP) -এর সাথে আলোচনার মর্যাদা লাভ করে। সেই সাথে সংস্থাটি আন্ত: ও বেসরকারি সংস্থা, একাডেমী এবং অনুশীলনকারীদের সাথে সদস্য হিসেবে সহযোগিতা করে। নিউইয়র্ক ও জেনেভায় জাতিসংঘের এবং নাইরোবিতে পরিবেশ কর্মসূচীতে (ENVIRONMENT PROGRAM) বাহাই ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির প্রতিনিধি রয়েছে।[৮৩৮]

---

৮৩৮ . *প্রচার পত্র, প্রাগুক্ত; বাহাই ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ১৮১৭-২০১৭, প্রাগুক্ত*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে বাহাই সম্প্রদায়

১৮৭৬ সালে সোলেমান খান বাহাউল্লাহর আদেশে বাহাই ধর্মের বার্তা নিয়ে ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। উল্লেখ্য, সোলেমান খান জামাল এফেন্দি নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর মাধ্যমেই ভারত উপমহাদেশে বাহাই ধর্মের গোড়াপত্তন হয়। **১৮৮০** সালে তিনি এবং তার সাথী মোস্তফা রুমি বাংলাদেশে আসেন। ঢাকায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর **১৯২১** সালে বাংলাদেশে আসেন নারায়নরাও উকিল। তিনি ঢাকা ও ময়মনসিংহে বাহাই ধর্মের বাণী প্রচার করতে থাকেন। **১৯৫২** সালে ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ গঠিত হয়।[৮৩৯] ঢাকায় অবস্থিত জাতীয় বাহাই কেন্দ্র ছাড়া রাজশাহী, খুলনা, চট্রগ্রাম, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুরে স্থানীয় কেন্দ্র রয়েছে।[৮৪০]

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাহাই ধর্মের অনুসারীগণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করছেন এবং তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দেশ ও সমাজের সেবার নিয়োজিত রয়েছেন।[৮৪১]সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে বসবাসকারী বাহাই অনুসারীর সংখ্যা তিন লক্ষ।[৮৪২]

---

৮৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১, শানজিদ আবি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৮৪০. *প্রাগুক্ত*

৮৪১. *প্রাগুক্ত*

৮৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাহাইদের কার্যক্রম

বাহাই সমাজ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিশু,কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন। এসব কার্যক্রম চারভাগে বিভক্ত। যথা:

ক) শিশু ক্লাস

খ) কিশোর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম (জুনিয়র ইয়ুথ ক্লাস)

গ) অধ্যয়ন চক্র

ঘ) প্রার্থনা সভা (ভক্তিমূলক সভা)

শিশু ক্লাস

শিশু ক্লাস দুইভাগে বিভক্ত। শিশু ক্লাস প্রথম ভাগ ও শিশু ক্লাস দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে ৬-৮ বছর বয়সী শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। আর দ্বিতীয় ভাগে ৮-১২ বছর বয়সী শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে থাকে। শিশু ক্লাসের মাধ্যমে শিশুদের আধ্যাত্মিক প্রতিপালন এবং তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে বাহাইরা সাহায্য করে থাকে।

কিশোর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম বা জুনিয়র ইয়ুথ ক্লাস

১২-১৫ বছর বয়সী কিশোররা এ ক্লাসের শিক্ষার্থী। কিশোরদের সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশে তিন বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম এটি। নিজের জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে সমাজের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতিতে কীভাবে কিশোররা সাহায্য করতে পারে তাই শিক্ষা দেয়া হয় এ ক্লাসে। এতে বাহাই অবাহাই সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

অধ্যয়ন চক্র

১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে যাদের বয়স অর্থাৎ বাহাই মতে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা এ চক্রের সদস্য হতে পারেন। অধ্যয়ন চক্রের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত বাণী নিয়ে অধ্যয়ন এবং তাদের কর্মে প্রতিফলন এবং পরামর্শের মাধ্যমে তারা যে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেন তা সমাজ সেবায় প্রয়োগ করার জন্য বাহাইরা সাহায্য করে থাকে।

প্রার্থনা সভা

বিশ্বের সকল বাহাইরা নিয়মিতভাবে প্রার্থনা সভার আয়োজন করে থাকেন। এ সভায় একত্রিত হয়ে বাহাইগণ প্রেম, সেবা এবং আধ্যাত্মিক প্রতিপালন এবং তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে বাহাইরা সাহায্য করে থাকে।[৮৪৩]

বাহাই সমাজ জীবন

বাহাইরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের সমাজ জীবন পরিচালনা করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, যদি তারা একই শাখার পত্রাবলী এবং একই সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় একযোগে কাজ করে যায় তাহলে একটি সুদৃঢ়, ব্যস্ত ও সুখী সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে।[৮৪৪]

বাহাইগণ যে সকল আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করে তা নিম্নে পেশ করা হল।

ঊনবিংশ দিবসের ভোজানুষ্ঠান

বাহাইগণ প্রার্থনা, আলোচনা ও সাহচর্যের জন্য বাহাই মাসের ১ তারিখ সমবেত হয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, বাহাই মাস ১৯ দিনে হয়ে থাকে। যেহেতু বাহাই হিসেবে দিনের শুরু সূর্যাস্তের পর থেকে সেহেতু ১৯ দিবস পরবর্তী ১ তারিখে ভোজানুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানের তিনটি অংশ রয়েছে। যথা: প্রার্থনা ও ধ্যান, আলোচনা ও সাহচর্য।[৮৪৫]

প্রার্থনা ও ধ্যান

এ অংশে বাহাইগণ প্রার্থনা ও বাহাই পবিত্র লিখনাবলী হতে অংশ বিশেষ পাঠ করে থাকে। সে সাথে বাহাই শ্লোকসমূহ থেকে গান করে থাকে। এছাড়া অন্যান্য ভক্তিমূলক সংগীত এ অংশে বাজানো হয়ে থাকে। বাহাইগণ আব্দুল বাহার নিম্নোক্ত বক্তব্যের অনুসরণ করে থাকে। আবদুল বাহা বলেন: ‘‘আল্লাহর কাছে নিষ্কলঙ্ক উল্লাস ও সৌরভ সহকারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর, (এবং) শ্লোকসমূহ গান কর। সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা স্বয়ম্ভু প্রভুর জন্যই।’’ [৮৪৬]

---

৮৪৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৮৪৪ . ডি. ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

৮৪৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪

৮৪৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

আলোচনা

এ অংশে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। এর মধ্যে স্থানীয় আধ্যত্মিক পরিষদ তাদের কার্যাবলীর বিবরণী পেশ করে। স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার মাধ্যমে দাওয়াতী বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় জানা যায়। এতে বিশ্ব বিচারালয় অথবা জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত পত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ অংশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় দাওয়াতী কাজকে। এ বিষয়ে বাহাইগণ খোলামেলা আলোচনা করে থাকে।[৮৪৭]

সাহচর্য

ভোজানুষ্ঠানের শেষাংশে খাবারের আয়োজন করা হয়। এ সময় বাহাইগণ পরস্পরের সাহচর্য উপভোগ করে থাকে। এতে করে তারা একে অপরকে উৎকৃষ্টরূপে জানতে পারে এবং একটি প্রীতিপূর্ণ বাহাই পরিবার হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। আবদুল বাহা এ সম্পর্কে বলেন: ‘‘বাহাইগণকে অবশ্যই একে অন্যের সহিত চরম প্রীতি, উল্লাস ও সুরভি সহকারে মিলামিশা করিতে হইবে। এই ধরনের মিলামিশা ও সাহচর্যে অন্তকরণ যথার্থরূপ ঐক্যবদ্ধ হয়।’’[৮৪৮] উল্লেখ্য, সকল বাহাইকে উপর্যুক্ত ভোজানুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হয়। তবে কেউ অসুস্থ অথবা শহরের বাইরে থাকলে ভিন্ন কথা। আর এ ভোজ সভা বাহাই কেন্দ্রে অথবা কোন বাড়িতে এমনকি অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও ধ্যান

বাহাই সমাজে ব্যক্তিগত প্রার্থনাকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ঈশ্বরকে জানা ও ভালোবাসাকে বাহাই সমাজ মৌলিক উদ্দেশ্য মনে করে। বাধ্যতামূলক নামাজ সমূহের একটিতে বলা হয়েছে, ‘আমি সাক্ষ্যদান করছি যে, হে আমার আল্লাহ, তোমাকে বলব ও তোমার অর্চনা করব বলেই তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ।’ প্রত্যেক বাহাইকে আল্লাহর সন্নিধানে নামাজ আদায় করা আবশ্যক। সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা আবশ্যক। এ সম্পর্কে বাহাউল্লাহ বলেন: ‘‘হে অস্তিত্বের সন্তান! আমাকে ভালোবাস, যেন আমি তোমাকে

---

৮৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

৮৪৮ . *প্রাগুক্ত*

ভালবাসতে পারি। যদি তুমি আমাকে ভাল না বাস, আমার ভালবাসা কোন ক্রমেই তোমার নিকট পৌঁছতে পারে না। হে ভৃত্য, ইহা জানিয়া রাখ।"[৮৪৯]

একজন বাহাই তার সমাজকে প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করবে এটাও তার জন্য ব্যক্তিগত ইবাদত হিসেবে গণ্য। যেমন সে সান্ধ্যানুষ্ঠান, সভানুষ্ঠান পূর্বক শিশুদের শিক্ষাদান, সভা সমিতিতে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা, উনিশের ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন, যাদের গাড়ি নেই তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন কমিটিতে কাজ করা ইত্যাদি কাজ করার মাধ্যমে প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। [৮৫০]

বাহাউল্লাহ উপদেশ প্রদান করেছেন যে, প্রত্যেককেই প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা মানুষের আত্মাকে আল্লাহর সহিত সংযোগ স্থাপনের একটি উপায়। আবদুল বাহা বলেন, মানুষ যখন প্রার্থনা করে তখন সে নিজেকে আল্লাহর সম্মুখে দেখতে পায়। প্রার্থনা করার সময় সবকিছু ভুলে যেতে হবে। একমাত্র স্রষ্টা নিয়েই চিন্তা করতে হবে। আল্লাহ বলেন:

''হে আলোকের সন্তান! আমাকে ব্যতীত সমস্তই ভুলিয়া যাও ও আমার আত্মর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত হও। ইহা-ই আমার আদেশের সারবস্তু, অতএব ইহার দিকে প্রত্যাবৃত্ত হও।"[৮৫১]

মহান স্রষ্টার রহস্য সমূহের দ্বার উন্মোক্ত করার দাবি হল ধ্যান। এ সম্পর্কে আবদুল বাহার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: ''ধ্যানের কার্যক্ষমতায় মানুষ পবিত্র আত্মার নিঃশ্বাস লাভ করিয়া থাকে, ইহার মাধ্যমে সে স্বর্গীয় খাদ্য লাভ করিয়া থাকে। ধ্যানের সময়ে মানুষের আত্মা স্বয়ং অনুপ্রাণিত ও শক্তিকৃত হইয়া থাকে। [৮৫২]

নামাজের সাথে সাথে ধ্যান কার্যও পরিচালনা করতে হবে। একজন বাহাই তার চিন্তাধারাকে আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যাবলীর দিকে পরিচালিত করবে সেই সাথে বাহাউল্লাহর জীবন ও উপদেশাবলীকে ধ্যান করা কর্তব্য মনে করবে।[৮৫৩]

---

৮৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭

৮৫০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

৮৫১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

৮৫২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৮৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

সার্বজনীন অংশ গ্রহণ

প্রত্যেক বাহাইকে সমাজ-জীবনে অংশগ্রহণ করা বাহাই ধর্মে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাহাইগণ মনে করে বাহাই সমাজ একটি দেহের ন্যায়। এর কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে সমগ্র দেহটাই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। এ সম্পর্কে আবদুল বাহার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

‘‘এক যোগে কাজ করুক, একটি দেহ একটি আত্মার ন্যায় হউক, এবং এইরূপে কার্যকরত: তাহারা একটি সত্যিকারের সুসংঘবদ্ধ, পবিত্রাত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত ও আলোকিত সুস্থ দেহবিশিষ্ট হইবে।’’[৮৫৪]

শুধুমাত্র প্রার্থনা আর ধ্যান বাহাই জীবন নয়। বাহাই ধর্মমতের সকল কাজে স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণই বাহাই জীবন। প্রার্থনা, দাওয়াতী কাজ, শিক্ষাদান, বক্তৃতা দান, চাঁদা দান প্রভৃতি কাজে একজন বাহাই আনন্দচিত্তে অংশ গ্রহণ করবে। তবে যদি কোন বাহাই নির্দিষ্ট কোন কাজ করতে অক্ষম হয় তা ভিন্ন কথা।[৮৫৫]

পবিত্র দিবস পালন

বাহাইদের বিভিন্ন দিবস রয়েছে যা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর স্মারক। এসব দিবস পালন করার মাধ্যমে একজন বাহাই তার ধর্মের পথে আরো এগিয়ে যেতে পারে। বৎসরে ১৯টি দিন আছে যাতে বাহাইগণ সম্ভবপর হলে কোন কাজকর্ম করে না। দিবসসমূহ উৎযাপন করে থাকে। এ সম্পর্কে আবদুল বাহা বলেন, বৎসরে ঊনিশটি দিবস নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, যে দিবসগুলিতে কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ (হারাম) হইয়াছে।’[৮৫৬]

এ সকল দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, ২০ অক্টোবর বাবের জন্ম দিবস, ১২ নভেম্বর বাহাউল্লাহর জন্ম দিবস। এ দুটি দিবস বাহাইদের জন্য মহা আনন্দের দিবস। এছাড়া ২৩ মে। যেদিন বাব বিশ্ব সমক্ষে তার দৌত-কার্যের কথা ঘোষণা দেন। ২১ এপ্রিল, ২৯ এপ্রিল, ২০ মে এ তিনটি দিবস। ২২ মার্চ নওরোজ বা বাহাই নববর্ষ। ৯ জুলাই শহীদ দিবস। ২৯ মে

৮৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

৮৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০-১৫১

৮৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২

বাহাউল্লাহর পরলোক গমন দিবস। ২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ১ মার্চ পর্যন্ত আইয়্যামে হা দিবস ইত্যদি।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা

শিক্ষা ছাড়া কোন কিছুই পালন করা সম্ভব নয়। তাই বাহাইরা আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং এর বর্ধনের ব্যাপারে উৎসাহিত করে থাকে। মানবজাতির জন্য বাহাউল্লাহর উদ্দেশ্য কী ? কেন তিনি অমানুষিক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন ? একটি নতুন মানবজাতি বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন ? কী কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তিনি আনয়ন করেন ? এ চারটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। আর এ জন্য বাহাই গ্রন্থাদির ব্যাপক অধ্যয়ন অনস্বীকার্য। বাহা উল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন:

‘‘যে কোন ব্যক্তিই তোমাদের মধ্য হইতে তাহার প্রভুর ধর্ম প্রচারের জন্য দন্ডায়মান হউক না কেন, সর্ব প্রথম তাহাকে তাহার নিজেকে এমনভাবে শিক্ষিত করিয়া লইতে হইবে, যেন সে তাহার বাক্যের দ্বারা তাহার শ্রোতাদের অন্তকরণ আকৃষ্ট করিতে পারে। যদি সে তাহার নিজেকে শিক্ষিত না করে, তাহা হইলে তাহার বাক্য অন্বেষণকারীর অন্তকরণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।’’[৮৫৭] প্রত্যেক বাহাই তার জ্ঞান বর্ধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এ ক্ষেত্রে বাহাই ধর্মের তিনজন পুরোধ বাহা উল্লাহ্, আবদুল বাহা ও শৌগী এফেন্দীর লেখনী অধ্যয়ন আত্মস্থকরণ ও এর প্রচার একান্ত আবশ্যক।

শিশু ও যুবকদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা

আবদুল বাহা বলেন: ‘‘সকল শিশুর অন্তঃকরণই অত্যন্ত পবিত্র। তাহারা এমন দর্পনের ন্যায়, যাহার উপর ধুলি পড়ে নাই। ঐশী উপদেশ সহকারে তাহাদিগকে শিক্ষাদান কর। শৈশব হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণে একটু একটু করিয়া আল্লাহর ভালবাসার বীজ বপণ কর।’’[৮৫৮]

আবদুল বাহার এ বাণীর প্রতি ভক্তি রেখে বাহাইরা শিশু ও যুবকদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। এ জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ক্লাসের ব্যবস্থা রেখেছে। একজন বাহাই তার সন্তানের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য বেশি দায়িত্বপ্রাপ্ত অতঃপর অন্যের

৮৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

৮৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

সন্তানদেরকেও শিক্ষাদানে প্রাগ্রসর ভূমিকা রাখা তার কর্তব্য। বাহাউল্লাহ ও আবদুল বাহা শিশুদের জন্য বাহা প্রার্থণা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

সমাজ সেবা

আবদুল বাহা বলেন: 'ইহাই উপাসনা: মানবজাতির সেবা করা এবং জনসাধারণের অভাব অভিযোগ পূরণ করা।'[৮৫৯]

বাহাইরা এ বাণীকে ধারণ করে মানব সেবাকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাসনা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে একজন বাহাই সমাজ ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। তাঁর কাজ হচ্ছে, সমাজের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে প্রাগ্রসর ভূমিকা পালন করা। একজন বাহাই সমাজের প্রতিটি স্তরে অবদান রাখতে সচেষ্ট হবে। শিশু, কিশোর, যুবক, পুরুষ-নারী সকলের কল্যাণের দিক সে বিবেচনা করবে। সমাজে বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তাকে সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে।

মহিলাদের অংশগ্রহণ

বাহাই ধর্মে মহিলাদের সমানাধিকার প্রদান করা হয়েছে। আবদুল বাহা নারী অধিকার সম্পর্কে বলেন: ''জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলাগণকে অগ্রগতি লাভ করিতে হইবে এবং সর্ব ক্ষেত্রে তাহাদের দৌত্যকার্য পরিপূর্ণ করিতে হইবে, তাহাদিগকে পুরুষের সমান হইতে হইবে। যখন নারী ও নর উভয়েই পরষ্পর সহযোগিতা করিবে এবং সমভাবে অগ্রসর হইবে তখনই মানব জাতির সুখ বাস্তবায়িত হইবে, যেহেতু একে অন্যের সহযোগি এবং সহায়ক।" ''মানবজাতি একটি পাখির দুইটি পাখার ন্যায় ইহার একটি নর, অন্যটি নারী। যদি পাখা দুইখানা মজবুত না হয়। তাহা হইলে পাখি শূন্যমার্গ উড্ডয়ন করিতে পারে না।''[৮৬০]

বাহাই সমাজ জীবনে পুরুষ এবং নারী উভয়ই পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে থাকে। উভয়ই নির্বাচনে ভোটদান করে। উভয়েই স্থানীয় ও আধ্যাত্মিক পরিষদে অংশগ্রহণ করে থাকে। পুরুষ

---

৮৫৯ . *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৬১

৮৬০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩-১৬৪

বা নারী যে কেউ কোনও পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা সচিব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গ কোন ভূমিকা রাখবে না যোগ্যতাই এখানে মানদন্ড। [৮৬১]

বাহাই জীবন যাপন

একজন বাহাই অনুসারীকে বেশ কিছু নিয়ম কানূনের মধ্যে চলতে হয়। তাঁর মাঝে সদগুণাবলীর সমাবেশ থাকা আবশ্যক। বাহাই ধর্মের অভিভাবকবৃন্দ বাহা উল্লাহ, আবদুল বাহা ও শৌগী এফেন্দি এসব আবশ্যকীয় গুণাবলীর কথা তাদের লেখনীর মধ্যমে তুলে ধরেছেন। একজন বাহাই অবশ্য পুত-পবিত্র স্বভাবের হবেন। নিষ্কলুষ পবিত্র জীবনই বাহাই ধর্মের কাম্য। এ প্রসঙ্গে বাহা উল্লাহ বলেন:

"যে ব্যক্তি তার পার্থিব প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলে, অথবা জাগতিক বস্তুর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। সে বাহার জনগণের মধ্যে গণ্য নয়। সে ব্যক্তিই আমার প্রকৃত অনুসারী, যে ব্যক্তি, যদি কখনও কোন প্রকৃত সুবর্ণ উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়, তাহলে সে হালকা মেঘের ন্যায় সোজা সে পথ অতিক্রম করে চলে যায়, এবং কখনও সে পশ্চাদ্দিকে তাকায় না, বা ক্ষণিক সেখানে দাঁড়ায় না। এ ধরনের মানুষই সুনিশ্চিতরূপে আমার। তার পোশাক থেকে পবিত্রতার সৌরভ সর্বোচ্চ স্থান পর্যন্ত বয়ে যেতে সমর্থ হয়।"[৮৬২] বাহাইরা মনে করে, পবিত্রতা ও সতীত্ব ঈশ্বরের দাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বরূপ। নারীর সতীত্ব তার মস্তকের মুকুট বৈ কিছু নয়। এসব সতী- সাধ্বী নারীরা সর্বোচ্চ পর্যায় পৌঁছতে সক্ষম হয়।[৮৬৩]

বাহাউল্লাহ বলেন: 'নিশ্চয়ই আমরা তোমার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করি। আমরা যদি তা থেকে পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার সুমিষ্ট ঘ্রান প্রাপ্ত হই। তা হলে, এটা সুনিশ্চিত যে, আমার তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবো। আমরা ঈশ্বরের ভাতৃগণকে এবং তাঁর সেবিকাগণকে, যাতে তারা তাদের অসাধু উদ্দেশ্যাবলীর তন্দ্রা ফেলে দিতেও ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবৃত হতে সমর্থ হয়,

---

৮৬১ . *প্রাগুক্ত*

৮৬২ . বাহাই অভিভাবকবৃন্দ, *বাহাই জীবন পদ্ধতি*, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন (ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ০২

৮৬৩ . প্রাগুক্ত, পৃ. ০১

তজ্জন্য তাদেরকে পবিত্র ও ঈশ্বরভীত হতে আদেশ দান করি।"[৮৬৪] আত্মিক পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাও অতীব জরুরী বিষয়। আবদুল বাহা বলেন, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা, যদিও বাস্তব বিষয় ব্যতীত নয়, তথাপি আধ্যাত্মিকতার উপর এর বিরাট প্রভাব রয়েছে।[৮৬৫]

বাহাউল্লাহ বাহাইদের পবিত্রতার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার নির্যাসে অপরিমেয় বিশুদ্ধতার প্রতি গুরুত্ব দিতে আহবান জানিয়েছেন। তিনি ধর্মকে পবিত্রতার প্রতিবিম্ব বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন কেউ যেন পবিত্র ও বিশুদ্ধ বাহাই ধর্মকে কলুষিত না করে। তিনি মনে করেন একজন বাহাই তার পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা দিয়ে সমগ্র পৃথিবীটা দেবতার দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে।[৮৬৬]

সততা ও সত্যবাদিতা এক মহান গুণ। বাহাউল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন: ‘‘ যা সে নিজের জন্য কামনা করে না, প্রকৃত সত্য-সন্ধানীর পক্ষে অপরের জন্য তা কামনা করা উচিত নয়, অথবা যা সে পূরণ করতে পারবে না, তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত নয়।"[৮৬৭] বাহাই ধর্মমতে যারা সদুপদেশ দান করে, তাদের নিজেদের আগে সে বিষয়ে আমল থাকতে হবে। বাহাউল্লাহ বলেন:

"এ অত্যাচারিত ব্যক্তি তোমাদের প্রতি সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। যে শহর এসবের আলোকে উদ্ভাসিত, সে শহর ধন্য। এসবের মাধ্যমে মানুষ মর্যাদাপূর্ণ হয় এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের সম্মুখে নিরাপত্তার দরজা অর্গলমুক্ত হয়। যারা ঈশ্বরের ভজনালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং যারা চিরস্থায়ী গৌরবের সামনে সমাসীন, যদিও তারা ক্ষুধায় মৃতকল্প তথাপি তারা তাদের কোনও প্রতিবেশী যদিও সে নীচ ও অপদার্থও হয় তার সম্পত্তির প্রতি হস্তার্পণ করবে না এবং বে-আইনীভাবে ধারণ করবে না।"[৮৬৮]

---

৮৬৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৮৬৫ . *প্রাগুক্ত*,পৃ. ০৬

৮৬৬ . *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১২-১৩

৮৬৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৮৬৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

সত্যবাদিতা ও উত্তম কথনের কোন বিকল্প নেই। বাহাই ধর্মের অনুসারীর এ গুণ থাকা আবশ্যক। বাহাউল্লাহ বলেন: "উচ্চপদ ও শ্রেণির জন্য উত্তম কথন ও সত্যবাদিতা স্বর্গীয় জ্ঞানের দিক চক্রবাল থেকে উদিত সূর্যসদৃশ। সর্বদা সত্যবাদিতা ও শুভেচ্ছাই হলো সমগ্র মানবজাতির সাথে তাদের সম্পর্কের প্রতীক।"[৮৬৯] সত্যবাদিতা সম্পর্কে আবদুল বাহার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: ''সত্যবাদিতা যাবতীয় মানবীয় গুণাবলীর ভিত্তিভূমি। ঈশ্বরের যাবতীয় বিশ্বে সত্যবাদিতা ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে উন্নতি ও কৃতকার্যতা লাভ করা অসম্ভব। যখন কোনও ব্যক্তির মধ্যে এ পবিত্র বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হবে, যাবতীয় স্বর্গীয় গুণাবলীও সে লাভ করতে সমর্থ হবে।"[৮৭০]

বাহাই অভিভাবকগণ শালীনতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাহাউল্লাহর মতে, মানুষের মধ্যে এমন একটি মনোবৃত্তি রয়েছে যা তাকে নিরর্থক ও অশোভন কার্য থেকে এবং যা সে অপমানজনক মনে করে, তা থেকে বিরত রাখে এবং রক্ষা করে। আর এটি হলো শালীনতা। একজন বাহাইয়ের মধ্যে এ গুণ থাকা অবশ্বম্ভাবী।[৮৭১]

বিনয় ও নম্রতা মানুষকে গৌরব ও ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করায় পক্ষান্তরে অহঙ্কার তাকে দুর্ভাগ্য ও অবনতির অতল গহবরে নিক্ষেপ করে। সমগ্র সৃষ্ট বিষয় মহান ঈশ্বরের দান এ বিষয়টি যে ব্যক্তি উপলব্দি করতে পারে, সে সর্বপ্রকারের অহঙ্কার, অহমিকা ও নিরর্থক গৌরব থেকে নিজেকে পুত ও পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়।[৮৭২]

সংযম ও ধৈর্য বাহাই অনুসারীর আরেকটি অপরিহার্য গুণ। সংযম সম্পর্কে বাহাউল্লাহ বলেন: "সংযমের সীমার বাইরে যা ই কিছু ঘটুক না কেন, মঙ্গলকর প্রভাবের সাহায্যে একে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে।" তিনি ধৈর্য সম্পর্কে বলেন: "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি (বিপদাপদে) ধৈর্যশীল, তার পুরুস্কার বর্ধিত করা হবে। যদি ঈশ্বরের পথে (চলতে গেলে) কোনও লোক তোমাকে গালাগালি করে, অথবা তোমাকে কষ্ট দান করে, তাহলে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং যিনি শ্রবণ

৮৬৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৮৭০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৮৭১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৮৭২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৮

করেন, ও যিনি দর্শন করেন, তাঁর প্রতি তুমি আস্থা স্থাপন কর।"[৮৭৩] বাহাউল্লাহ আরোও বলেন: 'প্রত্যেক বস্তুরই একটি নিদর্শন আছে। ভালোবাসার নিদর্শন হলো আমার আদেশের প্রতি দৃঢ়সংকল্প থাকা এবং আমার পরীক্ষার প্রতি সহিষ্ণু থাকা।"[৮৭৪]

বাহাই অভিভাবকগণ বদান্যতা ও সৌজন্যকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বদান্যতা সম্পর্কে বাহাউল্লাহ বলেন: ''ঈশ্বরের সমক্ষে বদান্যতা প্রিয় ও গ্রহণীয় এবং সর্ব প্রকার উত্তম কার্যের মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য। যে সমস্ত গরীব ধৈর্য সহকারে সহ্য করে এবং তাদের দুঃখ-কষ্টকে গোপন করে রাখে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাদের জন্য অপেক্ষা করে, এবং যে সমস্ত ধনী তাদের ঐশ্বর্যকে অভাবগ্রস্তের জন্য ব্যয় করে ও তাদেরকে (গরীবদেরকে) নিজেদের চাইতে অগ্রাধিকার দান করে, তারা উত্তম।"[৮৭৫]

একজন বাহাইকে সর্বোচ্চ সৌজন্যবোধের পরিচয় দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বাহাউল্লাহ বলেন: ''যে ব্যক্তি একে তার স্কন্দে ধারণ করে সে উত্তম এবং যে কেউ এ গুরুত্বপূর্ণ বদান্যতা থেকে বঞ্চিত, তার জন্য আফসোস হে ঈশ্বরের জনগণ। আমি তোমাদেরকে সুজন (ভদ্র) হওয়ার জন্য উপদেশ দান করি। প্রাথমিক পর্যায়ে সৌজন্য হলো সর্বগুণের অধিপতি। সে-ই ধন্য, যে সৌজন্যের আলোকে উদ্ভাসিত এবং ন্যায়পরায়ণতার আবরণে অলঙ্কৃত। যে ব্যক্তি সৌজন্যের গুণে বিভূষিত, সে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত। [৮৭৬]

সেবা ও সহানুভূতি একজন বাহাইয়ের অন্যতম ভূষন। এ গুণ তার মধ্যে থাকা আবশ্যক। আবদুল বাহা বলেন: "রুগ্ন ব্যক্তির তত্বাবধান করা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যের অন্যতম। আমাদের সকলেরই রোগীকে দর্শন করা কর্তব্য। তুমি যখন কোন রুগ্ন ও মানসিক ক্লেশে ক্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা করবে, তখন অবশ্য সর্বদা তোমার মনে প্রীতি ও মমতার ভাব অক্ষুন্ন রাখবে।"[৮৭৭] বাহাউল্লাহ বলেন: ''যে ব্যক্তি গহবরে পতিত হয়ে আসন্ন ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে, তাকে

---

৮৭৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৮৭৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৭

৮৭৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৮৭৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৬

৮৭৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

উদ্ধার করাই তোমার মূলনীতি হোক, এবং তাকে সাহায্য করে ঈশ্বরের আদি কালের ধর্মকে সাদরে গ্রহণ কর।" [৮৭৮]

নিঃস্বার্থ ভাবে ত্যাগ করা বাহাই আদর্শের একটি। একজন সত্যিকার বাহাই তা ধারণ করে থাকে। এ সম্পর্কে বাহাউল্লাহ বলেন: "বল, হে মানুষগণ! তোমাদের আত্মাগুলোকে মুক্ত কর এবং আমি ব্যতীত আর সব কিছুর প্রতি আসক্তি থেকে তাদেরকে পবিত্র কর, আমার স্মরণ সর্বপ্রকার আবিলতা থেকে তোমাদেরকে পবিত্র করবে। অবশ্য যদি তোমরা একে অনুধাবন করতে সমর্থ হও।" [৮৭৯] আবদুল বাহা বলেন: ''আত্মপ্রীতি একটি অজ্ঞাত বৈশিষ্ট্য ও পৃথিবীর বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ। যদি কোন লোক সর্বপ্রকার গুণে বিভূষিত থাকে কিন্তু সে স্বার্থপর, তা হলে তার অন্যান্য গুণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা তাকে ত্যাগ করবে এবং শেষ পর্যন্ত সে অত্যন্ত হীন অবস্থায় পতিত হবে।"[৮৮০]

দরিদ্রের প্রতি দয়ার্দ্র মন নিয়ে এগিয়ে যেতে বাহাউল্লাহ তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: "তোমাদের মধ্যস্থিত দরিদ্র জনগণ আমার জিম্মী, তোমরা আমার জিম্মীকে সংরক্ষণ কর এবং নিজেদের সুখ-সম্ভোগের প্রতিই লক্ষ্য রেখো না। যদি তোমরা কোন গরীবকে দেখতে পাও তাহলে তার সাথে অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করো না। তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বিবেচনা কর। দান করা এবং দরিদ্র হওয়া আমারই গুণাবলী। যে ব্যক্তি আমার গুণাবলীতে বিভূষিত, সে-ই উত্তম।"[৮৮১]

বাহাই ধর্মে ন্যায়পরায়ণতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাহাউল্লাহর বাণী এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: ''মানুষের গুণাবলীর মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিকগুণ। যাবতীয় বস্তুর গুণাগুণ নির্ণয়ার্থে অবশ্যই এর উপর নির্ভর করতে হয়। বল! তোমরা বিচার-বিবেচনার ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতাকে অনুসরণ কর, হে প্রবুদ্ধ অন্ত:করণ বিশিষ্ট

---

৮৭৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৮৭৯. *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৪

৮৮০ . *প্রাগুক্ত*

৮৮১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

জনগণ! যে লোক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে অসৎ। সে মনুষ্যোচিত পর্যায়ের গুণাবলীহীন।"[৮৮২] তিনি আরো বলেন: ''হে আত্মার সন্তান! ন্যায়পরায়ণতা আমার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়; তুমি যদি আমাকে প্রত্যাশা কর, তাহলে এ থেকে তুমি বিমুখ হয়ো না, এবং আমি যাতে তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি, তজ্জন্য এর প্রতি অবহেলা করো না। ন্যায়পরায়নতাই মানব জাতির আলোক; একে অত্যাচার ও দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধ-বাত্যার সাহায্যে নির্বাপিত করো না। মানুষের মধ্যে একতা প্রতিফলিত করাই হলো ন্যায়পরায়ণতার ও উদ্দেশ্য। সতর্ক হও, যেন তুমি কারও প্রতি অবিচার না কর হোক না তা এক কনা সরিষা বীজ তুল্য। তুমি ন্যায়পরায়নতার পথে পদচারণা কর, কেননা, নিশ্চয়ই এটা সরল পথ মানব জাতির জীবন ন্যায়পরায়ণাতার উপর নির্ভরশীল এবং ক্ষমার উপর নয়।"[৮৮৩]

সেবা কার্য ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার উপর বাহাই সম্প্রদায় যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকে। একজন বাহাই অন্যান্য গুণাবলী ধারণ করার সাথে সাথে এ দু'টি গুণও ধারণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আবদুল বাহা বলেন: "বর্তমান যুগে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মানুষ যে সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে। ভালোবাসা সহকারে মানবজাতির সেবা করাই ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া। যে ব্যক্তি সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করে; সে ব্যক্তি ইতিমধ্যে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে প্রবেশ লাভ করেছে এবং সে প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করেছে। সেবাই উপাসনা।"[৮৮৪] তিনি আরোও বলেন: ''স্বর্গীয় আত্মার শক্তির সাহায্যে যে ভালোবসা লাভ করা যায়, সে ভালোবাসা হলো সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রকৃত ভালোবাসা।"[৮৮৫]

অতিথি সৎকারে বাহাই সম্প্রদায় উৎসাহিত করে থাকে। একজন বাহাই অতিথির সেবা করতে সর্বদা বদ্ধপরিকর থাকে। আবদুল বাহা এ প্রসঙ্গে বলেন: ''একত্বের আলোকে সকলকে অভ্যর্থনা কর। যখন কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হয়, সে সর্বত্র সূর্যালোক দেখতে পায়। সব মানুষই তার ভ্রাতা। তোমরা যখন কোনও অপরিচিত বিদেশী লোককে দেখতে পাবে,

---

৮৮২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

৮৮৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৫

৮৮৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৪

৮৮৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

তখন তার প্রতি তোমরা তোমাদেরকে গতানুগতিক ভাবে নিরুত্তাপ ও সহানুভূতিহীন হতে দিয়ো না। অপরিচিতদের প্রতি দায়ার্দ্র হও। তাদেরকে জানতে দাও যে, তুমি প্রকৃত পক্ষে একজন বাহাই। সমস্ত জাতির প্রতি সদাশয় হওয়ার জন্য বাহাউল্লাহর যে নির্দেশ রয়েছে তা কার্যকারী কর।"[৮৮৬] বাহাই ধর্মমত মিতাচরে খুব গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। একজন বাহাই এটি আত্মস্থ করে আলোকিত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। বাহাউল্লাহ মদ্যপানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন: ''যে নদী প্রকৃতপক্ষে জীবন, তাকে এমন বস্তুর সাথে বিনিময় করো না যাকে পবিত্র আত্মা বিশিষ্টগণ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। হে তোমরা! যারা তাঁর উপাসনা কর। ঈশ্বর প্রেমের মদিরার প্রতি আসক্ত হও এবং যা তোমাদের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়, তার প্রতি নয়। নিশ্চয়ই, প্রত্যেক বিশ্বাসী, নর বা নারী যে-ই হোক না কেন, সকলের প্রতি একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[৮৮৭]

আবদুল বাহা এ সম্পর্কে বলেন: ''মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কেননা, এটা দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ। এটা অন্ত্রসমূহকে দুর্বল করে দেয় এবং আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।" [৮৮৮]

বিশ্বস্ততা একটি চমৎকার গুণ। বাহাইগণ এর গুরুত্ব উপলব্দি করে এবং এর চর্চা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালায়। বাহাউল্লাহ বলেন: ''তোমাদের প্রতিবেশির কোনও বস্তুকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হস্তগত করো না। তোমরা পৃথিবীতে বিশ্বস্ত থাক, এবং ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁর করুণার মাধ্যমে যে সব বস্তু প্রদান করেছেন, তা থেকে গরীবদেরকে বঞ্চিত করো না। এটা সুনিশ্চিতরূপে জেনে রাখবে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে, সে বিশ্বস্তও নয়, সত্যবাদীও নয়।"[৮৮৯]

আবদুল বাহা বলেন: ''তোমরা এমন এক উদ্যম প্রদর্শন কর, যেন বিশ্বের যাবতীয় জাতি ও সম্প্রদায় সমূহ, এমনকি (এ ধর্মের) শত্রুরাও তোমাদের প্রতি তাদের আস্থা, নিশ্চয়তা ও ভরসা

---

৮৮৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৮৮৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

৮৮৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৮৮৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

স্থাপন করতে সমর্থ হয়, কেননা, যদি কোনও লোক শত সহস্র বার ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয় তা হলেও সে যেন তোমাদের মুখাপেক্ষী হতে, আশান্বিত হতে পারে যে, তোমরা তাকে ক্ষমা করবে, অতএব, অবশ্যই সে যেন নিরাশ, ব্যথিত অথবা হতাশ না হয়।"[৮৯০]

জ্ঞান অর্জন করা একজন বাহাইয়ের জন্য অপরিহার্য কার্যাবলীর একটি। শুধু অর্জন করলেই হবে না দিন দিন এর পরিধি বাড়াতে হবে এবং শানিত করতে হবে। বাহাউল্লাহ বলেন: ''বল! জ্ঞানের তরবারি গ্রীষ্মকালীন উত্তাপের অপেক্ষা উত্তপ্ত এবং ইস্পাতের তরবারি অপেক্ষা ক্ষুরধার, অবশ্য যদি তোমরা তা বুঝতে পার।
হে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্রগণ! জ্ঞানের ঝরনা থেকে পূর্ণমাত্রায় পান কর এবং তোমাদেরকে বায়ুমন্ডলের উর্ধ্বে উড্ডীন হতে দাও এবং জ্ঞান ও বাগ্মিতা সহকারে বাক্যালাপ কর।" [৮৯১]

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অনন্য একটি মানবীয় গুণ। একজন বাহাই এ গুণ ধারণ করতে সচেষ্ট হন। আবদুল বাহা এ প্রসঙ্গে বলেন: ''পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসাই হলো ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে কোনও ফল লাভ হয় না। কিন্তু প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই হলো অন্তঃকরণ থেকে সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। মানুষ যখন ঈশ্বরানুগ্রহের প্রতি প্রতিবেদনশীল হয়, তখন তার প্রতি বিবেকের অনুভূতিসমূহ অবতীর্ণ হয়। তার অন্তঃকরণ সুখী হয়। তার আত্মউল্লসিত হয়। এ অনুভুতিসমূহই হলো আদর্শ কৃতজ্ঞতা।"[৮৯২]

আধ্যাত্মিকতার পথে যাত্রা করে একজন বাহাই মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আবদুল বাহার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: ''ঈশ্বরের বদান্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী জীবন অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ঈশ্বরের সৌন্দর্য আকর্ষণের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হও, যেন তার স্মরণ তোমার শক্তিরূপে তোমার

---

৮৯০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৮৯১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

৮৯২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

শোনিতে, শিরাসমূহে ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে, এবং তোমাকে ঈশ্বর প্রেমের চিন্তায় পরিপূর্ণ করতে পারে।”[৮৯৩]

একজন বাহাই সদা সর্বদা তার ধর্মমতে ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখতে সচেষ্ট হবে। সেখানে সমগ্র মানবজাতির ঐক্য কামনা করা একজন বাহাই এর অন্যতম চিন্তা হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে বাহাউল্লাহের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন: “তোমরা একখানি হাতের অঙ্গুলি সদৃশ হও, একটি মাত্র সংগঠনের সদস্য হও। একতার আলোক এতখানি শক্তিশালী যে , তা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করতে পারে। একতার শিবিরে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তোমরা পরস্পরকে অপরিচিতরূপে গণ্য করো না। তোমরা সবাই একই বৃক্ষের ফল এবং একই শাখার পত্রাবলী। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা স্থাপন ও তার ধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্যের প্রাণকেন্দ্র হলো মানবজাতির স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাকে একতায় উন্নীত কর এবং মানব জাতির মধ্যে প্রেম ও বন্ধুত্বের মনোভাব বর্ধন করা।”[৮৯৪]

এ ছাড়া অন্যান্য সদগুণাবলী একজন বাহাইকে অর্জন করে মানবকল্যাণে কাজ করতে হয়। সেখানে যাবতীয় মানবীয় দোষাবলী থেকে নিজেদের হিফাযত করা আবশ্যক।

---

৮৯৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

৮৯৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাহাইদের মতাদর্শ

বাহাই সম্প্রদায় বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম এবং অপরাপর ধর্মের বিপরীত এবং কিছু ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করে থাকে। এ পর্যায়ে বাহাইদের মতাদর্শ সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হবে।

স্রষ্টা

স্রষ্টা সম্পর্কে বাহাইরা সুস্পষ্ট বিশ্বাস রাখে। তারা স্রষ্টার এককত্বে বিশ্বাস করে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, মহান স্রষ্টা এমন এক সত্তা যিনি সর্বজ্ঞ, সৃষ্টিকূল যাকে দর্শন করে নাই, যিনি জগতের সর্বশক্তিমান রক্ষক, নিজ সত্তা ব্যতীত তিনি কারোও নিকট প্রকাশিত হননি, তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্ববিজ্ঞ তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নাই। এ প্রসঙ্গে কিতাব -ই -আকদাসের ৩৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে:

"তোমাদের প্রতি এইরূপই হইতেছে তাঁহার আদেশ, যিনি একটি ফলক লিপিতে নিহিত বস্তু সমূহের জ্ঞান ধারণ করিয়াছেন, যাহা সৃষ্টকূলের চক্ষু দর্শন করে নাই এবং যাহা সকল জগতের সর্ব শক্তিমান রক্ষক, তাহার নিজ সত্তা ব্যতীত অপর কাহারও নিকট প্রকাশিত করেন নাই। তাহারা সর্ব অস্তিত্বের পরম প্রভুকে চিনিতে অসমর্থ, যাঁহার কণ্ঠস্বর চারিদিক হইতে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতেছে শক্তিমান আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নাই।"[৮৯৫]

কিতাব-ই-আকদাসের ৮৮ এর শ্লোকে বলা হয়েছে:

"যিনি চিরস্থায়ী, ক্ষমাশীল, সর্ব বদান্যতাপূর্ণ, আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নাই। সত্য সত্যই আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নাই, যিনি উচ্চারণের পরম প্রভু, যিনি সর্বজ্ঞ।"[৮৯৬] বাহাইরা মহান স্রষ্টাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে থাকে। তাঁর নিরঙ্কুশ শক্তির প্রতিও তারা বিশ্বাস রাখে। কিতাব-ই-আকদাসের ১২৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে:

---

৮৯৫ . *কিতাব-ই-আকদাস* (ঢাকা: বাহাই পত্র পাবলিশিং ট্রাস্ট, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩২

৮৯৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

“স্বর্গসমূহ এবং পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহাদের সকলের মালিক ঈশ্বর এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিমান।”[৮৯৭] ১৩২ নং শোকে ঘোষণা করা হয়: “সত্য সত্যই, ক্ষমতাশীল, শক্তিমান, সর্বদমনকারী, মহামহিমান্বিত, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নাই। বাস্তুবিকই তিনি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই, যিনি জগত সমূহের শক্তিশালী শাসক। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহার উপস্থিতি হইতে উদগত মাত্র একটি শব্দ দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে করায়ত্ব করিতেন।”[৮৯৮] উপর্যুক্ত কিতাবে ১০৩ নং শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে: “রাজ্য ঈশ্বরের, যিনি সকলের সার্বভৌম প্রভু, সর্ব শক্তিমান, স্নেহময়।” [৮৯৯] ৬১ নং শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে: “সত্য সত্যই, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁহার সৃষ্ট জীবকূলের কোন প্রয়োজনের উর্ধ্বে।”

বাহাইরা বিশ্বাস করে মহান আল্লাহ তা‘আলা অপরিমেয় শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন অর্থাৎ তাই বাস্তবায়িত হয়। এ সম্পর্কে বাহাই ধর্মগ্রন্থ কিতাব-ই-আকদাস এর ১৫৭ নং শ্লোকে বলা হয়:

“সর্বপ্রশংসা তোমার! হে তুমি জগৎসমূহের আকাঙ্খা। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহা প্রদান করিতে এবং যাহা ইচ্ছা করেন যাহার নিকট গুটাইয়া লইতে চাহেন, তাহা ঈশ্বরের হাতে রহিয়াছে। তিনি হৃদয় সমূহের অভ্যন্তরের গোপন বিষয়াদি এবং একজন উপহাসকারীর গোপন ঈঙ্গিতের অর্থ জানেন।”[৯০০]

বাহাইরা মহান স্রষ্টাকে আদেশদাতা ও ক্ষমাশীল মান্য করে। কিতাব-ই-আকদাসে বর্ণিত আছে: “বাস্তবিক পক্ষে, তিনি চিরক্ষমাশীল, সর্বশক্তিমান, সর্বপ্রশংসিত। প্রকৃত পক্ষে তিনি আদেশদাতা, মহাপরাক্রমশালী, মহিমান্বিত।”[৯০১] বাহাইরা বিশ্বাস করে মানবজাতির এমনকি গোটা বিশ্বের স্রষ্টা একজনই। মানুষ তাকে ভিন্ন নামে ডেকে থাকে। ঈশ্বর, যিহোবা, আল্লাহ

---

৮৯৭ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

৮৯৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫

৮৯৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৯০০ . *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ৭৪

৯০১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭,৩৯

এসব নাম সেই এককের যিনি নিখিল জাহানের স্রষ্টা ও প্রভু।[৯০২] বাহাইরা এও বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর তাঁহার নিজের রূপ অনুযায়ী মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বাহাউল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ বলেছেন, তুমি আমার প্রদীপ ও তোমার মধ্যেই আমার জ্যোতি রহিয়াছে। তোমারই মধ্যে আমি আমার জ্যোতির অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছি।" [৯০৩]

বাহাইরা বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ মানুষের রক্তবাহী শিরা অপেক্ষা আরো সন্নিকটে রয়েছেন। এ সম্পর্কে বাহাউল্লাহর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ "মানুষের রক্তবাহী শিরাগুলি অপেক্ষাও ঈশ্বর তাহার নিকটে রহিয়াছেন। যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট হইতে অনেক দূরে অনুভব করে, যদি সে স্মরণ করে যে, আল্লাহ বলিয়াছেন। আমার ভালবাসা তোমার মধ্যে রহিয়াছে। জানিয়া রাখ যে, তুমি আমাকে তোমার নিকটেই দেখিতে পাইতে পার।"[৯০৪]

রিসালাত

রাসূল সম্পর্কে বাহাইদের বিশ্বাস হচ্ছে রাসূলগণ হলেন এমন গুণাবলী যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রকৃতি ও আকাঙ্খা অবগত হওয়া যায়। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ অজানিত অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্ব চিরকালের জন্য সৃষ্টির কাছে রহস্য হয়ে থাকবে। আর এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূল (স.) প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে স্রষ্টা সম্পর্কে ততটাই প্রকাশ করেন যতটা মানুষ ধারণ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের নিখুঁত দর্পন হলো নবী-রাসূলগণ। আবদুল বাহা বলেনঃ "নিখুঁতভাবে পরিষ্কৃত দর্পণ, ঐশী প্রকাশের মধ্যে স্বর্গীয় গুণাবলী এমনভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, যতটুকু মানুষ ধারণ করতে পারে।"[৯০৫]

বাহাইরা মূসা (আ.), বুদ্ধ, জরথুস্ত্র, ঈসা (আ.), মুহাম্মাদু রাসূলুল্লাহ (স.), বাব ও বাহা উল্লাহকে নবী মনে করে। সে সাথে তারা মনে করে সকল নবী রাসূলের মর্যাদা সমান, কম বেশি নয়। বাহাউল্লাহর জ্যোতি গ্রন্থে বলা হয়ঃ

---

৯০২ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

৯০৩ . *প্রাগুক্ত*

৯০৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৯০৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

"ঈশ্বরের সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের পদ-মর্যাদা সমান। তাহারা বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে বিভিন্ন বাহ্য দেহে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু তাহারা সকলেই একই জ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া থাকেন। মূসা (আ.), মহাত্মা বুদ্ধ, জরথুস্ত্র, যীশু খ্রীস্ট, হযরত মুহাম্মদ (স.), বাব এবং বাহাউল্লাহ সকলেই আল্লাহর কালাম (ঐশী বাণী) আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই একই স্বরে একই বাণী উচ্চারণ করিয়া থাকেন।"[৯০৬]

বাহাউল্লাহ নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা রাসূল দাবি করেছেন। সে সাথে তার বিশ্বাস পূর্ববর্তী সৈয়দ আলী মুহাম্মদ যিনি বাব নামেই তাদের নিকট পরিচিত তিনিও নবী। আল্লাহর সাথে রাসূলের সম্পর্ক বুঝাতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে ঈশ্বর দাবিও করেছেন। তার মতামত হচ্ছে, প্রত্যেক যুগে ও ধর্ম বিধানে একটি পবিত্র ও নিষ্কলুষ আত্মাকে মর্ত্য ও স্বর্গের রাজ্য সমূহ প্রকাশ করা হবে। এ স্বর্গীয় সত্তার একটি মানবীয় ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি রয়েছে। আধ্যাত্মিক প্রকৃতিটি স্বয়ং ঈশ্বরের সত্তা থেকে জাত।[৯০৭]

অন্যত্র তিনি বলেন: "ঐশী প্রকাশের দুই রকমের প্রকৃতি থাকে; একটি হইল দৈহিক স্বভাব অথবা অন্যান্য মানুষের ন্যায় দৈহিক প্রকৃতি এবং অন্যটি হইল আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, যাহা স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ফলে তিনি দ্বিবিধস্বরে বাক্যালাপ করিয়া থাকেন; একটি হইল মানুষের স্বর। অন্যটি স্বয়ং ঈশ্বরের স্বর।"[৯০৮]

বাহাউল্লাহ নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি দ্বৈত মর্যাদায় ভূষিত। প্রথমত: তিনি অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ। যেমন তিনি বলেছেন: "আমি তোমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কেহ নহি। বল প্রশংসা আমার পরম প্রভুর! আমি একজন মানুষ ব্যতীত আর কেহ নই।"[৯০৯]

দ্বিতীয়ত: তাঁর ঐশ্বরীক উপস্থিতি। তিনি মনে করেন তার আরেকটি সত্তা রয়েছে যা আধ্যাত্মিক। সেটি স্বয়ং ঈশ্বর থেকে সৃষ্ট। এটি প্রমাণ করার জন্য তিনি বলেন:

---

৯০৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

৯০৭ . *কিতাব -ই-আকদাস, টীকা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

৯০৮ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭১

৯০৯ . *কিতাব -ই-আকদাস, টীকা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

“যদি ঈশ্বরের সর্ব পরিবেষ্টনকারী প্রকাশকগণের কেহ ঘোষণা করেন, ‘আমিই ঈশ্বর’। সত্য সত্যই তিনি সত্য কথাই বলেন এবং এতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বারংবার প্রদর্শিত করা হয়েছে যে, তাঁদের প্রকাশ, তাঁদের নামাবলী ও তাদের গুণাবলী প্রকাশের মাধ্যমেই ঈশ্বরের প্রকাশ তাঁর নামাবলী এবং তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করা হয়। [৯১০]

বাহাউল্লাহ তার মাঝে অবস্থারত দু’টি সত্তার সবিশেষ ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

“হে আমার ঈশ্বর, যখন আমি ঐ সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করি যাহা আমাকে তোমার সহিত সংযুক্ত করে, তখন আমি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর কাছে ঘোষণা করিতে অনুপ্রাণিত হই, সত্য সত্যই আমি ঈশ্বর; এবং যখন আমি আমার নিজ সত্তা বিবেচনা করি, দেখ, আমি ইহাকে কদম অপেক্ষা নিকৃষ্টতর দেখিতে পাই।”[৯১১]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে অনেকে মনে করেন যে, বাহাউল্লাহ নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছেন। “আল্লাহ-হু-আবহা বাহাই ধর্মের একটি প্রার্থনা। বাহাই লিখনীতে আছে এটি এখানে উল্লেখিত ‘‘বাহা’’ নামটি আল্লাহর সবচেয়ে মহত্তম নাম। অর্থাৎ এটিই বাহাউল্লাহর নাম। আল্লাহ-হু-আবহা মানে ইয়া বাহাউল আবহা। এ সর্বোত্তম নাম এ অর্থ প্রকাশ করে যে, বাহা উল্লাহ ঈশ্বরের সর্বোত্তম কথায় আবির্ভূত হয়েছেন অন্য কথায় তিনিই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রকাশ।”

বাহাইরা বিশ্বাস করে, মানবজাতির উষালগ্ন থেকে প্রত্যাদিষ্ট মনীষীগণ পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং আল্লাহর প্রত্যাদেশ মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর পূর্ববর্তীদের স্বীকৃতিও দিয়েছেন, এবং তাঁর পরবর্তীতে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি আসার সুসংবাদ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ একহাজার বছর পর বাহাউল্লাহর পরবর্তী রাসূল আগমন করবেন। এ সম্পর্কে বাহাউল্লাহর জ্যোতি গ্রন্থে বলা হয়:

“বাহাউল্লাহ প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যে, একটি পূর্ণ সহস্র বৎসরের কম সময়ে নহে, অন্য একজন ঐশী প্রকাশ আবির্ভূত হইবেন। পরবর্তী ঐশী প্রকাশের প্রতি তিনি তাহার আনুগত্যের

---

৯১০ . *প্রাগুক্ত*

৯১১ . *কিতাব-ই-আকদাস, টীকা, প্রাগুক্ত পৃ.* ২৩৮

প্রতিশ্রুতি যাহারা আবির্ভূত এবং তাহার পরে অনন্ত কাল যাবৎ যাহারা আবির্ভূত হইবেন। তাহাদের প্রতিও তিনি তাহার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।"[৯১২]

বাহাইরা বিশ্বাস করে, নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ হয়নি বরং যুগ যুগ ধরে এটি প্রবহমান থাকবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) সর্বশেষ নবী নন। বাহা উল্লাহ নবী। তিনিও সর্বশেষ নন। যুগ যুগ ধরে নবী রাসূলগণ আগমন করতে থাকবেন।[৯১৩]

সকল ধর্মের ভিত্তি এক

যেহেতু ধর্মগুলো স্রষ্টা থেকে এসেছে তাই বাহাই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হচ্ছে, সকল ধর্মের ভিত্তি এক। ধর্মসমূহ যুগে যুগে আসে এবং মানুষকে তার ধারণশক্তি, যোগ্যতা ও যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান করে।[৯১৪] বাহাউল্লাহর মতে, আল্লাহর ধর্মমাত্র একটি। যা বহু রাসূল দ্বারা মানুষকে শিক্ষাদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর বহু প্রেরিত পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য। [৯১৫]

বাহাইদের প্রচার পত্রে বলা হয়েছে:"প্রত্যেক ধর্মই বিরাট স্বর্গীয় জ্যোতি। হিংসা, দ্বেষ বা ঘৃণার জন্য ধর্ম নহে। ধর্ম হলো সত্য এবং সত্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার ধর্মের মূলও এক। মূল বিষয়গুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য বা পরিবর্তন নাই।"[৯১৬] বাহাইরা যেহেতু সকল ধর্মের ভিত্তি এক হিসেবে গণ্য করে তাই তারা বিশ্বের সকল নারী পুরুষকে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার আহবান জানায়। সমগ্র মানবজাতি যখন ঐক্যবদ্ধ হবে তখন প্রকৃত শান্তি বয়ে আসবে। এ প্রসঙ্গে বাহাউল্লাহর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "মানবজাতির মঙ্গল,

---

৯১২ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

৯১৩ . মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৬

৯১৪ . মাজগান শামসী বাহার, অনু. শেখ শহীদ উদ্দিন, *বাহাই পারিবারিক জীবনের মূলনীতিমালা* (ঢাকা: বাহাই বাংলাদেশের প্রকাশনা সংস্থা, তা. বি,), পৃ. ৩৭-৩৮

৯১৫ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৯১৬ . *প্রচারপত্র*, *প্রাগুক্ত*

ইহার শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হইবে না, যতদিন ইহার একতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।"[৯১৭]

বাহাইরা ধর্মকে বৈপ্লবিক বলে মনে করেন। তারা মনে করে ধর্ম যুগে যুগে অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করে থাকে। এ সম্পর্কে বাহাউল্লাহর জ্যোতি গ্রন্থে বলা হয়েছে: "মানব জাতির সমগ্র ইতিহাস ব্যাপী আল্লাহ স্বর্গীয় সত্যকে একটু একটু করিয়া এবং ধাপে ধাপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, ধর্ম বৈপ্লবিক তথা ইহা যুগে যুগে উন্নয়ন ও অগ্রগতি লাভ করিয়া থাকে।"[৯১৮]

বাহাইরা মনে করে মানবজাতি একটি জাতি মাত্র। সকলেই মানব পরিবারের সদস্য। এ জাতির আদি পিতা একজনই। সুতরাং মানব জাতির একত্ব একটি মহাসত্য যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে জাগরুক থাকা আবশ্যক। সেখানে প্রত্যেক মানুষের কার্যাবলীতেও বিষয়টির চেতনা থাকা বাঞ্ছনীয়।[৯১৯] যেহেতু মানবজাতি একটি জাতি হিসেবে পরিগণিত তাই তার ধর্ম ভিন্ন হতে পারে না সকলের ধর্ম এক হওয়াই বাঞ্ছনীয় এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী বাহাই সম্প্রদায়।

আখিরাত বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন

বাহাইরা আখিরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করে। তবে সে জীবনের সুস্পষ্ট কোন চিত্র তাদের কোন লেখনীতে পাওয়া যায় না। আবদুল বাহা বলেন, 'আত্মা শাশ্বত অমর'। [৯২০] বাহাইরা মনে করে মানবদেহের মৃত্যুর পর মানবসত্তা জীবিত থাকে। এ আত্মা যখন মানবদেহের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পরবর্তী জগতের দিকে ধাবিত হয় তখন তাকে মৃত্যু বলে। আর এ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানুষ আখিরাতের অধিবাসী হয়ে উঠে। দেহ হতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যতদিন তা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারবে না ততদিন তা উন্নতি লাভ করতে থাকবে।[৯২১] বাহাই ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী একজন বাহাইয়ের সুনির্দিষ্ট পুরুস্কারের

---

৯১৭ . *কিতাব-ই-আকদাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৯১৮ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

৯১৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

৯২০ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৯২১ . *প্রাগুক্ত*

বর্ণনা না দিলেও এতটুকু বলেছে যে, একজন নিষ্ঠাবান বাহাই 'পরবর্তী' জগতে সানন্দে জীবনের আকাঙখার সম্মুখীন হতে পারে।[৯২২]

বাহাই ধর্মে মৃত্যুকে একটি আনন্দময় প্রস্থান হিসেবে মনে করা হয়। এর মধ্যে কোন ভয়-ভীতি তারা লক্ষ্য করে না। বাহাউল্লাহ বলেন: "মৃত্যুকে আমি তোমার জন্য একজন আনন্দ বার্তাবাহক করিয়াছি।"[৯২৩] বাহাইরা মনে করে, এ পৃথিবীতে থাকে মানুষ যা ধারণা করতে পারে, মৃত্যু তার চেয়ে বহু গুণে সুন্দর জীবনের দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকে। [৯২৪] বাহাইরা বিশ্বাস করে, মৃত্যু এক মহাযাত্রা যা নশ্বর জগত থেকে অবিনশ্বর জগতের এক দীপ্তিময় শৃঙ্গে আরোহণ করার অপরিমেয় প্রশান্তি প্রাপ্তির সুযোগ। অতীতে মৃত্যুভয় মানুষের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বাহাউল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন:

"হে প্রেমের সন্তান! তুমি সেই দীপ্তিময় উচ্চাঙ্গ শিখর হইতে ও স্বর্গীয় প্রেমের বৃক্ষ হইতে মাত্র এক পদ পশ্চাতে রহিয়াছ। তুমি এক পদ অগ্রসর হও এবং ইহার পরে অবিনশ্বর বেষ্টনীর মধ্যে আর এক পদ অগ্রসর হও ও চিরস্থায়ীত্বের পটমন্ডপে প্রবিষ্ট হও।" [৯২৫]

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের স্বরূপ বাহাই ধর্মে অনুপস্থিত। তবে তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর মাধ্যমে যে প্রাণ নতুন জগতে স্থানান্তরিত হয়েছে তার উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ও অব্যাহত উন্নয়ন ঘটতে থাকবে।[৯২৬] যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য প্রার্থনা করার বিধান বাহাই ধর্মে রয়েছে। আবদুল বাহা বলেন: "যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিলে উহা তাহাদের নব-জীবনের তাহাদের উন্নয়নে সহায়ক হইবে। যাহারা এই পৃথিবীতে জীবিত রহিয়াছে, প্রার্থনা তাহাদের জন্যও আরামদায়ক হইয়া থাকে।"[৯২৭]

---

৯২২ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৯২৩ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৯২৪ . *প্রাগুক্ত*

৯২৫ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯

৯২৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৯২৭ . *প্রাগুক্ত*

নারী পুরুষের সমতা

বাহাইগণ নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাসী। বাহাউল্লাহ বলেন: “সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে নারী পুরুষ উভয়ই সমান। আগামী দিনগুলিতে নারীরা সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করিবে এবং বিশ্বের উচ্চতম মর্যাদা অর্জন করিবে।”[৯২৮] বাহাউল্লাহ আরও বলেন: “মানব জাতির সুখ তখনই বাস্তবায়িত হইবে। যখন নারী ও পুরুষ সমশ্রেণিতে হইবে ও সমভাবে অগ্রসর হইবে। কেননা, প্রত্যেকেই অন্যের পরিপূরক ও সাহায্যকারী।” [৯২৯]

নারীর জন্য পর্দা প্রথা বাহাই ধর্মে অনুপস্থিত। তারা মনেকরে বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুসারে তা একটি পশ্চাদপদ প্রথা বৈ কিছু নয়। সর্ব প্রথম তাহিরা নামের একজন বাবী সদস্যা যিনি বাবের শিষ্য ছিলেন, তিনি অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে বের হন।

ধর্ম ও বিজ্ঞান

বাহাইরা বিশ্বাস করে ধর্ম ও বিজ্ঞান একই অভীন্ন সত্তার দুই দিক। তাই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। এ সম্পর্কে তাদের প্রচারপত্রে বলা হয়: “ধর্ম যখন কুসংস্কার মুক্ত হয় তখন তা বিজ্ঞানের সাথে তার সঙ্গতি প্রকাশ করে, এবং তখনই তা বিশ্বে একটি প্রচন্ড একত্রীকরণ ও পরিশোধনকারী শক্তিরূপে অবির্ভূত হয়। ধর্মের ইতিবাচক প্রভাব ব্যতীত বিজ্ঞান একটি বিধ্বংসী শক্তি এবং সত্য -মিথ্যার নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া ধর্ম কেবলমাত্র কুসংস্কার।”[৯৩০]

কিতাব

বাহাইরা বিশ্বাস করে পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য তবে বাহাইদের ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার পর সব রহিত হয়ে গেছে। বাহাউল্লাহ কর্তৃক অবতারিত কিতাবদ্বয় কিতাব - ই - আকদাস ও কিতাবে ঈক্কান ই বর্তমান সময়ের জন্য প্রভুর প্রত্যাদেশ। সুতরাং

৯২৮ . *প্রচারপত্র, প্রাগুক্ত*

৯২৯ . ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৭৪

৯৩০ . *প্রচারপত্র, প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

এর অনুসরণ মানবজাতির জন্য আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কিতাব -ই -আকদাসের ১৩৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে:

"এই দিবসে যাহা কিছু এই প্রত্যাদেশে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত কেহ যেন অন্য কিছু সুদৃঢ়ভাবে ধারণ না করে। অতীতে এবং ভবিষ্যতে এই রূপই ঈশ্বরের আদেশ- একটি আদেশ যাহা দ্বারা অতীতের বার্তাবাহকদের ধর্মগ্রন্থগুলি অলঙ্কৃত হইয়াছে। অতীতে এবং ভবিষ্যতে এ রূপই পরম প্রভুর সতর্কীকরণ যে সতর্কীকরণ দ্বারা জীবন গ্রন্থের ভূমিকা সুশোভিত করা হইয়াছে, যদি তোমরা ইহা অনুভব করিতে। অতীতে এবং ভবিষ্যতে এই রূপ ই পরম প্রভুর আদেশ; সতর্ক হও যেন তোমরা ইহার পরিবর্তে অবমাননা ও অসম্মানের অংশ পছন্দ না কর, আমার প্রত্যাদেশের মাত্র একটি শ্লোক পাঠ করা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় প্রজন্ম সমূহের ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। ইহাই সর্ব করুণাময়ের বাক্য, যদি তোমাদের শ্রবণ করিবার কর্ন থাকিত। বল: ইহাই জ্ঞানের নির্যাস, যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে।"[৯৩১]

বাহাইদের কতিপয় মূলনীতি ও বিধিবিধান

১। বর্তমানে বাহাই ধর্মের সকল ব্যাখ্যা প্রদান করবে সর্বোচ্চ বিচারালয়।

২। দৈনিক ৩ বার প্রার্থনা করতে হবে।

৩। বাহাইদের কিবলা হচ্ছে যেখানে বাহাউল্লাহ সমাহিত হয়েছেন অথার্ৎ আক্কা নগরী তাদের কিবলা।

৪। প্রার্থনা করার আগে অভিসিঞ্চন করা আবশ্যক।

৫। প্রতি বাধ্যতামূলক প্রার্থনার জন্য নতুন করে অভিসিঞ্চন করতে হবে।

৬। প্রার্থনা হবে বাহাই উপাসনালয় এবং নিজ বাড়িতে, রাস্তাঘাট অথবা বাজারে প্রার্থনা বৈধ নয়।

৭। মৃত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা ব্যতীত সম্মিলিত প্রার্থনা নিষিদ্ধ।

৮। বাহাই ধর্মে উপবাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৯। ১৫ বছর বয়সী সকল নারী পুরুষের জন্য উপবাস অবশ্য পালনীয়।

---

৯৩১. *কিতাব -ই-আকদাস, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

১০। বিবাহ উচ্চ প্রশংসিত তবে বাধ্যতামূলক নয়।

১১। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ।

১২। বয়ঃপ্রাপ্তি অর্থাৎ ১৫ বছর হওয়ার পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

১৩। বিবাহে পিতা-মাতার সম্মতি আবশ্যক।

১৪। ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে বিবাহ অনুমোদিত।

১৫। পণ প্রদানের উপর বিবাহ শর্তাধীন।

১৬। কঠোরভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের নিন্দা করা হয়েছে।

১৭। বিবাহ বিচ্ছেদের বৈধতা রয়েছে।

১৮। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার নীতি সুসংহত।

১৯। ৭ শ্রেণির লোক উত্তরাধিকার প্রাপ্য হবে।

২০। বাহাউল্লাহ সমাধিতে তীর্থযাত্রা মঙ্গল কাজের একটি।

২১। শিশুদের শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক।

২২। কোন কিছুই অপবিত্র নয় এমনকি মানব বীর্য পবিত্র।

২৩। যাকাত প্রদান অবশ্য কর্তব্য।

২৪। দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ।

২৫। বৈরাগ্য, সন্নাসবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ও পুরোহিত প্রথা নিষিদ্ধ।

২৬। হস্ত চুম্বন নিষিদ্ধ।

২৭। নেশাদার পানীয়, আফিম, জুয়া খেলা, ব্যাভিচার, সমকাম, হত্যা, চুরি, অগ্নিসংযোগ নিষিদ্ধ।

২৮। পশুদের প্রতি নির্দয় আচরণ, আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা, পরনিন্দা, মিথ্যা অপবাদ রটানো, একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অস্ত্রবহন, মালিকের অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ, কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা বা আহত করা নিষিদ্ধ।

২৯। দ্বন্দ্ব-বিবাদ, খাদ্যের মধ্যে হাত ডুবানো, মাথা মুন্ডন করা, কানের নিম্নভাগ ছাড়িয়ে পুরুষের চুল বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ।

৩০। রেশমী পোশাক, স্বর্ণরৌপ্যের থালাবাসন ব্যবহার বৈধ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১। তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা বৈধ।

৩২। সঙ্গীত গাওয়া ও শোনা বৈধ।

৩৩। দাড়ি কাটা বৈধ।

৩৪। পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক।

৩৫। সকল ধর্মের লোকদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সাথে মিলিত হওয়া।

৩৬। নিজের জন্য যা ইচ্ছা করবে না অন্যের জন্য তা না করা।

৩৭। পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা।

৩৮। সত্যবাদী, বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া।

৩৯। নিরপেক্ষ, বিচক্ষণ, বিনীত, অতিথিপরায়ণ, অধ্যাবসায়ী, নিরাসক্ত ও ঈশ্বরের অনুগত হওয়া।

৪০। যাবতীয় অনিষ্ট, কপটতা, অহংকার, গোঁড়ামী, প্রতিবেশির অধিকার বিনষ্ট না করা ও রাগান্বিত না হওয়া।

৪১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পা ধৌত করা, স্নান করা, নখ কাটা, নিজ বাড়ির আসবাব পত্র নবায়ন করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।[৯৩২]

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমনের পূর্বে আরব তথা সমগ্র পৃথিবী ছিল পাপাচারের প্রেক্ষাগৃহ। মারা-মারি, কাটা-কাটি, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ব্যাভিচার, অত্যাচার-নিপীড়নে পৃথিবী নামক গ্রহটি হয়ে উঠেছিল নরকসম। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই সীমাহীন অস্থিরতা বিরাজ করছিল। মহান আল্লাহ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য রহমত স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স.) কে পাঠালেন। তিনি তাঁর অনুপম চরিত্র-মাধুরিমা ও সুমহান আদর্শের মাধ্যমে সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বর্বর ও অসভ্য জাতি তথা আরব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন। তিনি শতধা বিভক্ত আরব জাতিকে সুসংবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলেন। বছরের পর বছর ধরে সমাজে ঝেঁকে বসা কুসংস্কার দূর করে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশিত সমাজ গঠন করেন। সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে আরব জাতি সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। এ রকম ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ জাতি মানবেতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

মহানবী (স.)-এর তিরোধানের পর তাঁর খলীফা আবু বকর (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলের শুরুতে বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা মাথাচারা দিয়ে উঠে। এমনকি কোনো কোনো মিথ্যাচারী নবুওয়্যত পর্যন্ত দাবী করে বসে। তৎকালীন সুপার পাওয়ার পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য উদীয়মান আরব শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতি বাতিল শক্তির সকল অপচেষ্টা রুখে দেয়। প্রথম খলীফা আবু বকর (রা)-এর ওফাতের পর ওমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। তারঁ শাসনামলে মুসলিম শক্তির অপ্রতিরোদ্ধ অগ্রযাত্রা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের প্রশিক্ষিত বাহিনীদ্বয় রুখতে পারেনি। ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরে। ওমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.)-এর শাহাদাতের পর জামিউল কুরআন ওসমান ইব্ন আফফান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর শাসনামলে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ইসলামী খিলাফত বিশাল আকার ধারণ করে। এরি মধ্যে রাসূল (স.)-এর বহু সাহাবী ইন্তিকাল করেছেন। মুসলিম জাতির যুবক শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নওমুসলিম। ইসলামের অগ্রযাত্রা ও সুমহান বিজয়গুলো তাদের আকৃষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

করে। তাদের আবেগ ছিল সাধারণ মুসলিমদের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তারা সাহাবীদের সংস্পর্শ পেয়েছেন একেবারে কম। ফলে তাদের আবেগ উচ্চাকাঙ্খায় পরিণত হয়। অন্যদিকে সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্মের কারো কারো মধ্যে ইসলামের আকর্ষণ তাদের পর্যায়েই ছিল। সাথে যোগ হয় ইসলামের চিরশত্রুদের অপতৎপরতা। ফলে বিভিন্ন ধরনের ফিৎনার বীজ অংকুরিত হতে থাকে। একপর্যায়ে তা মহিরুহে পরিণত হয় এবং খলীফাতুর রাসূল ওসমান (রা.) নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা সুসংবদ্ধ মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতিতে কুঠারাঘাত হানে। ফলে মুসলিম জাতি ভ্রাতৃঘাতি এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এরপর ফিৎনা আর থেমে থাকেনি। ভিন্নমতের জোয়ার বইতে থাকে। সে সাথে ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র এতে ঘৃতাহুতি দেয়। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন মতাদর্শ। এসকল মতাদর্শের বেশির ভাগই রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে উৎপত্তি লাভ করলেও এক পর্যায়ে ধর্মীয় মতাদর্শে পরিণত হয়। এসব মতাদর্শের কোনো একটি আদি ও আসল তথা নাজাতপ্রাপ্ত দল। সবাই নিজ নিজ দলকে নাজাতপ্রাপ্ত দল মনে করে এবং তার স্বপক্ষে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ পেশ করে থাকে। এসব মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে গোটা মুসলিম দুনিয়ায়। ভারত উপমহাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে এ জাতীয় মূল দল চারটি। বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে এ চারটি দলের পরিচিতি ও মতাদর্শ আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি দলের দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের নিকট এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতই সঠিক পথে আছে তথা তারাই নাজাতপ্রাপ্ত দল। আমাদের বিশ্বাস বিদগ্ধ পাঠক মুক্ত মন নিয়ে এ অভিসন্দর্ভটি অধ্যয়ন করলে নাজাতপ্রাপ্ত দলটিকে খুঁজে পাবেন। আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১। আল-কুরআনুল কারীম।

২। অধ্যাপক হাসান আইয়ুব, অনু. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০০৪ খ্রি.)

৩। আহমদ ইব্‌ন ফারিস, *মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাহ* (কুম: মাকবাতুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.)

৪। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ফাইউমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.) আহমদ ইব্‌ন ফারিস, *মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাহ* (কুম, ইরান: মাকবাতুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.)

৫। আবু জাফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত্বত্বহাবী, *আকীদাতুত্ব ত্বহাবী*, অনু. মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম মল্লিক (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০১৩ খ্রি.)

৬। আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আলামিয়্যাহ, ১৯৭৬ খ্রি.)

৭। আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার আসকালানী, *লিসানুল মিযান*, (বৈরুত: মুআসসাসাতুল আলামী, ১৯৮৬ খ্রি.)

৮। আয়াতুল্লাহ আল উযমা নাসের মাকারিম সিরাজী, ইমামত, অনু. এস, জামান (খুলনা: আঞ্জুমা-এ-পাঞ্জাতানী, ২০০৩ খ্রি.)

৯। আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সাবিত খতীব বাগদাদী, *তারিখে বাগদাদ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.)

১০। আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র), *বিদায়া ওয়াল নিহায়া* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.)

১১। আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র), *বিদায়া ওয়াল নিহায়া* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.)

১২। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান* (বৈরুত: দার সাদির, ১৯৯৪ খ্রি.)

১৩। আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ, ইসলাম ও শীয়া মাযহাব, অনু. মো: সামছুল আযম ও আলী নওয়াজ খাঁন (কোম: আহলে বাইত (আ:) বিশ্ব সংস্থা, ২০০৬ খ্রি.)

১৪। আল্লামা মুহাম্মদ রেজা আল-মুজাফফার, শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস, অনু. মুহাম্মদ মাইন উদ্দিন তালুকদার (ঢাকা: মারকাজ-এ জাহানী -এ উলুমে ইসলামী, ২০০৬ খ্রি.)

১৫। উস্তাদ সাইয়েদ মোহাম্মদ কাজাভী, শাফায়াত, অনু. মো: সামিউল হক (কোম, ইরান: খেদমতে ইসলামী সংস্থা, ২০০৬ খ্রি.)

১৬। আয়াতুল্লাহ আল-উজমা নাসের মাকারিম সিরাজী, *ইমামত*, অনু. এস, জামান (খুলনা: আঞ্জুমান- এ-পাঞ্জাতনী, ২০০৩ খ্রি.)

১৭। ইব্‌ন আবিল ইয আল-হানাফিয়্যাহ, *শারহুল আকিদা আত-তাহাবিয়্যাহ* (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৯৮৮খ্রি.)

১৮। ইব্‌ন মানযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.)

১৯। ইউসুফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল বার, *আল-ইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসা* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)

২০। উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ নাসাফী, *শরহে আকাইদে নাসাফী*, সম্পা. মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ১৪২৮ হি.)

২১। এইচ, এম, বালয়ুজী, অনু. শচীপাত চ্যাটাজী, *বাহাউল্লাহ* (ঢাক: বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, ২০১২ খ্রি.)

২২। কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, মাওলানা লিয়াকত আলী, *খেলাফতে রাশেদা* (ঢাকা: মাওলানা লিয়াকত আলী, ২০০৩ খ্রি.)

২৩। কাযী আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইব্‌ন আলী সাইমারী, *আখবারু আবী হানীফাহ ওয়া আসহাবিহী* (বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৯৮৫ খ্রি.)

২৪। *কিতাব-ই-আকদাস* (ঢাকা: বাহাই পত্র পাবলিশিং ট্রাস্ট, ২০০৩ খ্রি.)

২৫। জালালুদ্দীন সূয়ূতী, *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন* (মিশর: মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯০১ খ্রি.)

২৬। জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাবী ফি শরহে তাকরীবুর নববী* (করাচি: মীর মুহাম্মদ কুতুব, ১৯৭২ খ্রি.)

২৭। ড. ইবরাহীম আনিস, *আল-মু'জামুল আল-ওয়াসিত* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি)

২৮। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা* (ঝিনাইদহ: আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি.)

২৯। ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী: আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০১ খ্রি.)

৩০। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.)

৩১। ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয–যুহাইলী, *আল ওয়াজীয ফী উসুলিল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশক: দারুল খাইর লিত্তবা'আতি ওয়ান নাশরি ওয়াত্তাওরী, ২০০৬ খ্রি.)

৩২। ড. মুহাম্মদ যিয়াউর রহমান আযামী, *মু'জামু মুসতালাহাতিল হাদীস* (রিয়াদ: মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ১৯৯৯ খ্রি.)

৩৩। ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (ঢাকা: মেরিট ফেরার, ২০১৩ খ্রি.), ১৭শ স.

৩৪। ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২ খ্রি.)

৩৫। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহ্‌মন, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.)

৩৬। ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৪ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৩৭। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইমাম আবু হানীফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা* (ঝিনাইদহঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি.)

৩৮। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *এহ্ইয়াউস* সুনান (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.)

৩৯। ড. এম আর হাশেমী, গাদিরে খুমে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ভাষণ (ঢাকাঃ বিশ্ব আহলে বাইত (আঃ) পরিষদ, ২০০৮ খ্রি.)

৪০। ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা* (ঢাকাঃ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খ্রি.)

৪১। ডি.ডব্লিউ. এলেন, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *বাহাউল্লাহর জ্যোতি* (ঢাকাঃ বাংলাদেশের বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, তা. বি.)

৪২। *প্রচারপত্র, বিশ্ব শান্তি ও একতার জন্য বাহাই শিক্ষা* (বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, তা. বি.)

৪৩। *বাহাই ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন ১৮১৭-২০১৭* (ঢাকাঃ বাংলাদেশের বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, ২০১৭ খ্রি.)

৪৪। বাহাই অভিভাবকবৃন্দ, অনু. মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন, *বাহাই জীবন পদ্ধতি* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, ১৯৭৭ খ্রি.)

৪৫। মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন* (দেওবন্দঃ কুতুবখানা নামিয়্যা, ১৯৯৩ খ্রি.)

৪৬। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (বৈরুতঃ দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ১৯৮৭ খ্রি.)

৪৭। মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম* (কায়রোঃ দারু ইয়াহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.)

৪৮। মাওলানা মতিউর রহমান, *চার ইমামের জীবনী* (ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, তা. বি.)

৪৯। মুফতী মুহাম্মদ শফী, পবিত্র কুরআনুল কারীম, অনু. ও সম্পা. মুহিউদ্দিন খান (মদীনা মেনাওয়ারাঃ খাদেমুল-হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহ্‌দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা,বি.)

৫০। মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, *ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ* (ঢাকাঃ থানভী লাইব্রেরী,২০১৪ খ্রি.)

৫১। মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, *আল মুস্তাদরাক* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.)

৫২। মোল্লা আলী কারী, *শারহুল ফিকহিল আকবার* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রি.)

৫৩। মোল্লা আলী কারী, *মিরকাতুল* মাফাতীহ (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৪ খ্রি.)

৫৪। মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামবাদী, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)*, জীবনী অংশ : *হায়াতে ইমাম মালিক (র)* (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০২ খ্রি.)

৫৫। মুফতী মিযানুর রহমান কাসেমী, *আহলে হাদীস যুগে যুগে* (ঢাকাঃ ফ্রেন্ডসবুক সেন্টার, ২০১৫ খ্রি.)

৫৬। মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, *তাফসীরে আমপারা* (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.)

৫৭। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, *আমাদের শিক্ষা*, অনু. মৌলভী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী (ঢাকাঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.)

৫৮। মাজগান শামসী বাহার, *মহানবাব*, অনু. শেখ শহীদ উদ্দিন (ঢাকাঃ বাংলাদেশের বাহাই জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ, ১৯৯২ খ্রি.)

৫৯। মাজগান শামসী বাহার, *বাহাই পারিবারিক জীবনের মূলনীতিমালা*, অনু. শেখ শহীদ উদ্দিন (ঢাকাঃ বাহাই বাংলাদেশের প্রকাশনা সংস্থা, তা. বি,)

৬০। মৌলভী আহসান উল্লাহ সিকদার, মহাসুসংবাদ (ঢাকাঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৬১। মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, আহমদীয়াতের পয়গাম, অনু. মৌলবী আব্দুল হাফিজ মরহুম (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি.)

৬২। মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, অনু. মাওলানা আব্দুল মতিন জালালাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী (ঢাকা: ইসলমিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.)

৬৩। মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, অনু. মৌলভী আব্দুল হাফিজ মরহুম, *আহমদীয়াতের পয়গাম* (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি.)

৬৪। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, *আহবান* (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ, ২০১২ খ্রি.)

৬৫। রহমাতুল্লাহ কিরানবী, *ইযহারুল হক* (রিয়াদ: আর রিয়াসাতুল আম্মাহ, দারুল ইফতা, ১৯৮৯ খ্রি.)

৬৬। লেখক মন্ডলী, *ফিকহে হানাফী ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪ খ্রি.)

৬৭। শায়খ হাফেজ এহসান এলাহী জহির, *কাদিয়ানী মতবাদ*, অনু. মোহাম্মদ রকীবুদ্দীন হুসাইন (রিয়াদ: ইসলামি গবেষণা ও ফাতওয়া বিষয়ক প্রধান কার্যালয়, ১৯৯৬ খ্রি.)

৬৮। শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, *উম্মতি নবী* (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.)

৬৯। শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, *ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন* (ঢাকা: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ২০১৮ খ্রি.)

৭০। শানজিদ আবি, *ধর্মকোষ* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.)

৭১। সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারিখে ইসলাম, অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ মুজাম্মেল হক (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.)

৭২। সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৭৩। সাইয়্যিদ সাবিক, *আল-আকাইদুল ইসলামিয়া* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আরবী, ২০১১ খ্রি.)

৭৪। হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ* (ঢাকা: আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, তা. বি.)